আধুনিক বাংলা ছন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

নীলরতন সেন

বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথিকৃৎ

প্রবীণ ছান্দসিক

আমার পূজনীয় আচার্য

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রীচরণেষু ।

সহজেই পরিচিত হতে পারবেন, আশা করা যায়। অন্যান্য পরিভাষার ব্যবহারে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সঙ্কোচন দলবৃত্ত'কে এবারে শুধুই দলবৃত্ত বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত নামে পরিচিত করা গেল। প্রচলিত দলবৃত্তকেও প্রয়োজন বোধে 'লৌকিক দলবৃত্ত' নামে অভিহিত করা হল। ছন্দ-চিহ্নের জটিলতা এবারে আরও কমানো হল। এবারেও গ্রন্থপরিকল্পনার দিকে লক্ষ রেখে, রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয় সূত্রাকারে সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রয়েছে।

গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন পূজনীয় আচার্য, প্রবীণ ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও স্নেহপূর্ণ তাগিদ এ-কাজে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে। শব্দসূচী তৈরী করতে সাহায্য করেছে ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণীয়া শিপ্রা সেন। মুদ্রণের কাজে সর্ববিধ অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছে মুখ্য মুদ্রক, শ্রীমান নীলকণ্ঠ নাগ। তাছাড়াও সুহৃদবৃন্দ, সহকর্মীগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীর উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে গ্রন্থের পরিমার্জনা ও প্রকাশ ত্বরান্বিত করেছেন। সকলকেই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি।

প্রসঙ্গত জানাই, আমার স্ত্রী শ্রীমতী দীপালি সেন গ্রন্থটি প্রকাশের সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি বড়ো রকমের দুশ্চিন্তা থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

প্রুফ দেখার কাজে এত দিনেও ঠিকমতো অভ্যস্ত হতে পারিনি। সে জন্যই কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল। তবে আশা রাখি, এমন মারাত্মক কোনও প্রমাদ নেই যেটা পাঠক পড়বার সময় সংশোধন করে নিতে অপারগ হবেন।

১০/২৪৭, কল্যাণী। নদীয়া ॥		নীলরতন সেন

বিষয় সূচী

ব্যবহৃত ছন্দচিহ্ন ঃ

শব্দের উপরে ঃ মুক্তদল বা সংস্কৃত লঘুবর্ণ ⌣

রুদ্ধদল বা সংস্কৃত গুরুবর্ণ —

মুক্তদল এক কলা ⌣̍ , মুক্তদল দ্বিকলা ⌣̎

রুদ্ধদল এককলা ¯̍ , রুদ্ধদল দ্বিকলা ¯̎

ধ্বনি-সংকোচন ⌢

ইংরেজি রীতির প্রস্বর ´ , অপ্রস্বর ⌣

শব্দের পাশে ঃ উপযতি ⋮

পর্বযতি বা লঘুযতি |

পদযতি বা অর্ধযতি ||

পংক্তিযতি বা পূর্ণযতি I

অতিপর্বের যতি)

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র যুগ ঃ আদি পর্ব (১৮৯০-১৯০০)

রবীন্দ্রনাথ (১৯০০ পর্যন্ত) ঃ দেবেন্দ্রনাথ ঃ অক্ষয় কুমার ঃ স্বর্ণকুমারী ঃ মানকুমারী ঃ কামিনী রায়।

॥ ক ॥

১৮৯০ থেকে কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা কাব্য-আসরে রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র অধিপতির সম্মান লাভ করেছিলেন। ছন্দের দিক থেকেও মৌলিক প্রতিভার দানে সমকালীন অন্যান্য কবি তাঁর পাশে ম্লান হয়ে পড়েছেন। 'ছন্দ'গুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ঐশ্বর্যদীপ্তির নিপুণ এবং বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। সে কারণে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রবীন্দ্র ছন্দের অপরিহার্য মূল সূত্রটুকু উল্লেখ করে,--তার পাশে অপেক্ষাকৃত ম্লান, বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত অন্যান্য কবিদের ছন্দবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

এই পর্বে রচিত রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থ ও ছন্দোবদ্ধ নাটক

আলোচ্য পর্বকে রবীন্দ্র-ছন্দের আদি পর্ব বলা যেতে পারে। এই পর্বেই কবি কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত,—আধুনিক বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি ফসলে কবিতার সাজি পূর্ণ করে কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন। ছন্দ বিচারে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্য ও নাটকগুলি হল ঃ মানসী (১৮৯০) বিসর্জন (১৮৯০) চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), সোনার তরী (১৮৯৪), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), মালিনী (১৮৯৬), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কণিকা (১৮৯৯), কথা ও কাহিনী (১৯০০), কল্পনা (১৮৯০)।[১] প্রস্তুতি পর্বের (১৮৭৩-১৮৯০) শিক্ষানবিশী পর্যায় শেষ করে এই সময় থেকে তিনি বাংলা ছন্দে পূর্ণ প্রাণের

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ছন্দোবদ্ধ নাটকগুলির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ধরে আদি, মধ্য এবং অন্ত্য পর্বভাগে ভাগ করা হল। প্রকৃত রচনাকাল ধরলে এই তারিখের সামান্য অদলবদলের সম্ভাবনা আছে। তাঁর সমস্ত কবিতার সঠিক রচনাকাল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হল না,—সে কারণেই সঙ্গতি রক্ষার জন্যে সর্বত্রই গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরা হল। আমাদের আলোচনার পক্ষে তাতে বেশী কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটেনি বলেই অনুমান করি।

জোয়ার এনে দিলেন। এই পর্বের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানসী'তেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূববর্তী যুগে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতায় (বিরহ, গান) কলাবৃত্ত রীতির সার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এই রীতির ব্যাপক স্বীকৃতি মানসীর কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল। ১৮৮৭ তে (বৈশাখ) লেখা 'ভুলভাঙ্গা' কবিতায় দ্বিধাহীনভাবে কবি লিখলেন,—

কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার

চেয়ে আছে আঁখি নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু 'বন্ধন পাশ'
বাহুতে মোর।

* * * * * *

'বসন্ত নাই' এ ধরায় আর
আগের মতো,
'জ্যোৎস্না যামিনী' 'যৌবন হারা'
জীবনহত।

* * * * * *

মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
'মর্মে মর্মে' হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর। [মানসী ঃ ভুলভাঙ্গা]

সমগ্র কবিতাটিতে 'বন্ধনপাশ', 'বসন্ত নাই', 'জ্যোৎস্না যামিনী', 'যৌবন হারা' এবং 'মর্মে মর্মে' এই পাঁচটি পর্বে যুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন, সর্বত্রই কবি এই রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ করেছেন।

পাঁচমাত্রা পর্বভাগের কলাবৃত্ত ইতিপূর্বেই কবি ব্যবহার করেছেন। মানসীতে যুক্তবর্ণবহুল রুদ্ধদলের উপলভঙ্গে সে ছন্দে অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি হল। ১৮৮৮, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত 'অপেক্ষা' কবিতাটি তার প্রথম সার্থক নিদর্শন। সেখানে কবি স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,—

পাঁচমাত্রা পর্বের কলাবৃত্ত ছন্দ

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।
কলস ঘায়ে ঊর্মি টুটে',

'রশ্মি রাশি' 'চূর্ণি উঠে',

'শ্রান্ত বায়ু', 'প্রান্ত নীর'

'চুম্বি যায়' কভু। [মানসী ঃ অপেক্ষা]

এখানে 'ঊর্মি টুটে', 'রশ্মি রাশি', 'চূর্ণি উঠে', 'শ্রান্ত বায়ু', 'প্রান্ত নীর', এবং 'চুম্বি যায়' পর্বগুলিতে যুক্তাক্ষর দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার করেছেন। এই সময়ে (জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮) ছয়মাত্রার পর্বেও কবি যুক্তবর্ণ দ্বিমাত্রক রূপে বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন।[২]

কলাবৃত্ত রীতিতে আট, ছয় বা দশ মাত্রার (৩+৩+৪) দীর্ঘ পদযতি তেমন সফল হয় না। লঘু পর্বযতিতে বিভক্ত না করলে এই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ-রীতি সুস্পষ্ট হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অল্পস্বল্প হলেও পয়ার-ত্রিপদী বন্ধে, এ ছন্দের পরীক্ষা মানসীর দু একটি কবিতায় করেছেন। ত্রিপদী সর্বাংশে নিখুঁত না হলেও পয়ারবন্ধ অনেকাংশে সফল হয়েছে। যেমন —

কলাবৃত্ত পয়ার ত্রিপদী

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণ তট শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলোছল করতালি দেয় অনিবার।

[মানসী ঃ নিষ্ফল উপহার]

চোদ্দমাত্রা-পংক্তির কলাবৃত্তে ৮।।৬। মাত্রাভাগের তুলনায় ৬।।৮। মাত্রাভাগ কবি বেশী ব্যবহার করেছেন। তার কারণ, ৬।।৮। ভাগকে ৬।৬।২। পর্বভাগে উচ্চারণ করে কলাবৃত্ত রীতির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ সহজে রক্ষা করা যায়।

সাত মাত্রার পর্বভাগে কবি যুক্তবর্ণ কম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পর্বের শব্দ-বিন্যাসে এবং অনুপ্রাস ধ্বনি-সৌন্দর্যে বৈচিত্র্য এনেছেন! যেমন —

কলাবৃত্ত সাতমাত্রার (৩+৪) পর্ব

২। ১৮৯০তে প্রকাশিত মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ৬৮টি কবিতার মধ্যে ৩০টি কলাবৃত্ত ছন্দে লিখিত। তারমধ্যে প্রাথমিক চারটি কবিতা (ভুলে, বিরহানন্দ, ক্ষণিকমিলন, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা) যুক্তবর্ণবিহীন। বাকি সবই যুক্তবর্ণবহুল। ত্রিপদী (কবির প্রতি নিবেদন) ও চৌপদী (নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ) বন্ধ রচনায় দুটি কবিতায় উচ্চারণের দুর্বলতা লক্ষিত হয়। পদভাগের (৮, ৬, ১০ মাত্রা) ছন্দে এই রীতির ব্যবহার সম্পর্কে কবির দ্বিধা এখনও কাটেনি।

নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সেতো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদি মাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে।

[মানসী : বিরহানন্দ]

পর পর দুটি সাত মাত্রার পবে যথাক্রমে ৩+৪ এবং ৪+৩ মাত্রার শব্দবিন্যাস এবং সেই সঙ্গে দুই পর্বের দুটি চতুর্মাত্রক শব্দে মিলবিন্যাস ছন্দে নতুনতর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে।

কলাবৃত্ত ছন্দে তিন মাত্রার শব্দ প্রয়োগ

তিন মাত্রার শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিহারীলালের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে, উল্লেখ করেছি।[৩] তিন মাত্রার শব্দ কলাবৃত্ত ছন্দে যে অস্থির গতিবেগ সৃষ্টি করে আলোচ্য যুগের কল্পনা কাব্যগ্রন্থের 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটিতে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে। প্রস্তুতি পবের কবিতা থেকেও আমরা আগেই উদাহরণ তুলেছি।

মিশ্র কলাবৃত্তের ঐশ্বর্য

এ যুগে মিলবিন্যাসে, পর্ব ও পদের গঠনবৈচিত্র্যে এবং রুদ্ধদলের তরঙ্গ-ভঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেও ঐশ্বর্যপুষ্ট করে তুলেছেন। এই সময়ে রচিত অনেকগুলি প্রখ্যাত কবিতায় (যেমন, 'মানসী'র মেঘদূত বা 'সোনার তরী'র বসুন্ধরা ও মানসসুন্দরী প্রভৃতি), রাজা ও রাণী (১৮৮৯) এবং বিসর্জন (১৮৯০) নাটকে, চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) এবং মালিনী (১৮৯৬) গীতিনাট্যে, বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), গান্ধারীর আবেদন এবং কর্ণকুন্তী সংবাদ (১৯০০ : কাহিনীর অন্তর্গত) নাট্যকাব্যে

নাট্যসংলাপের প্রবহমান পয়ার

রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ার (সমিল ও মিলহীন) ব্যবহার করেছেন। রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন নাটকে এই ছন্দ-প্রয়োগ সর্বাংশে সুষ্ঠু হয়নি। পংক্তিপ্রান্তিক উপযতি বা লঘুযতি অনেকসময় মধুসূদনের মতো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। চিত্রাঙ্গদা বা মালিনীতে এ দুর্বলতা অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছেন। নাট্যসংলাপ এবং কাব্যের প্রবহমান পয়ার কিছুটা ভিন্নধর্মী হওয়াই অভিপ্রেত। রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে এই পার্থক্য রেখেছেন মনে হয় না। তবে তুলনাত্মকভাবে বলা যায়, সংলাপধর্মী

৩। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত ২য় সং) পৃ ১৩ ১৪।

বাক্যাংশে কাব্যধর্মী বাক্যাংশের তুলনায় যতিভাগ কিছুটা হ্রস্বমাপে রেখেছেন। দীর্ঘতর বাক্যাংশে ভাবপ্রবহমানতা কত সংহত, ধ্বনিগম্ভীর হতে পারে 'মেঘদূত', 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' (দ্র. মানসী ও চিত্রা কাব্য ঃ ১৬ এবং ১৮ মাত্রার পংক্তি) প্রভৃতি কবিতায় তার পরিচয় মেলে। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মধুসূদন মিলটনের আদর্শে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' রচনায় Miltonic Blank-verse এর ধ্বনিগত বিক্ষুব্ধতা এবং তরঙ্গায়িত উত্থানপতন পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। কাব্যের বিষয়বস্তুর ন্যায় ছন্দেও অনেক বেশী বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই বিজোড় মাত্রায় যতিস্থাপনে বা পংক্তি-প্রান্তিক লঘুযতি বিলোপে মধুসূদন দ্বিধাবোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ভাবের দিক থেকে বিদ্রোহের এমন বিপুল উচ্ছ্বাস যেমন আনতে চাননি, ছন্দেও এতটা বিপ্লবী মনোভাব পছন্দ করেন নি। সে কারণেই তাঁর পরিণত প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার ছন্দোবন্ধে অনেক বেশী সুনির্দিষ্টতা লক্ষিত হয়। মিশ্রবৃত্তের সংযত সুষ্ঠু প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ার ছন্দকে অনেকাংশে নমনীয় করে তুলেছেন। দুই কবির ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য তাঁদের কাব্যের ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রেও পৃথক শিল্পীমনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে। মধুসূদন ঘটনাবলী ও চরিত্রচিত্রণে উচ্ছ্বাসময় আকস্মিক উত্থানপতনের মহিমান্বিত অভিব্যক্তি বা Grandeur প্রকাশ করতে গিয়ে অপ্রচলিত যুক্তাক্ষরবহুল, ধ্বনিবন্ধুর শব্দ প্রয়োগ করেছেন, বাক্যগঠনে দূরান্বয় এনেছেন, উচ্ছ্বাস-প্রকাশক চিহ্ন (প্রশ্ন, বিস্ময়, ক্ষোভ, মুগ্ধতা-সূচক) বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এমনতর কৌশল আদৌ পছন্দ করেননি। কেবলমাত্র মননধর্মী কবিত্বময় ভাবপ্রবাহী ধ্বনিতরঙ্গকে পংক্তি অতিক্রম করে চলবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। পংক্তিপ্রান্তে লঘুযতি, অন্ততঃপক্ষে উপযতি প্রায় সর্বত্রই রক্ষা করেছেন। সে কারণেই পংক্তিপ্রান্তে মিল রেখে তাঁর প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার রচনার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। এখানে 'মেঘদূত' (এই শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা) কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ারের পার্থক্য

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নব বরষার।

প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষণ
নব বৃষ্টি বারিধারা, করিয়া বিস্তার
নব ঘন স্নিগ্ধছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিনীসম ॥
কত কাল ধরে
কত সঙ্গিহীন জন প্রিয়াহীন ঘরে
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত তারা শশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে ॥ [মানসী ঃ মেঘদূত]

প্রবহমান পয়ারে পংক্তি-অনুচ্ছেদ রচনায় মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ আরও এক ধাপ এগিয়েছেন। মধুসূদন পংক্তির মাঝে অনুচ্ছেদ শেষ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রবহমানতার দিক থেকে এ-রীতিই স্বাভাবিক বলে গণ্য করেছেন এবং চৌদ্দপংক্তিক সনেট রচনায়ও এ-রীতি প্রয়োগ করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, মধুসূদন-প্রবর্তিত ক্লাসিক রচনাভঙ্গী এবং তার উপযোগী প্রবহমান পয়ার-রীতি পরবর্তী কবিরা আর পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। এত উঁচু পর্দার কাব্য বা তদুপযোগী ছন্দ হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র—কেউই পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের রোমান্টিক কবিদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত নীচু পর্দার ভাষা ও ছন্দ প্রবহমান রীতিতেই সৃষ্টি করলেন। বস্তুতঃ এ-যুগে এবং পরবর্তী যুগে কবিরা প্রবহমান পয়ার ব্যবহারে রবীন্দ্র-রীতিরই অনুসরণ করেছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই মুক্তক রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। নাট্যসংলাপের উপযোগী গৈরিশ মুক্তকের পাশে কবিতা রচনার উপযোগী রবীন্দ্র-

মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক রচনা ঃ গৈরিশ মুক্তকের সঙ্গে পার্থক্য

মুক্তকের নিদর্শন হিসেবে এ-যুগে রচিত মানসীর অন্তর্গত 'নিস্ফল কামনা' (১৮৮৮, নভেম্বর) কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪] গৈরিশ নাট্যসংলাপী মুক্তকের সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যে ব্যবহৃত মুক্তকের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নাট্য-সংলাপে 'action' সৃষ্টির জন্য, বিচিত্র নর-নারীর চরিত্র-গত ভাব পরিস্ফুটনের জন্য নাট্যকার যতিস্থাপনে যে আকস্মিকতা এনেছেন, কবির কাব্যে বর্ণনাত্মক প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুটনে যতির সেই আকস্মিকতা বিশেষ নেই। সংলাপী মুক্তকে গদ্য ভাষার বাক্‌ধর্ম যতো স্পষ্ট, সে তুলনায় কাব্যের মুক্তকে ছন্দোময় ধ্বনিপ্রবহমানতাই বেশী পরিস্ফুট হয়। একটিতে, নাট্যকার স্বয়ং নেপথ্যে থেকে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে মর্তমানবের জীবন-সংঘাত পরিস্ফুট করতে চান বলে বাক্যগুলি ছোটবড়ো যতিভাগে বিভক্ত হয়ে আলাপের অভিব্যক্তি নিয়ে ফুটে ওঠে; অপরটিতে, কবি তার কাব্য-জগতের তন্ময় ভাবনাকে গভীর উপলব্ধির ছন্দোময় প্রকাশনায় পরিস্ফুট করতে চান বলেই শব্দচয়নে, শব্দগ্রন্থনে, যতিসংস্থাপনে অনেকাংশে মসৃণ ধ্বনি-তরঙ্গের অনুভূতি জাগে। নাট্যসংলাপে নাট্যকার অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচ্চারণ-মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি জানেন, অভিনয়কারীদের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি সর্বশ্রেণীর দর্শকের কাছে সংলাপী অভিনয়-মাধ্যমে পরিবেশন করতে হবে। সেখানে ঋজু, বলিষ্ঠ, সহজ অর্থবাহী, ছোট ছোট আবেগমুখর বাক্যাংশে গ্রথিত ছন্দোময় ধ্বনিতরঙ্গই বেশী কার্যকরী হবে।—নাট্যকার তাঁর রচনায় এই ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন থাকেন। সে তুলনায় কবি একান্তভাবে আপন ভাবনাশ্রিত প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শব্দ, ছন্দ ও যতির সংমিশ্রণে একটি সামগ্রিক সৃষ্টিকে পাঠকের কাছে উপহার দেন। সে কারণেই কবির অন্তরস্থিত সমন্বয় বোধ নাট্যকারের তুলনায় অনেকটা অচেতন এবং সূক্ষ্মতর হয়ে থাকে। বাইরের ঘটনাগত সংঘাতের তুলনায় অন্তরের গভীর সূক্ষ্ম সুর-তরঙ্গ সেখানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সবদিক বিচারে একথাই বলা চলে, গিরিশচন্দ্র নাট্যকার ছিলেন বলেই তাঁর মুক্তকে একটু বেশী ধ্বনির উচ্ছ্বাস, যতির আকস্মিকতা,

৪। ১৮৮২ তে রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রথম মুক্তক সংলাপ ব্যবহার করেন। এই ছয় বছরে নাট্যকার অন্তত: ১০খানি নাটকে মুক্তক সংলাপ ব্যবহারের দ্বারা সংলাপধর্মী মুক্তকের একটি আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন।

শব্দ উচ্চারণে কিছু আড়ম্বর লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রমুক্তকে ধ্বনি নমনীয় হয়েছে, তরঙ্গায়িত হয়েছে, যতিবোধে আকস্মিকতার চমক নেই, শব্দ উচ্চারণে সুরের সূক্ষ্ম সঙ্গতি রয়েছে।—এ মন্তব্য শুধু এই পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের দু-একটি মুক্তক কবিতা সম্পর্কে নয়,—পরবর্তী পর্বে রচিত বলাকার কবিতা সম্পর্কে সমধিক প্রযোজ্য। গৈরিশ মুক্তকের উদাহরণ পূর্বেই দিয়েছি। এখানে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতা থেকে রবীন্দ্র-মুক্তকের কিছুটা নিদর্শন তুলছি।—

খুঁজিতেছি—কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণমন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে।

[মানসী : নিষ্ফল কামনা]

সনেট রচনা

প্রস্তুতি-পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনা শুরু করেছিলেন এবং 'কড়ি ও কোমলে' বিভিন্ন আঙ্গিকের অনেকগুলি সনেট রচনা করেছিলেন। আলোচ্য পর্বেও তিনি শতাধিক সনেট রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৬৭টি সনেট উল্লেখযোগ্য। পূর্বযুগের তুলনায় এ যুগের সনেটে কবি গতানুগতিক পাশ্চাত্য (পেত্রার্কীয়, ফরাসী বা শেক্সপীরীয়) আঙ্গিক বহুলাংশে বর্জন করেছেন। 'A sonnet is a wave of melody' অথবা 'a moment's monument' ওয়াট্স্ বা রসেটির এই ভাব-সূত্রটুকু গ্রহণ করে, চৌদ্দ পংক্তির পরিমাপ রক্ষা করে,—বহিরঙ্গের আর সমস্ত আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ এ যুগে বর্জন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গঠনের দৃঢ়তায়,

ভাবের স্পন্দমান প্রগাঢ়তায় বল্কল-শাসিত শকুন্তলার পিণদ্ধ যৌবন-চিত্রটিই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়। অষ্টক-ষট্‌ক স্তবকভাগ বা মিলের বিশিষ্ট রীতি এই পর্বের রচিত প্রায় কোনও সনেটেই কবি রাখেননি। স্তবক গঠনে রবীন্দ্রনাথ

স্তবক গঠনে বৈচিত্র্য

কলাবৃত্তের তুলনায় এই পর্বের মিশ্রবৃত্তে কিছু বেশী ঐশ্বর্যই এনেছেন দেখা যায়। শুধু কয়েকটি নামোল্লেখ করেই আমরা এখানে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করছি। এ-প্রসঙ্গে কবির 'প্রকৃতির প্রতি' (মানসী), 'উর্বশী' (চিত্রা), 'উৎসর্গ' (চৈতালী), 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' (কথা ও কাহিনী) কবিতাগুলি দ্রষ্টব্য।

গম্ভীর ভাবের কবিতায় দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত ছন্দে গম্ভীর ভাবাত্মক কবিতায়ও ব্যবহার করেছেন। কথা ও কাহিনীর 'নকলগড়' এবং 'হোরিখেলা', কল্পনার 'হতভাগ্যের গান' প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হোরিখেলা কবিতায় দীর্ঘ দ্বিপদী (১০॥ ১০।) এবং দীর্ঘ চৌপদী (১০॥ ১০॥ ১০॥ ১০।) পংক্তিসমন্বয়ে ত্রিপংক্তিক স্তবক রচনাতেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আলোচিত পর্বের রবীন্দ্র-ছন্দ বিশ্লেষণে দেখা গেল, তিনি কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের সার্থক প্রয়োগ করে ছন্দের একটি নবীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করলেন; মিশ্রবৃত্তেও নবরীতির প্রবহমান পয়ার এবং মুক্তক রচনায় সফল হয়েছেন। দলবৃত্তেও গম্ভীর ভাবের কবিতা রচনা করে এ ছন্দের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। লক্ষ করবার বিষয় হল, তাঁর এই সকল নতুন ছন্দোরীতির পরীক্ষা সম্পর্কে সমকালীন অধিকাংশ কবিই উনবিংশ শতকে বিশেষ সচেতনার পরিচয় দেননি। এঁরা প্রত্যেকেই গতানুগতিক ভাবে মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রেরই অনুসরণ করে চলেছেন; কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমে পৌঁছে তাঁরা মুখ্যত ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন।

॥ খ ॥

রবীন্দ্রনাথের পাশে আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), মানকুমারী বসু, (১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০), বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯), এবং প্রমীলা নাগের (১৮৭৬-১৮৯১) নাম উল্লেখযোগ্য। কবিত্বের দিক থেকে উল্লিখিত প্রায় প্রত্যেক কবিই স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।—কিন্তু ছন্দের দিকে তেমন মৌলিকত্ব দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে কলাবৃত্ত ছন্দে যে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণরীতি প্রয়োগ করেছিলেন,—অধিকাংশ কবিই বিংশ শতকে না পৌঁছে সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারেননি। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ নাট্যসংলাপ থেকে স্বতন্ত্র, কবিতার উপযোগী যে মুক্তক ব্যবহার করেছেন, এ যুগে কোন কবিই সে ছন্দ ব্যবহারে উদ্যোগী হননি।—অবশ্য গিরিশচন্দ্র [এবং তাঁর আদর্শে অন্যান্য নাট্যকারেরা] নাটকে মুক্তক সংলাপ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই ব্যবহার করছিলেন।—পরবর্তী যুগেও গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি মুক্তক-সংলাপ-ধর্মী নাটক লিখিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি তাঁদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থে মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। সেখানে অনেকে মধুসূদনের আদর্শে যতিপ্রান্তিক (সমিল ও অমিল) পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ কবির পদ্যবন্ধে পূর্বযুগের বৈশিষ্ট্যগুলিই লক্ষিত হয়। দলবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণের বিশ্লিষ্টতা কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা এবং কথাকাহিনী কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। লৌকিক দলবৃত্তের এই পরিমার্জিত রূপ অধিকাংশ কবিই আলোচ্য যুগে উপলব্ধি করতে পারেননি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এ-যুগের কবিগোষ্ঠী তাদের রচনায় পূর্ববর্তী যুগের উত্তরাধিকারই বহন করেছেন,—রবীন্দ্র-কাব্যে ছন্দের দিক থেকে যে নতুন ধারা প্রবর্তিত হল অধিকাংশ কবিই তাঁদের কাব্যে সে-ছন্দোরীতি প্রয়োগ করেননি। যাঁরা করেছেন, সেও এই যুগ অতিক্রম করে বিংশ শতকের প্রারম্ভে এসে।—অবশ্য রবীন্দ্র ছন্দোরীতির পাশে দ্বিজেন্দ্রলাল যে মৌলিক ছন্দোরীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রথম সূচনা এ-যুগেই [আর্যগাথা ২য়

এ যুগের অন্যান্য কবিগণ

ভাগ, ১৮৯৩] হয়েছিল। তবে তাঁর এই রীতির শ্রেষ্ঠ ফসল আমরা পরবর্তী যুগে পেয়েছি বলেই দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হল।

নবীনচন্দ্র দাস

নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪) কয়েকটি গীতি কবিতা লিখেছেন এবং রঘুবংশ, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুন এবং চারুচর্যাশতকের (ক্ষেমেন্দ্র) বাংলা অনুবাদ করেছেন। তিনি মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে পয়ারবন্ধের ব্যবহার করেছেন। এখানে তার দুটি যতিপ্রান্তিক পয়ার-স্তবক এবং একটি সমিল প্রবহমান পয়ারের নিদর্শন তুলছি—

(১) যতিপ্রান্তিক পয়ার-স্তবক (ক খ খ ক— মিল)

তব রক্তাধরনিভ প্রবাল উপরে,
পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্খকুল,
প্রবাল-কণ্টকমুখে ফুটিয়া আকুল ;
ক্লেশে মুক্ত হয়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে।

[রঘুবংশ ঃ ১৩ স্বর্গ ঃ সা. সা চ. (৪র্থ খণ্ড), নবীনচন্দ্র দাস ঃ পৃ ১৩]

(২) যতিপ্রান্তিক পয়ার স্তবক (ক খ খ ক—মিল)

দূর হতে হেরি ওই পম্পা সরোবর
পথশ্রমে যেন নেত্র পিপাসু আমার,
মঞ্জুল বঞ্জুল পুঞ্জে পূর্ণ চারিধার,
ঈষৎ নড়িছে মাঝে সারস নিকর। [ঐ ঃ পৃ ১৬]

(৩) সমিল প্রবহমান পয়ার (ক খ ক খ—মিল)

বধূসহ চক্রবাক মিলন আশায়
থাকে বসি, নিশিযোগে তাদের মিলন
না ঘটে নিয়তি বশে, বিরহ ব্যথায়
কাঁদে তারা, দুর্নিবার দৈবের লিখন।

[কিরাতার্জুন ঃ ৯ম সর্গ ঃ সা. সা. চ. (৪র্থ খণ্ড), নবীনচন্দ্র দাস, পৃ ৩৫]

নবীনচন্দ্র প্রবহমান পয়ায় এবং অন্যান্য ছন্দোবন্ধ রচনায় মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অনুমিত হয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮) আলোচ্য যুগের সমস্ত কবিদের থেকেই সতন্ত্র ছিলেন। তাঁর গ্রাম্য কবিত্বে যেমন স্বতোৎসারিত, কিছুটা অমার্জিত, কিন্তু বলিষ্ঠ সরল প্রকাশভঙ্গি

ছিল,—ছন্দেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রসূন' (১৮৭০) প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য শেষ কাব্যগ্রন্থ 'বৈজয়ন্তী'র প্রকাশকাল ১৯০৫। অবশ্য জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কবির লেখনী সজীব ছিল ;—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রখ্যাত কবিতা ছড়ানো রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় তাঁর বাছাই কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রধানত মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখেছেন। এই যুগে দলবৃত্তের এত বহুল এবং সার্থক ব্যবহার আর কারও কবিতায়ই লক্ষিত হয় না। অধিকাংশ কবি দলবৃত্ত ছন্দকে লঘু কবিতায় বা সংগীতে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবমূলক কবিতায় এ-ছন্দের সার্থক ব্যবহার করলেও এত ব্যাপক ব্যবহার 'ক্ষণিকা' (১৯০০) লিখবার পূর্বে সুরু করেননি। তবে কথ্যভাষায় মার্জিতরুচির কবিতা রচনার পক্ষে এ-ছন্দের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস পল্লীকবি। পল্লীর মানুষেরা অকৃত্রিম যে ভাষায় কথা বলে ছন্দের বাঁধনে সেই ভাষাতে তাদেরই মনের কথা (কিছুটা হয়তো অমার্জিতভাবেই) আশ্চর্য সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তিনি প্রকাশ করেছেন। ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই,—সে কারণেই এ ছন্দ তাঁর হাতে এত স্বাভাবিক এবং সজীব হয়ে উঠেছে। তাঁর দলবৃত্ত রীতির কবিতা পড়লে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যায় যে বাংলার কথ্য বাচনভঙ্গির পক্ষে এ-ছন্দ কত স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দময় হয়ে উঠতে পারে সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউই এই ছন্দের এত সুষ্ঠু সার্বজনীন প্রয়োগ করেননি। বাংলা ছন্দের ক্রম অগ্রগতির ধারায় সেদিক থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাসের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আলোচ্য যুগে অধিকাংশ কবি রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কবিতায় মধুসূদন-হেমচন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দধারার অনুসরণ করেছেন,—কদাচিৎ দু-একজন কবি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে অগ্রসর হয়েছেন। কোনও কোনও কবি (সম্ভবত রবীন্দ্র-প্রভাবেই) প্রাচীন বৈষ্ণব পদের আদর্শে লঘু-গুরু উচ্চারণে পদ রচনা করেছেন, ভারতচন্দ্র বা হেমচন্দ্রের আদর্শে অনেকে কৃত্রিম উচ্চারণের সংস্কৃত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে পর্বযতির স্পন্দিত নৃত্যভঙ্গি এবং কলা-প্রসারণ জনিত গীতিসুর-প্রাধান্য কমিয়ে এ-ছন্দে যে স্বাভাবিক কথ্যভাষার আবেদন পরিস্ফুট করা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সেটি উপলব্ধি করেন। তবে তিনি মার্জিত রুচির ভাষায় পরিচ্ছন্নভাবে এ-ছন্দ ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দচন্দ্র

দাস তাঁর স্বভাব কবিত্বের গ্রাম্য রুচিতে তাঁকে যেন আরও সাবলীল, আরও কথ্য বাচনভঙ্গির কাছাকাছি এনে একান্তই পল্লীর মানুষের প্রাণের সামগ্রী করে তুলেছেন। কবির অকৃত্রিম, হয়তো বা কিছুটা অবাঞ্ছিত রুচিবোধ এ-ছন্দে আরও বলিষ্ঠতা,—প্রকাশের স্বাভাবিকতা এনে দিয়েছে।

দলবৃত্তের স্বাভাবিক বাক্‌ধর্মী প্রকাশভঙ্গি

এখানে তাঁর দলবৃত্ত রীতির কবিতা থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

(১) আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা।
"না ভাই তুমি দুষ্টু বড়,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উদ্‌লা করে ফেলা!"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে কারে এই এক নূতন খেলা।

[কস্তুরী (১৮৯৫)ঃ এই এক নূতন খেলা]

(২) স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়,—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়।

[নব্যভারত (১৩১৪) পৌষ ঃ জন্মভূমি]

(৩) ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছটফট...
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

[গোবিন্দ চয়নিকা ঃ আমার চিতায় দিবে মঠ, পৃ ৮৮]

স্তবক রচনা

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং রুদ্ধদলের স্পন্দনসৃষ্টিতে কবি চমৎকারিত্ব এনেছেন। এখানে তারও একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

(৪) দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী মিশ্রিত স্তবকবন্ধ :

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শতবজ্র গর্জিবে গর্জুক।
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ।
হলে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি লণ্ডভণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক।
গম্ভীর গৌরব ভরা,
মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া
কি আনন্দ কি প্রচণ্ড সুখ।

[গোবিন্দ চয়নিকা : কর্তব্য (১৩১০) : পৃ ৩১]

সনেট রচনা

গোবিন্দচন্দ্র দাস মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অনেকগুলি সনেট লিখেছিলেন। মিলবিন্যাস এবং স্তবক বিভাগে তিনি প্রধানত শেক্সপীরীয় সনেটের আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। এখানে কবির একটি সনেট উদ্ধৃত করছি।—

সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর করিয়া,
আদরে যতনে বিধি রচিলা তোমায়,
সমস্ত বিশ্বের শোভা-সারভাগ নিয়া,
যৌবন ফুটায়ে দিলা পুষ্প-পূর্ণিমায়।
নীল নেত্র, রক্ত ওষ্ঠ, চারুচন্দ্রানন,
ও পীন উন্নত বক্ষ কতই বিশাল,
ব্যাপিয়া রয়েছে কত স্বপ্ন-জাগরণ,
কত যে জীবনমৃত্যু—ইহ পরকাল।

কিন্তু রে রচিতে তোর তনু অতুলন,
ফুরাইয়া ছিল বুঝি শোভার ভাণ্ডার,
তাই কি দেহের মত হয় নাই মন,
কোমল সৌন্দর্য বুঝি নাহি ছিল আর ?
দিয়েছে অপূর্ণপ্রাণ পুরিয়া পাষাণে,
শত অশ্রুপাতে তাই গলিতে না জানে।

[গোবিন্দ চয়নিকা ঃ প্রেম-গীতি-প্রণয় ঃ

নারীর প্রাণ (১২৯৬) ঃ পৃ ৯৮]

গোবিন্দদাস কোথাও বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেননি। এমন কি সাৎমাত্রা পর্বের যে ছন্দ লিখেছেন সেখানেও মিশ্রবৃত্ত রীতির আদর্শেই রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ থেকে ছয় বৎসরের বড়ো ছিলেন। ১৮৯৫তে (১৩০২ কার্তিক) তাঁর 'কবিতা ও গান' প্রকাশিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী কাব্যগ্রন্থ এবং বিদায়-অভিশাপ, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা ও মালিনী,— প্রবহমান পয়ারবন্ধে রচিত নাট্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানতম তিনটি আধুনিক ছন্দোরীতিই ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে।

ছন্দে পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব

লক্ষ করবার বিষয় হল, স্বর্ণকুমারীর পদ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব প্রায় কিছুই পড়েনি। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দে রুদ্ধদল ব্যবহারে সেই পূর্বযুগের দ্বিধা তাঁর কবিতায়ও রয়ে গেছে। কখনও নির্ভুল কলাবৃত্তের উচ্চারণে লিখেছেন,

উছলে সরোবর, পত্র মরমর,
কম্পে থরথর পান্থ নিরাশ;

[কবিতা ও গান ঃ শ্রাবণ মল্লার ঃ পৃ ২১৩]

কোথাও মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতিতে লিখেছেন,—

রজনী সুগভীর নিদ্রায় ধীরস্থির

... ...

গাথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবস্ময়

[ঐ, বিরহ কারে কয় ঃ পৃ ৮]

পূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য-বিচারে দেখেছি, কবিরা ছন্দে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কোমলতা (কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণের আমেজ) আনতে হলে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ পরিহার করে ছন্দ রচনা করতেন। স্বর্ণকুমারীও সেই রীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন—

এ হেন বরষায় কাহার ভরসায়
দিবস যাপি ?
কাহার প্রেমগুণে সযতনে
হৃদয় তাপি ?
কাহার আঁখিতারা মাতোয়ারা
করে এ প্রাণ মোর ?
কাহার সুধা চুমে এক ঘুমে
জীবন করি ভোর ?

[কবিতা ও গান ঃ গান ঃ পৃ ২১২]

এখানে কবি একটিও যুক্তবর্ণ ব্যবহার করেননি। পর্ববিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য রেখেছেন ;—কোথাও ৭।৭।৫।, কোথাও ৭।৪।৫।, কোথাও বা ৭।৪।৭।-মাত্রার যতি ভাগ দিয়েছেন।[৫]

কলাবৃত্ত রীতির কবিতা

৫। স্বর্ণকুমারীর বিংশ শতকে রচিত একাধিক কবিতা গানে অবশ্য কলাবৃত্তে রুদ্ধদল দ্বিমাত্রকরূপে ব্যবহারের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একটি নিদর্শন দিচ্ছি এখানে—

ওগো মধুর ছন্দা,, হৃদয়ানন্দা,
না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্বে অর্ঘ্য রচিয়া, জীবন ধন্য মানি।

... ...

স্বর্ণকুমারী মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই (সমিল যতিপ্রান্তিক ছন্দোবন্ধে) অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। তবে সেখানে শব্দচয়নে, ভাবের প্রকাশনায় সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ছয়মাত্রা পর্বভাগের মিশ্রবৃত্ত রীতির একটি উদাহরণ তুলছি,—

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা ;
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত !
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি ;
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা তুমি বিধি ! মিথ্যা তব সৃষ্টি'
বৃথা এ সৌন্দর্য, নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত ! [কবিতা ও গান : যামিনী]

ছয়মাত্রার পূর্ণপদ ঠিক রেখে প্রয়োজন মতো কবি ছোটবড়ো অপূর্ণপদ বা যতিপর্ব এনে ছন্দের সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন।

দলবৃত্তের ব্যবহার

স্বর্ণকুমারী লঘু ভাবের কবিতায় ছাড়া দলবৃত্তের ব্যবহার করেননি। এখানে হাস্যরসাত্মক একটি কবিতা থেকে এ-ছন্দে তাঁর নৈপুণ্যের একটি উদাহরণ তুলছি।—

তুমি আমার—
পান্তা ভাতে বেগুন পোড়া, ফ্যানসা ভাতে ঘি,
কেমন করে বলব বধু, তুমি আমার কি।

আমি না চাহি অন্ত বিভব ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি, চাহিনা সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃত বাণী
[সা. সা. চ (২য় খণ্ড) : স্বর্ণকুমারী দেবী : পৃ ৩২ দ্র]

অনুজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি এমন বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতিব কবিতা লিখেছিলেন অনুমিত হয়।

তুমি আমার জরি জরাও, তুমি আমার কোটা,
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোঁটা।

[কবিতা ও গান ঃ ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল ঃ পৃ ১৮৫]

দেবেন্দ্রনাথ সেন

আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮–১৯২০) বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। ১৮৮০ থেকে ১৯১৩,—দীর্ঘ তেত্রিশ বছরে তিনি কুড়িটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে একটি স্বকীয় রীতি প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্র প্রভাবকে অনেকাংশে অতিক্রম করে ভাব এবং ছন্দের দিক থেকে মৌলিক ধারা রক্ষা করতে তিনি সফল হয়েছেন। অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি পুরাতন স্কুলের,—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত।...আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু। ..সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবও আমার কবিতায় বোধ হয় আপনারা লক্ষ করিয়া থাকিবেন।"...[সা. সা. চ. (৫ম খণ্ড) ঃ দেবেন্দ্রনাথ সেন ঃ পৃ ২০-২১,] ১৯১১-তে কবিকৃত এই মন্তব্যের আলোকে তাঁর কবিতার ভাব এবং আঙ্গিক উভয়েরই বিচার চলতে পারে।

প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন

মধুসূদন-হেমচন্দ্রের মতো (এবং উনবিংশ শতকের অন্যান্য অধিকাংশ কবির মতো) দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। পূর্বোক্ত উভয় কবির আদর্শেই তিনি প্রবহমান পয়ার, যতিপ্রান্তিক দ্বিপদী, ত্রিপদী, প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ বেশী ব্যবহার করেছেন। আবার এই যুগের (এবং পূর্বযুগের) বহু কবির আদর্শেই (হেমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম) মেঘদূতের অনুবাদে, হরিমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত দেবদেবীর স্তোত্র রচনায় কৃত্রিম সংস্কৃত উচ্চারণের (লঘু-গুরু) ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকে এসে কবি বৃন্দদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণে রবীন্দ্র-আদর্শে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতিতেও কবিতা লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতির কিছু সনেট রচনায় এবং মিত্রাক্ষর কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব লক্ষিত হয়।

মধুসূদনের সনেট প্রবর্তনের পর এই যুগে রবীন্দ্রনাথই আবার সনেট লিখতে সুরু করেছিলেন পূর্বে উল্লেখ করেছি।—এই যুগে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের

প্রভাবে অনেক কবিই সনেট রচনা সুরু করেন। ভাব ও ছন্দের সংবদ্ধতায় রবীন্দ্রনাথের পর আলোচ্য যুগে দেবেন্দ্রনাথই সনেট রচনায় শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ দেড়শতাধিক সনেট লিখেছেন। মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কার আদর্শ গ্রহণ করেননি। প্রধানত শেক্‌স্‌পীয়রের এবং অংশত মিল্‌টনের অনুসরণ করেছেন।

এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট লেখক

শেক্‌স্‌পীয়রের আদর্শে তিনটি চতুষ্পংক্তিক স্তবক শেষে একটি দ্বিপংক্তিক মিলবন্ধে (couplet) তিনি অধিকাংশ সনেট রচনা করেছেন। এখানে সম্ভবত কবি আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র শেক্‌স্‌পীরীয় মিলের সনেটাদর্শ গ্রহণ করেছেন। অনেকগুলি সনেটে মিল্‌টনের আদর্শে অষ্টক-ষটক স্তবক-বিভাগ রাখেননি,—এবং কয়েকটি সনেট মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। এখানে সনেটগুলি একটি পূর্ণ কবিতার কয়েকটি পংক্তি অনুচ্ছেদ (verse paragraph) হয়ে উঠেছে।—এ-রীতি মধুসূদনও গ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি সনেটে মহাপয়ার পংক্তি ব্যবহার করলেও অধিকাংশ সনেটে প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন।[৬] এখানে কবির প্রখ্যাত দু-একটি সনেটের উদাহরণ সহ অন্যান্য পদ্যবন্ধেরও কিছু কিছু উদাহরণ তুলছি।—

		মিল
(১)	তবু ভরিলনা চিত্ত। ঘুরিয়া ঘুরিয়া	ক
	কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে,	খ
	বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া	ক
	কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;	খ
	হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;	ক
	করিলাম পুণ্যস্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে;	গ
	"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,	ক
	করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে	গ

৬। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যেই এম. এ. ডিগ্রি নিয়েছিলেন। পদ্যবন্ধ রচনায় মধুসূদনের মতো ইংরেজি ছন্দের প্রভাব তাঁর রচনায়ও পড়েছে। তবে প্রধানত মধুসূদন হেমচন্দ্রের আদর্শেই তিনি বাংলা ছন্দের কাঠামো তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা, ... ঘ
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া ... ক
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া ... ক
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ মালা। ... ঘ
তবু ভরিলনা চিত্ত। সর্বতীর্থ সার, ... ঙ
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার। ... ঙ

[অশোক গুচ্ছ : মা : পৃ ২৯]

কবিতাটির মিল-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সমগ্র কবিতায় একটি ভাবগ্রন্থি দিয়েছেন। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ রাখেননি।

সনেটকার রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-সনেটের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ যে আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে অনুমান অমূলক নয়। একটি সনেটে কবি রবীন্দ্র-সনেট প্রশস্তি গেয়েছেন।[৭] সনেটটিতে সনেট রচনাদর্শ সম্পর্কে কবির মনোভাবও সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।—

মিল

(২) হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট ... ক
কি সরস! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে, ... খ
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট, ... ক
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে। ... খ
আধেক নগন তনু বাকল ভূষণে ... গ
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী ; ... ঘ
সলিলে কাঁপিছে শশী ; চঞ্চল নয়নে ... গ
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরুগুরু করি। ... ঘ
নব-বলয়িতা লতা বালিকা যৌবন ... ঙ
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে, ... চ
লাজে বাধ বাধ বাণী, রাগের আলসে ... চ
ঢল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন। ... ঙ

৭। প্রায় একই ভঙ্গীতে পরবর্তীকালে মোহিতলাল সনেটের মাধ্যমে অনুরূপ দেবেন্দ্র সনেট প্রশস্তি গেয়েছিলেন। [স্বপনপসারী : দেবেন্দ্রবাবুর সনেট : ১৩২৮ (১ম সং) পৃ ৮৬ দ্র]

পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে ... ছ
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে। ... ছ

[পারিজাত গুচ্ছ ঃ রবীন্দ্রবাবুর সনেট ঃ পৃ ২৯]

এখানে বিশুদ্ধ শেকস্‌পীরীয় রীতিতে কবি সনেটে স্তবকগুচ্ছ সাজিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সনেটের ভাগবত একটি সাদৃশ্যও রয়েছে। উভয়েই আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের তুলনায় ভাবের প্রগাঢ়তার প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতে বিচিত্র আঙ্গিক-মিলের পরীক্ষা করেছেন বটে,—কিন্তু পরবর্তী প্রায় সমস্ত সনেটেই একমাত্র চতুর্দশ পংক্তি-পরিসর ছাড়া সনেটের প্রচলিত আর সমস্ত আঙ্গিকের বাঁধাবাঁধি ত্যাগ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সনেটে এতটা আঙ্গিকগত নিরাভরণতা দেখা দেয়নি।

অন্যান্য ছন্দোবন্ধ

এবারে কবির অন্যান্য ছন্দোবন্ধের দু-একটি উদাহরণ তুলছি। ..

(৩) মধুসূদনের আদর্শে রচিত প্রবহমান পয়ার,—

বঙ্গাকাশে শুক্রতারা যে মধুসূদন
মহাপ্রাণ মহাকবি, যে মহাজনের
প্রাণসিংহাসনে বসি, হে আনন্দময়ি,
বাজাইলে যেই বীণা অপূর্ব ঝঙ্কারে,
চমকিয়া, হরষিয়া, বিশ্ববাসীজনে,
সেই বীণা লয়ে করে অয়ি বীণাপাণি
উর আসি (জানি তব অনন্ত করুণা)
উর আসি এ দাসের চিত্তপদ্মাসনে।

[পারিজাতগুচ্ছ ঃ দশানন বধ কাব্য ঃ পৃ ১৪৮]

এখানে ভাষা ও ছন্দে (এবং বন্ধনী ব্যবহারে) কবি বহুলাংশে মধুসূদনের অনুসরণ করেছেন। তবু স্বীকার করতে হয়, সেই বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফুরণ এ-কাব্যে ঘটেনি।

(৪) মিশ্রবৃত্ত ঃ দীর্ঘ ত্রিপদী (৮।।১০।।১০।) ঃ

জীবনের মত কভু সুনিবিড় আহলাদকারিণী
রবিকরে পূর্ণ প্রকাশিতা।

মরণের মত কভু সুগভীর মর্মপরশিনী
রহস্য কুজ্ঝটি বিজড়িতা।

[অপূর্ব নৈবেদ্য : অপূর্ব কবিতা]

রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' (চিত্রা) কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির মিল রয়েছে। উর্বশী ১৩০২তে লেখা হয়, এ কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৯; রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মহুয়াতেও ('মিলন' কবিতা দ্র.) এই ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ভাব-গাম্ভীর্যের দিক থেকে এমন দীর্ঘপদী মিশ্রবৃত্ত রীতির একটি বিশেষ আবেদন আছে।

(৫) ছয়মাত্রা পর্বভাগের কলাবৃত্ত :

বাঞ্ছিত সনে চির বিচ্ছেদ
সজল জলদ সম,
ধীরে ধীরে যবে ঢাকিয়া ফেলিবে
মানস আকাশ মম।

[হরিমঙ্গল : যাচঞা : (১৯০৫ সং) পৃ ৬]

কবির বিংশ শতকের পূর্বেকার কোনও কাব্যে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(৬) সংস্কৃত উচ্চারণের (মন্দাক্রান্তা) ছন্দ :

— — — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — — ⏑ — — ⏑ — —
রৌদ্রে ক্লান্তা। বি ক ল কু মু দী। কম্পিতা দে হ শাখে,।
বাণে বিদ্ধা বিভল হরিণী—আকুলা, ম্লাননেত্রা।
নৃত্যোন্মত্তা মুখর যমুনা শিঞ্জিতা কুঞ্জে,
ক্ষোভে যাপে দিবসরজনী রাধিকা কৃষ্ণহারা।[৮]

[অপূর্ব মেঘদূত : ১ম স্তবক]

(৭) দলবৃত্ত পয়ার : মিল

ফুলের আদর, চাঁদের আদর, কবিতা নয়, বাতিক। ক
বাতিল যাহা, বাতিল তাহা, ওরে আমার মাণিক। ক

৮। "মন্দাক্রান্তা" ম্বুধিরসনগৈমো ভনৌ যযুগ্মম্। [ছন্দোমঞ্জরী ১৬৪ শ্লোক]
যাহার পাদগুলি যথাক্রমে ম ভ ন গ গ য গ—গণে গঠিত হয় এবং যথাক্রমে চতুর্থ ষষ্ঠ ও সপ্তমাক্ষরে (syllable) যতি থাকে তাকে মন্দাক্রান্তা ছন্দ বলে।

তারার আদর, পাখির আদর, কেবল ভাঁড়াভাঁড়ি। খ
মতির জেল্লা, উষার হাসি, তোর উপমায় বেঠিক,— ক
সাত রাজার ধন মানিক আমার, সাত রাজার ধন মানিক। ক

[অপূর্ব শিশুমঙ্গল ঃ সাত রাজার ধন মানিক ঃ পৃ ৪৬]

এখানে স্তবকের তৃতীয় পংক্তিটি মিলবিহীন রেখেছেন, বাতিক মানিক বেঠিক— এ-মিলও শিথিল মিলের নিদর্শন।

কবি শিথিল পদবন্ধেও (মুক্তক আভাসযুক্ত) কবিতা লিখেছেন (দ্র. অপূর্ব নৈবেদ্য ঃ শোভা ঃ পৃ ৪৮)। সরল সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে স্তোত্ররচনা করেছেন (দ্র হরিমঙ্গল ঃ দুর্গাষ্টকম্, সরস্বতী স্তোত্রম্ প্রভৃতি)। রবীন্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্র-প্রবর্তিত,—উভয় ছন্দোবন্ধ সম্পর্কেই কবি সচেতন ছিলেন। তবে তাঁর আকর্ষণ ছিল মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ছন্দের প্রতি। সেকথা তিনি স্বীকারও করেছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

এই যুগে যে কয়জন মহিলা কবি বাংলা সাহিত্যে যশের অধিকারী হয়েছিলেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২০) তাঁদের অন্যতম। ১৮৭৩ থেকে ১৯০৭,—সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসরকালে নয়টি কবিতা গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা কবিতাকে সঞ্চয়-সমৃদ্ধ করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় একটি স্বভাবসুন্দর কোমল কবিমনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভাষা, ছন্দ, শব্দগ্রন্থি,—তাঁর কবিতায় ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্যে একান্ত স্বাভাবিক রূপেই বিকাশ লাভ করেছে। রীতিগত দিকে তিনি আলোচ্য যুগের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রধানত মিশ্রবৃত্ত (পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি পদবন্ধে) অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। বহু বিচিত্র মাপের পংক্তি ও স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। নাটক রচনায় সমিল ও অমিল মুক্তক এবং প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন। কাব্যে প্রবহমান (অমিল) মহাপয়ার ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ তাঁর বিংশ শতকে রচিত কাব্য গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়।—তবে আলোচ্য যুগ-পরিসরে তিনি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির প্রকৃত উচ্চারণ-রহস্য ধরতে পারেননি।—এখানেও লেখিকা সমকালীন কবিদের সগোত্রীয়। দলবৃত্ত ছন্দ শিশুপাঠ্য কবিতায় বা লঘু কবিতায় চমৎকার ব্যবহার করেছেন। অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবের কবিতায় এ ছন্দ চালাতে চেষ্টা করেননি। বৈষ্ণব ব্রজবুলি গানের ছন্দ কবিকে

আকৃষ্ট করেছিল।—এ-ছন্দে একাধিক সার্থক কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-যুগের অধিকাংশ কবি কম-বেশী কিছু সনেট রচনা করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী ছোট পরিসরের অসংখ্য কবিতা লিখলেও সনেট রচনায় আকৃষ্ট হননি এটি লক্ষনীয়। এখানে কবির কয়েকটি ছন্দবৈচিত্র্যময় পদ্য রচনার দৃষ্টান্ত তুলছি।—

(১) মিশ্রবৃত্ত রীতির দ্বিপদী ঃ ৮॥৮I

আঁকা বাঁকা গিরিপথ, উঁচু নীচু অসমান,
চলেছে পথিক দুটি, গাহিয়া স্বপন-গান।
সভয়ে উঠিছে সুর শিহরি পাষাণ-কায়,
চকিতে আকুল আঁখি উভে চারিদিকে চায়।
ধীরে ধীরে কেঁদে ধীরে শূন্যেতে মিলিছে তান।
আঁকা বাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান।
সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা ভায়,—
আকুল ব্যাকুল হৃদি উভয়ে উভয়ে চায়।

[আভাষ ঃ পথিক (১৮৯০)]

৮॥৮I-মাত্রার দ্বিপদী পংক্তি উনবিংশ শতকের পদ্যবন্ধে সুপ্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও তখন এমন রীতির কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ৮ মাত্রার পর ৬, বা ১০ মাত্রার পদ অধিকতর সুপ্রযুক্ত উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ এ-রীতি ত্যাগ করেছিলেন। সাম্প্রতিক কবিতায় এমন দ্বিপদীবন্ধ বিরল।

(২) শব্দমধ্য-রুদ্ধদলের একমাত্রক সংশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের মিশ্র ছন্দ ঃ

॥
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—

॥ ।
তপ্ত তাহাতে অহর্নিশ,

॥ ।
ভুক্ত সেথায় কোটি বসুন্ধরা,

॥ ।
সুপ্ত সেথায় শত সন্ধিৎরা,

॥
দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা
বিকীরিত জ্যোতি দশদিশ ;
॥
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
॥ ।
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ। [অর্ঘ্য ঃ প্রভেদ (১৯০২)]

বিংশ শতকের প্রথমে লিখিত এ-কবিতাতেও কবি কলাবৃত্তে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হননি। মিশ্রবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত—দুটি ছন্দ-প্রকৃতির উচ্চারণগত পার্থক্য সম্পর্কেই কবি এখনও সচেতন নন। তাই কখনও শব্দের মাঝে রুদ্ধদল একমাত্রায় (মিশ্রবৃত্ত রীতি অনুসারে) কখনও দুই মাত্রায় (কলাবৃত্ত রীতি অনুসারে) ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য আরও পরে (১৯০৬) কবি যুক্তবর্ণে দুই মাত্রা দিয়ে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির কবিতাও লিখেছেন। যেমন,—

(৩) শুধু মৃদুগীতি মধুর ছন্দে
জাগেরে অলস কামনা ;
প্রলয়ের তালে আর বাজাইয়া
গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনা।
[স্বদেশিনী ঃ আহ্বানগীত (১৯০৬)]

যুক্তবর্ণ-বিহীন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের পাঁচমাত্রার (তিন-দুই) পর্বভাগের একটি দৃষ্টান্ত দিই। -

(৪) বিমল নিশি, পুলক দিশি, রজত হাসি হাসিছে,
আপন হারা বিবশ ধরা সুরভি বাস শ্বাসিছে।
ললিত কায়া হেলিত ছায়া দোদুল ফুল লতিকা,
সমীর চুমে, তটিনী ঘুমে, উরসে তারা মালিকা।
[আভাস ঃ বাসন্তী যামিনী (১৮৯০)]

এখানে কবি কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-আমেজ আনতে চেয়েছেন, যুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের ব্যবহার বর্জন করে। উনবিংশ শতকে প্রায় কোনও কবিই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত

কলাবৃত্ত রীতির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারেননি। গিরীন্দ্রমোহিনী তার কিছু ব্যতিক্রম নন।

বৈষ্ণব পদাবলীর (লঘু-গুরু) ছন্দের একটি উদাহরণ দিই।—

(৫) নওল জলধর ছাওল অম্বর,
নিবিড় তিমির ঘোর ;
সঘন দুরুদুরু গগন গুরুগুরু,
দাদুরী করত সোর।
তড়িৎ চমকন, নিকষ ঘনঘন,
ঝরণ বরষণ নীর ;
অনিল স্বনস্বন, বজর নিপতন,
তিমির দিকে দিকে চির।

[অর্ঘ্য ঃ আষাঢ়ে]

পদটি বিদ্যাপতির প্রখ্যাত 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদের সঙ্গে তুলনীয়। বৈষ্ণব পদের সংগীতধর্মী লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দ কবির বিশেষ প্রিয় ছিল। আভাস (১৮৯০), সন্যাসিনী (১৮৯২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও কবি এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

কবির নাট্যসংলাপের মুক্তকের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ

(৬) রাণাকুম্ভ। হায়,
আসিয়াছি নির্জনেতে বিশ্রামের আশে,
সিঞ্চিবারে শান্তিবারি অবসন্ন প্রাণে,
কিন্তু ঘোর আত্মপ্রতারণা,
সত্যই কি করিতেছি শান্তি ভোগ আমি ?
এর চেয়ে কার্যে লিপ্ত থাকা,
সে বরং ছিল ভাল ; ছিলাম ভুলিয়ে।
এই শান্ত নিরজনে মনোরম স্থানে,
হৃদয় ব্যাকুল আরো পাইতে তাহারে।
মনে হইতেছে,
সমগ্র ধরণী খুঁজে ধরে আনি গিয়ে। [সন্ন্যাসিনী ঃ ৩।১]

গিরীন্দ্রমোহিনী নাট্যসংলাপের মুক্তকে গিরিশচন্দ্রের তুলনায় পূর্ণ পয়ার পংক্তি বেশী

ব্যবহার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁর মুক্তকে সংলাপধর্মী ভাবমুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যও কম প্রকাশ পেয়েছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), ১৮৮৪ থেকে ১৯১২,—এই ২৮ বছরে পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলা কাব্য-আসরে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। অক্ষয়কুমার মূলত মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। সে যুগে সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কবিকে 'নিপুণ শব্দশিল্পী' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। বড়াল কবি এই ছন্দের শব্দ গ্রহণে, ধ্বনি তরঙ্গিত সুনিপুণ দলবিন্যাসে, পদ-বিভাগে এবং পংক্তি ও স্তবক গঠনে যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন,—কবিত্বের ভাব প্রকাশে তা বিশেষ সহায়ক হতে পেরেছে। অক্ষয়কুমার দলবৃত্ত ছন্দ বিশেষ ব্যবহার করেননি,—তবে এ ছন্দ যে তাঁর অজানা ছিলনা, ২।১টি লঘু কবিতায় তার সাক্ষ্য রয়েছে। কবি এ-যুগে অন্যান্য কবিদের মতোই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলেই অনুমান করা যায়। কদাচিত ছন্দে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের আমেজ আনতে হলে তিনি যুক্তবর্ণ পরিহার করবারই চেষ্টা করেছেন। সনেট রচনা (সম্ভবত রবীন্দ্র-প্রভাবেই) এ-যুগে আবার সুরু হয়েছিল। অক্ষয়কুমার কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন; তিনি পেত্রাকীয় আদর্শই নিয়েছিলেন। এখানে কবির কয়েকটি ছন্দ-নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।

(১) মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী বন্ধ ঃ ৮।।৬।।৬।

নমি আমি প্রতিজনে,—আ-দ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস।
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি, কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম-চর্ম-কার।
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রিভার। [প্রদীপ (১৮৮৪) ঃ মানববন্দনা]

এখানে ধ্বনি-গাম্ভীর্য, শব্দের সূক্ষ্ম অনুপ্রাস, রুদ্ধদলের স্পন্দন কবিতার ভাব-গাম্ভীর্যকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে।

(২) মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘচৌপদী (৬।৬।।৬।৬।।৬।৬।।৮।) ও দীর্ঘদ্বিপদী (৬।৬।।৮।) মিশ্র স্তবকবন্ধ ঃ

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্মী – গর্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্তি ছবি,
তবু কাঁদ কাঁদ,– জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

[কনকাঞ্জলি (১৮৮৫) ঃ উৎসগ

এখানে কবি ছয়মাত্রার দুটি পর্ব নিয়ে দীর্ঘ বারোমাত্রার পদ গঠন করেছেন। সাধারণত ছয়, আট এবং দশ মাত্রায় পদ গঠিত হয়। কবি ভাবগাম্ভীর্য পরিস্ফুটনে দীর্ঘতর বারোমাত্রার পদ রচনা করেছেন।—এ রীতি উনবিংশ শতকের কবিদের রচনাতেই দেখা যায়। রবীন্দ্রযুগের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মিশ্রবৃত্ত রীতির বারো মাত্রার পদগঠন দৃষ্টান্ত বিরল হয়ে এসেছে।

(৩) মিশ্রবৃত্ত কখখক, গগ—পংক্তিমিলের স্তবক বন্ধ ঃ

ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম।
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর।
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটির—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম।
অর্ধনিদ্রা জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি।

[শঙ্খ (১৮৯০) ঃ রবীন্দ্রনাথ

কখখক—মিলে পয়ার বন্ধের (যতিপ্রান্তিক) স্তবক কবি আরও রচনা করেছেন।

(৪) মিশ্রবৃত্ত ১০।।১০।—দীর্ঘ দ্বিপদী ঃ

	মাত্রাভাগ	মিল
কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার	১০।।	ক।।
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির,	১০।	খ।
গড়িছে—ভাঙিছে বারবার –	১০।।	ক।।
এ কি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির।	১০।	খ।

[শঙ্খ ঃ প্রতিভার উদ্বোধন

এই রীতির কবিতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বহু কবিই উনবিংশ শতকে রচনা করতেন।

(৫) মিশ্রবৃত্ত ঃ ৮।।৬। মাত্রার পয়ার ঃ মিল ককখক ঃ

নদীকূলে তরুতলে দূর্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি শুধু চেয়ে রব মদির আলসে—
সেই স্বর্গ ওঠে যাহে দেবত্ব বিকাশি! [শশ্ব ঃ পান্থ]

ফারসী 'রুবাই' নামক চতুষ্পংক্তিক স্তবকের মিল (ককখক) কবি এখানে গ্রহণ করেছেন।

(৬) যুক্তবর্ণ-বিহীন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দ ঃ	মাত্রাভাগ	মিল
আজি মধু-যামিনী!	৪।৩।	ক।
জোছনা আকুল,	৬।	খ।
ঝরিছে বকুল,	৬।	খ।
তটিনী দোদুল-গামিনী;	৬।৩।	ক।
দূরে ডাকে পিক,	৬।	গ।
ফুলে ছায় দিক	৬।	গ।
আঁখি অনিমিক কামিনী।	৬।৩।	ক।

[প্রদীপ ঃ মধুযামিনী]

এ-যুগে ৮।।৮। মাত্রার দ্বিপদী যথেষ্ট লেখা হত। অক্ষয়কুমার এই রীতির অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। পেত্রাকীয় রীতির সনেট লিখেছেন। লৌকিক রীতির দলমাত্রিক ছন্দও ব্যবহার করেছেন। বাহুল্য বোধে আর দৃষ্টান্ত তুললাম না। অক্ষয়কুমার মূলত মিশ্রবৃত্ত রীতির দীর্ঘ পদভাগের ছন্দেই চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। এ-ছন্দের ধ্বনিগত ও ভাবগত শক্তি তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে,—এখানেই কবির সাফল্য।

মানকুমারী বসু

বাংলা সাহিত্যে এই যুগে কয়েকজন প্রখ্যাত মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। মানকুমারী বসু (১৮৬১-১৯৪১), মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মাত্র ১২।১৩ বৎসর বয়সেই তিনি কবিতা লিখতে সুরু করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে' বীররসপূর্ণ একটি কবিতা লিখে স্বামীকে উপহার

দিয়েছিলেন,—কবি নিজের আত্মকথায় এ-তথ্য জানিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। সমগ্র জীবনভোর বহুবিধ কবিতা রচনা করেছেন।

মানকুমারী পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩) ও 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থ দুটি সমধিক জনপ্রিয় হয়েছে। 'বীরকুমারবধ কাব্য' (১৯০৪) নামে প্রবহমান পয়ার ছন্দে মধুসূদনের আদর্শে তিনি একটি মহাকাব্যও লিখেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সোনার সাথি' ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয়েছে। কবি মুখ্যত মিশ্রবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখেছেন। তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না। বিবিধ ছন্দোবন্ধে সললিত সহজ আড়ম্বরবিহীন প্রকাশভঙ্গি মানকুমারীর কবিতার একটি বিশেষ আকর্ষণ। কবি মিলবিন্যাসে, পর্ব-পদ গঠনে এবং স্তবক রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর কয়েকটি বৈচিত্র্যময় ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি করছি। -

(১) মিশ্রবৃত্ত : ৬।৫। মাত্রাভাগের পংক্তি : মিল—কককখ গগগখ।

কুঞ্জনিল বনে বিহগপুঞ্জ
গুঞ্জরিল ভৃঙ্গ মধুরগুঞ্জ,
কুসুমে ভরিল কাননকুঞ্জ,
সে ললিত শোভা নিখিলপূজ্য;
হিমাদ্রি শেখরে ছুটিল গঙ্গা,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক সংজ্ঞা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজঙ্ঘা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূর্য। [বিভূতি : বাণীবন্দনা]

(২) মিশ্রবৃত্ত স্তবক বন্ধ : ১০ মাত্রা-একপদী ও ১৪ মাত্রা-(৮।।৬।) দ্বিপদী পংক্তি :

এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজি ভিখারিণী তাই;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি ভিক্ষা দাও বলে,
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরু তলে,
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল।

[কাব্যকুসুমাঞ্জলি : ভিখারিণী মেয়ে]

(৩) মিশ্রবৃত্ত স্তবকবন্ধ ঃ ত্রিপদী (৮।।৬।।৬।।) ও চৌপদী (৮।।৮।।৬।।৬।।)।

কিসের কামনা তোর বল প্রকাশিয়া
শুনি একবার,
আমি তো বুঝিনা হায়!
ওই হৃদি কিবা চায়,
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠহার ?

[কনকাঞ্জলি ঃ পতঙ্গের প্রতি]

(৪) প্রবহমান পয়ার ঃ

নব আষাঢ়ের আজি নব কাদম্বিনী
গরজিছে গুরু গুরু, পড়িছে উছলি
কার এ প্রাণের ব্যাথা বারিধারারূপে ?
কার এ সুদীর্ঘশ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি
নীরব শোকের ভরা আকুল পবনে ?
সুখের স্বপন কার ভাঙ্গিয়া অকালে
আঁধার করিয়া দেছে ধরণী মাধুরী ?
কি শুনিবে ভাই পান্থ! প্রাণান্ত বেদনা ?
অভাগিনী বঙ্গমাতা হারাইল হেথা
ভারত-গৌরব পুত্র শ্রীমধুসূদনে !—
আসে তাই খুঁজিবারে বরষে বরষে
সে অমূল্য মহারত্ন—কাঙালের ধন। [বিভূতি ঃ স্মৃতিপূজা]

মানকুমারী বিচিত্র পদ-পংক্তিবন্ধে নানাপ্রকারের স্তবক রচনা করেছেন। আট, ছয় এবং দশমাত্রার পদভাগে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী-বন্ধই সেখানে বেশী ব্যবহার করেছেন। ১০।।১০।। মাত্রাভাগে বিশমাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী এ-যুগের অন্যান্য কবির মতো তিনিও রচনা করেছেন। প্রবহমান পয়ারে মধুসূদনের প্রতিভার স্ফুরণ না ঘটলেও ভাবের উদাত্ত মহিমা অনেকাংশে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেও কবি পূর্ণ ছয়, আট বা দশমাত্রার পদবিভাগই পছন্দ করেছেন। চার বা দুই মাত্রার লঘু যতি বা বিজোড়মাত্রার পদবিন্যাস তাঁর রচিত প্রবহমান পয়ারে বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পংক্তি শেষে অর্ধযতি বা পূর্ণযতি দিশেছেন। সুতরাং মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারের সর্ব সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহের ভাব এ ছন্দে পরিস্ফুট হতে পারেনি।

উনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। স্বভাবদত্ত প্রতিভা এবং উচ্চশিক্ষার মার্জিত রুচিবোধ তাঁর কবিতায় ভাবগত এবং শিল্পগত বিশেষ সৌষ্ঠব দান করেছে। সেইযুগে তাঁর কবিতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। মাত্র আট বছর বয়স থেকে তিনি কবিতা রচনা অভ্যাস করেন এবং মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৯৩০-এ তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জীবনপথে' প্রকাশিত হয়। এ-যুগের অন্যান্য কবিদের মতো কামিনী রায়ও মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই কাব্য রচনা করেছেন। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দোবন্ধের প্রতিই তাঁর আনুগত্য দেখা যায়। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ যে একটি নতুন পদ্যরচনারীতি প্রবর্তন করছিলেন সে সম্পর্কে কবি দেবেন্দ্রনাথের মতো কামিনী রায়ও সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই রচনারীতির প্রশংসা করলেও হেমচন্দ্রের রীতিকেই কবি পছন্দ করেছেন[৭]। এখানেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। আলোচ্য যুগের কবিদের অনেকে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের প্রকাশরীতি, মিলের ধ্বনিমাধুর্য, বিচিত্র পর্ব-পদ বিভাগের

কামিনী রায়

৭। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রশংসা করে একটি চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি।...আজকাল রবীন্দ্রযুগ— এ যুগে 'আর্টের' দিকেই, বিশেষ রবীন্দ্র আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় কিনা কেহ দেখে না।...সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত। আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধাবুলি আগে সাজাইয়া বাছিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেইজন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাবটুকুই থেকে মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগৌরব করিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা, গীত রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ। সমতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু গীত রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে বা তাঁহার অনুকরণে তাঁহার রচিত শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব কবিদের প্রতি বা নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে কীর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকেই বাড়াইতে গেলে তিনি যে স্কুলের প্রবর্তক তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ সুর নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরিস্রোতের কলকলধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ঝিকিমিকি খেলা আবছায়া [illegible] আবেশ কেবল তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক

হেমচন্দ্রের প্রতি কামিনী রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

চমৎকারিত্বকে অনেকাংশে রীতিসর্বস্ব মনে করেছেন,—সম্ভবত সে কারণেই এ-ছন্দ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের রীতিকেই বেশী পছন্দ করেছেন। কোমল ছন্দের প্রতি যাঁদের অনুরাগ তাঁরা কেউ কেউ বৈষ্ণবপদের লঘু-গুরু উচ্চারণের অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কৃত্রিম উচ্চারণরীতিকে কেউ বা চালাতে চেষ্টা করেছেন। কামিনী রায় 'পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'কে বাল্যকাল থেকেই অনুসরণ করেছেন বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই অনুসৃতির ক্ষেত্রেও অবশ্য হেমচন্দ্রের দলমাত্রিক লঘু ছড়াজাতীয় কবিতার প্রতি বা কৃত্রিম সংস্কৃত উচ্চারণের কবিতার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি। প্রবহমান এবং যতিপ্রান্তিক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি পংক্তিবদ্ধ, বিভিন্ন স্তবকবদ্ধ স্বচ্ছন্দগতি মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই তিনি রচনা করেছেন। বস্তুত অকৃত্রিম অনাড়ম্বর সহজ ভাব প্রকাশের দিক থেকে কামিনী রায়ের হাতে এ ছন্দ অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছে। এখানে কবির সনেট এবং অন্যান্য রচনাবন্ধের কয়েকটি নিদর্শন তুলছি।

(১) বল ছিন্ন বীণে, বল উচ্চ স্বরে,
॥ ॥ ॥
—না, —না, —না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

··· ··· ··· ···

উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখদুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানবজীবন তাহারও একটা জাগ্রত অস্তিত্ব আছে—এবং তাহার একটা সবল সরল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে ···

[সাহিত্যসাধক চরিতমালা, কামিনী রায় (৫৮) পত্রাবলী : পৃ ১৯-২১]

কামিনী রায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলোছায়া' (১৮৮৯) হেমচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছিলেন আলোচ্য চিঠিটি তিনি লেখেন ১৯২৩ এ। রবীন্দ্রনাথ তখন কবিখ্যাতির চরম শীর্ষে উঠেছেন।—এখানেই সে যুগের রবীন্দ্র পূর্ব আদর্শধর্মী কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

[আলো ও ছায়া ঃ সুখ]

এই কবিতাটি ১৮৮০-তে কবির চোদ্দ বছর বয়সের রচনা। তখনই ছন্দের উপর কবির কি চমৎকার হাত এসেছে। '—না,—না,—না' উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতা ভাবপ্রকাশে কতটা উপযোগী হয়ে উঠেছে কবিতাটি পাঠ করতে গেলে উপলব্ধি করা যায়।

(২) ৮।।৮। যতি ভাগের দ্বিপদী ঃ

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভুমি,—মা আমার, মা আমার।

[আলো ও ছায়া ঃ মা আমাব]

কবি এখানে আটমাত্রা পদের চারমাত্রার পর্বযতিও অনেকাংশে সুস্পষ্ট রেখেছেন।

(৩) স্তবকবন্ধ ঃ ১০।।১০।।১০ I মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী ঃ

মৃত্যু মোহ অই ভেঙে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন ;
এক দৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
"এতো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।"

[আলো ও ছায়া ঃ চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ]

(৪) স্তবকবন্ধ ঃ (চৌপদী ও দ্বিপদী ঃ মিশ্রস্তবক)

	মাত্রাভাগ	মিল
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার ফুরায়েছে আঁখিজল,	৮।।৮।।	—।।ক।।
ভালবাসা তপস্বিনী কাঁদে নাকো আর	৮।।৬I	—।।খI
বিষাদ সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল,	৮।।৮।।	—।।ক।।
শারদ গগন-ভরা কৌমুদীর ভার,	৮।।৬I	—।।খI
নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধ্যবায়,	৮।।৮।।	—।।গ।।
দেখিতেছে ভালবাসা—কে যেন মরিয়া যায়।	৮।।৮I	—।।গI

[আলো ও ছায়া ঃ ভালবাসার ইতিহাস]

(৫) সমিল প্রবহমান পয়ার :

দেখি কর্মজগতের দীর্ঘ পথ দিয়া
নানা জন নানা দিকে যাইছে চলিয়া,
চাহি দূর লক্ষ্য—দূর ? সকলেরি নয়;
চলিছে সবাই ; পথ চলিতেই হয়।
স্রোতোমুখে শূন্য তরী সে তো নাহি ভাবে
কোথা গিয়া পাবে তীর কতদূর যাবে।

[দ্বীপ ও ধূপ : অমৃতের পথে]

এই প্রবহমান পয়ার মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' থেকে ভিন্নতর। কবি পংক্তি-প্রান্তে মিল শুধু নয়, পূর্ণযতি বা অর্ধযতিও দিয়েছেন। তাতে প্রবহমানতা তেমন স্বাভাবিক হতে পারেনি। মধুসূদন যে মনোভাব নিয়ে 'মিত্রাক্ষর'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এ ছন্দে সে বিদ্রোহ একান্তই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে।

(৬) সনেট : মিল

পড়িতে চাহিনা বাঁধা বাসনার পাশে,	ক
বেড়াইতে চাহি আমি একান্ত স্বাধীন,	খ
তবুও হৃদয় মোর দীর্ঘ রাত্রি দিন	খ
এই পান্থশালা পানে ফিরে ঘুরে আসে।	ক
আজ থাক্। কাল তবু উদাস বাতাসে	ক
দিবা যবে গোধূলিতে হইবে বিলীন,	খ
বাহির হইব আমি, লক্ষ্যবন্ধ হীন	খ
সংসারের রাজপথে আপন উল্লাসে।	ক
কেন এসেছিনু হেথা, শুনে কার ডাক ?	গ
সে কি দাঁড়াইবে কাল তপ্ত অশ্রু দিয়া	ঘ
পিচ্ছিল করিয়া মোর সম্মুখের পথ,	ঙ
অথবা বলিবে - যদি যেতে চাহে যাক,	গ
ভুল করে একদিন এনেছি ডাকিয়া,	ঘ
হায়রে সংসারে কোথা পুরে মনোরথ ?	ঙ

[জীবন পথে : সহযাত্রা (১৯)]

কামিনী রায় শতাধিক সনেট লিখেছেন। উদ্ধৃত সনেটটি বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় আদর্শে রচিত। সনেটের মিলবিন্যাসে কামিনী রায় মূলত পেত্রার্কাকেই অনুসরণ করেছেন। তবু ভাবগত অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ সর্বত্র সুস্পষ্ট রাখেননি। ভাবের প্রগাঢ়তায় তাঁর অধিকাংশ সনেটই সার্থক হতে পেরেছে। অধিকাংশ সনেটেই প্রবহমাণ পয়ার ব্যবহার করেছেন।

নিত্যকৃষ্ণ বসু

এবারে যে কয়েকজন কবির উল্লেখ করছি, এরা সকলেই তরুণ বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০) একটি মাত্র কবিতা গ্রন্থ (মায়াবিনী ১৮৮৬) রচনা করেছেন। 'সাহিত্য' পত্রে তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে বহু কবিতা রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর দু-একটি রচনা-নিদর্শন দিচ্ছি।—

(১) একপদী (১০ মাত্রা) ও ত্রিপদী (৮।।৮।।১০): মিশ্র-স্তবক:

নিশীথের শুভ্রমেঘাসনে
পূর্ণশশী শোভিছে গগনে,
  কিরণ-বসনপরা,
  শোভে সুপ্ত বসুন্ধরা
বসন্তের কুসুম-শয়নে।

['সাহিত্য'-তে ১৩০৯-এ প্রকাশিত: সা. সা চ. (৭৭): ৭ম খণ্ড, পৃ ২১ দ্র]

(২) সমিল প্রবহমান পয়ার:

অয়ি গঙ্গে! আজি এই সরস শ্রাবণে
সঘন গগনতলে শ্যাম আস্তরণে
কি অপূর্ব শোভা তোর! বরষা বিভবে
পরিপূর্ণ বরতনুখানি, কি গৌরবে
যৌবন তরঙ্গ পরে' তুলি আন্দোলন,
রাজ রাজেন্দ্রানী সম মহিমা আপন
প্রতি সৌম্য পদক্ষেপে করিছে প্রচার।

[সা. সা. চ.: ৭ম খণ্ড: নিত্যকৃষ্ণ বসু: পৃ ২৬-২৭]

কবির রচনায় ছন্দের মৌলিকতা না থাকলেও প্রবহমান পয়ারের বা মিত্রাক্ষর ছন্দের শব্দ-গ্রন্থনে, মিলবিন্যাসে নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। দীর্ঘ জীবন পেলে কবি অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিতেন অনুমিত হয়।

প্রমীলা নাগ

কবি প্রমীলা নাগ (১৮৭১-১৮৯৬) মাত্র ২৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ (প্রমীলা ১৮৯০ তটিনী ১৮৯২) প্রকাশিত হয়েছিল। কবি মিশ্রবৃত্ত রীতির যতিপ্রান্তিক ছন্দ ব্যবহার করতেন। এখানে তৎকালীন প্রচলিত ১০।।১০। মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদীর একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

একদিন বরিষার বুকে
দেখিতাম বসন্তের হাসি,
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম,
বাজিয়া উঠিত দূরে বাঁশী।
... ...
ঢেকে গেল বিষাদ জলদে
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী;
সংসারের কুটিল কটাক্ষে
মিশে গেল হরষের হাসি।
চিনিলাম কেন এ ধরণী?
কেন হায়, ভাঙিল স্বপন?
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
কল্পনার নন্দন কানন!

[সা সা. চ. (৯ম খণ্ড) প্রমীলা নাগ ঃ পৃ ১১-১২]

শব্দ-গ্রন্থনে, ভাব পরিস্ফুটনে, ধ্বনি ঝংকারে ও মিলবিন্যাসে এই তরুণ জীবনেই কবি সফল হতে পেরেছিলেন। তাঁর অকাল বিয়োগে বাংলা কাব্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, কবি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) মাত্র ২৯ বৎসরের

স্বল্পায়ু জীবনে বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মাধবিকা (১৮৯৬) এবং শ্রাবণী (১৮৯৭) কাব্যগ্রন্থ দুটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে যতিপ্রান্তিক পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি পংক্তিবন্ধ এবং প্রবহমান পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর রচিত একটি সনেট উদ্ধৃতি করছি।—

		মিল
(১)	পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে,	ক
	সরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।	খ
	জোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে	ক
	ফুটায়ে দিতেছে তার সুষমা সুবাস।	খ
	কোন শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি	গ
	অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন;	ঘ
	কোন সুখ রজনীর চাঁদের কিরণ,	ঙ
	অধর পরশে এসে আপনা বিহীন।	ঘ
	দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্রবশ্মিরেখা,	চ
	তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।	ছ
	দুটি সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া	ছ
	সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া।	ছ
	পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে	ক
	সরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।	ছ

[মাধবিকা : হাসি]

কবি পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম পংক্তি মিলহীন রেখেছেন। প্রথম ও ত্রয়োদশ পংক্তিতে এক মিল দিয়েছেন। অন্যান্য পংক্তিমিলেও বৈচিত্র্য রয়েছে। বলেন্দ্রনাথ দ্বিপংক্তিক সহজ মিলে (Couplet) এবং পেত্রাকীয় মিলে- উভয় রীতিতেই সনেট লিখেছেন। সহজ দ্বিপংক্তিক মিল বোধ হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সনেটের পংক্তি রচনায় কখনও প্রবহমান, কখনও যতিপ্রান্তিক রীতি নিয়েছেন। প্রিয়নাথ সেন বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বিশেষ প্রশংসা করেছেন (স. সা. সা. চ.—৫ম খণ্ড, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১৭-২৩)। তাঁর অকাল বিয়োগে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

মহিলা কবিদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী (১৮৭৮-১৯০৬), বিনয়কুমারী ধর (১৮৯০-?), হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫), মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় সকলেই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এ-যুগে কবিতা রচনা করেছেন। নূতনত্ব না থাকলেও ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে তাঁরা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কবি ভুজঙ্গধর এই যুগে লঘুগুরু উচ্চারণে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে অনেকগুলি গান লিখেছেন। কিছু সনেটও লিখেছেন। এখানে তাঁর লঘুগুরু উচ্চারণের বৈষ্ণব গানের একটি উদাহরণ তুলছি—

অপর কবিগণ

(২) শীত সুরভি বহ নৈশ সমীরণ
নাচত মন্দ তরঙ্গে
রহি রহি মুহু মুহু কোকিল কুহু কুহু
ভাসত পঞ্চম রঙ্গে।

[ভুজঙ্গধর ঃ তিমিরা (১৮৯০)]

[এখানে শুধু গুরু দলের চিহ্ন দেওয়া হল, চিহ্নবিহীন দলগুলি লঘু।]

এই যুগে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছাড়া কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সেই বিরলদৃষ্ট কবিদের মধ্যে রমণীমোহন ঘোষ অন্যতম। ১৮৯৯তে প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতি করছি।

(৩) আর কত বল ভুলাবে আমারে
মানসকুঞ্জবাসিনী।
নবীন শোভায় নিত্য বিকশি,
চিত্ত গগনে পূর্ণিমা শশী,
একি গো রঙ্গে খেলা কর বসি'
সুন্দর শুভ হাসিনি!
নব নব সাধ জাগাও পরাণে
নীরব মঞ্জুভাষিনি। ('প্রদীপ' পত্রিকা ঃ মানসী ঃ আষাঢ় ১৩০৬)

ভাষায়, ভাবে এবং ছন্দে কবি মূলত রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বনৃত্য', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'—সোনার তরী, 'চিত্রা' এবং 'নগরসংগীত'— চিত্রা)। এই অনুসরণের দৃষ্টান্তও সে যুগে বিরল ছিল।

আলোচিত যুগের বৈশিষ্ট্য

এবারে এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে।—

(১) রবীন্দ্রনাথ এ-যুগেই কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণে লিখিত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসংশয় হয়েছেন এবং স্বচ্ছন্দ বহুল প্রয়োগ আরম্ভ করেছেন।

(২) মিশ্রবৃত্ত রীতির সমিল এবং মিলহীন প্রবহমান পয়ার তিনি নাটক, কাব্যনাট্য এবং কবিতায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। মধুসূদনের প্রবহমান পয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবহমান পয়ারের রচনারীতি কিছুটা ভিন্নতর।

(৩) এই যুগে রবীন্দ্রনাথ একটি সার্থক মুক্তক ছন্দের কবিতা (মানসী : নিষ্ফল কামনা) লিখেছেন। নাট্য-সংলাপী গৈরিশ-মুক্তক থেকে কাব্যে ব্যবহৃত রবীন্দ্র-মুক্তকের গঠনরীতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

(৪) পূর্ববর্তী যুগের ধারানুসরণে রবীন্দ্রনাথ এ-যুগে শতাধিক সনেট লিখেছেন। গঠনের দৃঢ়তায় এবং ভাবের প্রগাঢ়তায় তাঁর অনেকগুলিই বিশেষ ভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

(৫) তিনি এ-যুগের বিচিত্রধর্মী গভীর ও লঘুভাবাত্মক বহু কবিতায় দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-ছন্দ স্বাভাবিক বাক্‌ধর্মী ভাবপ্রকাশের পক্ষে কত অনুকূল হতে পারে এ-যুগের বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত (বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট)—প্রধান সকল শ্রেণীর ছন্দেই কবি পর্ব-পদ গঠনে, স্তবক রচনায়, মিল বিন্যাসে এবং সর্বোপরি রুদ্ধ মুক্ত দলের তরঙ্গায়িত ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টিতে অপূর্ব ঐশ্বর্য এনে দিয়েছেন।

(৭) আলোচ্য যুগের অন্যান্য কবিরা, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারাই (মধুসূদন-হেম-নবীন) বেশী প্রভাবিত হয়েছেন।

(৮) নবীনচন্দ্র দাস অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেছেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যতিপ্রান্তিক পয়ার স্তবক এবং সমিল প্রবহমান পয়ার রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

(৯) স্বভাবকবি গোবিন্দদাস দলবৃত্ত ছন্দে বাক্‌ধর্মী প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন; মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্তবক রচনায়, সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

(১০) স্বর্ণকুমারী দেবী মিশ্রবৃত্ত ছন্দে স্বচ্ছ এবং বৈচিত্র্যধর্মী প্রকাশভঙ্গিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন; মৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে লঘু ভাবের কবিতা লিখেছেন, বিংশ শতকে লিখিত একাধিক কবিতা-গানে কলাবৃত্ত ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন।

(১১) দেবেন্দ্রনাথ সেন মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। সনেট রচনায় এ-যুগে তিনি রবীন্দ্রনাথের পর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। রবীন্দ্র-আদর্শে তিনি বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতির কবিতা লিখেছেন। সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণের ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

(১২) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রধানত মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকে এসে তিনি কলাবৃত্ত রীতির কবিতাও লিখেছেন। লঘু-গুরু ব্রজবুলি ছন্দে বৈষ্ণবপদ লিখেছেন। নাট্যসংলাপে মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক ব্যবহার করেছেন।

(১৩) অক্ষয়কুমার বড়াল প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ গ্রন্থনে, ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে, পদ বিভাগে এবং পংক্তি ও স্তবক রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে।

(১৪) মানকুমারী বসুর কবিতায় পিতৃব্য মধুসূদনের যেমন প্রভাব পড়েছে বিংশ শতকে এসে রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাব পড়েছে। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন এবং 'মিত্রাক্ষর' ছন্দে বিচিত্র স্তবকবন্ধের ব্যবহার করেছেন।

(১৫) এ-যুগের প্রখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় সমকালীন অন্যান্য অধিকাংশ কবির মতো রবীন্দ্র-রচনারীতির তুলনায় হেমচন্দ্রের রচনাদর্শকেই বেশী পছন্দ করতেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে প্রধানত প্রবহমান এবং যতিপ্রান্তিক পয়ার, ত্রিপদী, ও চৌপদী ব্যবহার করেছেন। ছন্দ ও ভাবের স্বচ্ছতা তাঁর রচনার প্রধান গুণ। তিনি পেত্রার্কীয় আদর্শে শতাধিক সনেট লিখেছেন।

(১৬) নিত্যকৃষ্ণ বসু, প্রমীলা নাগ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি কবিরা মিশ্রবৃত্ত রীতির যতিপ্রান্তিক সমিল পয়ারবন্ধে বেশী কবিতা লিখেছেন। ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে লঘু গুরু উচ্চারণে অনেকগুলি পদ রচনা করেছিলেন। কবি রমণীমোহন ঘোষ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলাবৃত্ত ছন্দে কিছু কবিতা লিখেছিলেন।

পেত্রার্কা বা শেক্‌স্‌পীয়রের আনুগত্য স্বীকার করেননি। তিনি একমাত্র চোদ্দ পংক্তির সীমা-শাসনটুকু মেনে চলেছেন। নৈবেদ্য কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত ৭৮টি সনেটেই তিনি দ্বিপংক্তিক মিল (couplet) দিয়েছেন। কোনও কোনও সনেটে ভাবগত আবর্তনও উপেক্ষা করেছেন। কোথাও সে আবর্তন রক্ষিত হলেও সুনির্দিষ্ট অষ্টক-ষট্‌ক স্তবক-ভাগের বাঁধাবাঁধি তুলে দিয়েছেন। কয়েকটি সনেটে এই ভাবাবর্তন দুবারের বেশীও এসেছে।[১] তবে চোদ্দপংক্তির দৃঢ় বস্কল-বাঁধনে সনেট-সুন্দরীর লাবণ্যোচ্ছল সংহত আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সেদিক থেকে (এবং সম্ভবত রচনার সংখ্যাগত পরিমাণ বিচারের দিক থেকেও[২]) তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সনেটকারের গৌরব দাবী করতে পারেন। মধুসূদনের মত রবীন্দ্রনাথও সনেট-পরম্পরা (sonnet-sequence) রচনা করেছেন (দ্র 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪-৬৫-৬৬-৬৭, এবং ৯৩-৯৪-৯৫ সংখ্যক সনেটগুচ্ছ)। এ-কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলিতে দেশপ্রেম, বিশ্ব-প্রেম, ভাগবত প্রেম এবং জীবনমৃত্যু-বিষয়ক দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে।

এই যুগের সনেট

১। কবি অনেক সময় প্রবহমান পয়ার পংক্তিতে রচিত সনেটগুলিতে পংক্তির মাঝেই নতুন স্তবক সুরু করেছেন। স্তবক বিভাগের অপূর্ণ দুই ছত্র মিলিয়ে পূর্ণ চোদ্দমাত্রা হয়েছে। একমাত্র নৈবেদ্যের ৫৩ সংখ্যক সনেটে অনুরূপ দুটি ছত্র মিলিয়ে ষোলমাত্রা হয়েছে, কিন্তু অন্য পংক্তিগুলিতে চোদ্দমাত্রাই রয়েছে। এটি কবির অলক্ষিতেই হয়েছে মনে হয়।

রবীন্দ্র-সনেটের পূর্ণ তালিকা

২। এখানে কবি রচিত সনেটগুলির একটি পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল :

কাব্যগ্রন্থের বা কবিতার নাম		সনেটের সংখ্যা		গ্রন্থ বা কবিতার প্রকাশ-কাল
পেত্রার্কার অনুবাদ	—	১	—	১৮৭৮ (দ্র রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড : ২য় সং, পৃ ৭২)
কড়ি ও কোমল	—	৫৮	—	১৮৮৬
মানসী	—	৪	—	১৮৯০
সোনার তরী	—	৮	—	১৮৯৪
চিত্রা	—	৪	—	১৮৯৬
চৈতালি	—	৬৭	·	১৮৯৬
কল্পনা	—	১	—	১৯০০
নৈবেদ্য	—	৭৮	—	১৯০১
স্মরণ	—	১৮	—	১৯০২-৩

'স্মরণ' কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি সনেটে (৭, ১৪, ১৫, এবং ২২ সংখ্যক কবিতা দ্র.) প্রেমবিরহের প্রগাঢ় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। উভয় কাব্যেরই অধিকাংশ সনেটে কবি প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে প্রবহমান মহাপয়ার-বন্ধের কয়েকটি সনেট আছে।

শিশুপাঠ্য কবিতার ছন্দ বৈচিত্র্য

'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি সুললিত কবিতায় দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত ছন্দের সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। মাঝে মাঝে শিশুমনের ললিত ধ্বনিতরঙ্গে কবি যেন পৃথক দুই রীতির সীমারেখা মুছে দিয়েছেন। যেমন—

তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে
চলি চলি পা পা
টলি টলি যায়,
গরবিনী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়। [শিশু ঃ হাসিরাশি]

প্রথম দুটি পংক্তিতে দলবৃত্তের উচ্চারণ সুস্পষ্ট। পরবর্তী দুটি পংক্তিতে রুদ্ধদল-বিরলতায় কলাবৃত্তের উচ্চারণ-প্রবণতা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানেও তৃতীয় পংক্তিতে দুটি মুক্তদলে গঠিত 'পা পা' পর্বে কবি চতুষ্কল (দলবৃত্তের হিসাবে ষট্‌কল) প্রসারণ এনে টলায়মান শিশু-পদক্ষেপের চিত্রটি যেন স্পষ্ট করে তুলেছেন।

উৎসর্গ	১৮	...	১৯০৩
গীতালি	২	...	১৯১৪
মহুয়া	৫	...	১৯২৯
বনবাণী	১	...	১৯৩১
পরিশেষ	১১	...	১৯৩২
ছড়াব ছবি	১	...	১৯৩৭
প্রান্তিক	৪	...	১৯৩৮
সেঁজুতি	১	...	১৯৩৮
আরোগ্য	১	...	১৯৪১

আলোচ্য প্রয়োগরীতিও এ-যুগের অন্যান্য কবিদের শিশুপাঠ্য কবিতার ললিত ছন্দ ব্যবহারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে লক্ষ করা যায়।

শিথিল মিশ্ররীতির ছন্দের পরীক্ষা

'শিশু' কাব্যগ্রন্থে দলের শিথিল উচ্চারণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'শীতের বিদায়' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এ কবিতায় কবি ৬।।৬।।৮। মাত্রাভাগের ত্রিপদীবন্ধে নতুনতর উচ্চারণের পরীক্ষা করেছেন। যেমন—

বসন্ত বালক 'মুখ' ভরা হাসিটি
'বাতাস' বয়ে ওড়ে চুল,
শীত চলে যায় মারে তার গায়
মোটা মোটা গোটা ফুল।
'আঁচল' ভরে গেছে শত 'ফুলের' মেলা,
'গোলাপ' ছুঁড়ে মারে 'টগর' চাঁপা বেলা,
শীত বলে, ভাই এ কেমন খেলা,
'যাবার' বেলা হল আসি।

[শিশু ঃ শীতের বিদায়]

শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট এককলা উচ্চারণ মিশ্রবৃত্তের রীতিবিরোধী। এ কবিতায় ইচ্ছা করেই কবি তেমন উচ্চারণ এনেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে এই মিশ্র উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছিলেন এ-অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্র-ছন্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার বিশদ আলোচনা করা গেল। তবে এমন উচ্চারণ যে উপপর্বের যতিবিভাগ ক্ষুন্ন করে, কবিতাটি পড়তে গেলে তা ধরা পড়ে। সম্ভবত, বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতির বিরোধী বলেই কবি এমন শিথিল উচ্চারণরীতির আর পরীক্ষা করেননি।

'বিসম চলনের ছন্দ' ৩+২ মাত্রার উপপর্ববিভাগ

বাংলা ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তিন+দুই মাত্রার পঞ্চমাত্রিক (কলাবৃত্তের) পর্ববিন্যাসকে 'বিসম চলনের ছন্দ' বলেছেন এবং এই শব্দ-বিন্যাসরীতির বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩] উৎসর্গের একটি কবিতায় কবি এই ছন্দের সার্থক ব্যবহার করেছেন।

৩ এ বিষয়ে কবি লিখেছেন—

"ছন্দকে মোটের উপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম চলনের ছন্দ এবং বিসম চলনের ছন্দ। দুইমাত্রার চলনকে বলি সম মাত্রার চলন, তিনমাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার

'বিসম চলন'

পর্বযতি লুপ্ত করে কবি এখানে ৮।।৬।।৬I মাত্রাভাগে ত্রিপদীর চাল এনেছেন। তবু এ ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ছন্দের মতো অতটা দৃঢ়বদ্ধ নয়, পর্বযতির ক্ষীণ স্পন্দন এখানে রয়ে গেছে।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির অধিকাংশ গানে কবি কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। দলবৃত্তের প্রয়োগে মাঝে মাঝে অতিপর্বিক দোলার ধ্বনি-মাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে। কলাবৃত্ত রীতির কোন কোন কবিতায় রুদ্ধ-মুক্তদলের সুনিপুণ প্রয়োগে নতুন ধ্বনি তরঙ্গ পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর। [গীতিমাল্য ঃ ১০২]

এখানে প্রত্যেক পর্বের প্রথম দলটি রুদ্ধ এবং পরবর্তী দলগুলি মুক্ত হিসাবে ব্যবহারের ফলে চমৎকার ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। এমন প্রয়োগে সংস্কৃত আদর্শের সুনির্দিষ্ট লঘু-গুরু দলবিন্যাস-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই রীতিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন।

বলাকার মুক্তক

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যটি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক ইতিপূর্বেই নাটকে এবং কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মানসী-পূর্ব যুগে 'তারকার আত্মহত্যা' (১৮৮১) কবিতায় এবং আদিপর্বেই মানসী কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' (১৮৮৭) কবিতায় এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তখনও এ ছন্দের বহুল প্রয়োগে কবির দ্বিধা ছিল। বলাকার কবিতা লিখতে গিয়ে কবি সেই দ্বিধা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠলেন। সেদিক থেকে বিচারে, সমিল মুক্তকে লেখা এই পর্বের প্রথম কবিতা হিসাবে 'ছবি' কবিতাটি (১৯১৪ অক্টোবর ঃ ৩রা কার্তিক, ১৩২১) উল্লেখযোগ্য। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।—

মিশ্রবৃত্ত সমিল মুক্তক : উদাহরণ

তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?
... ...
একদিন এইপথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিঃশ্বাসে—
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল—
সে যে আজ হল কতকাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তালিকা ধরি রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী॥

[বলাকা ঃ ৬ নং কবিতা]

মিল-অনুপ্রাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবি লঘুতম উপপর্বিক যতিতেও ছত্রবিন্যাস করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'মন্দ্র' কাব্যের (১৯০২) সমিল মুক্তকে যেমন মিল রাখতে গিয়ে ছত্রশেষের উপযতিকেও অস্বীকার করেছেন, আলোচ্য যুগের রবীন্দ্র-মুক্তকে সরূপ ত্রুটি লক্ষিত হয় না। তবে একথা স্বীকার করতে হয়, সমিল মুক্তকের মিলের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে সর্বত্র ছত্রশেষে ভাবযতিব উপযুক্ত গুরুত্ব রাখেননি। পরবর্তীকালে কবি মিলবিহীন মুক্তকে ভাবগুচ্ছকে আরও সুষ্ঠুতর পংক্তিবিন্যাসে সাজিয়েছেন।

দলবৃত্ত (সমিল)
মুক্তক

দলবৃত্ত মুক্তকও কবি এই পর্বে লিখতে সুরু করেছেন। তাঁর প্রথম রচিত সমিল দলবৃত্ত মুক্তক হিসাবে 'বলাকা'র ২১ সংখ্যক কবিতাটি (মুক্তি : রচনা ১৯১৫, ফেব্রুয়ারী : ১১ মাঘ ১৩২১) উল্লেখযোগ্য। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি,—

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রি দিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনো দিকে এক পা বাড়াই
পাছে বিরাগ কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই ॥

[বলাকা : ২১ নং কবিতা]

এখানেও ছন্দ সাজাতে গিয়ে কবি ভাবযতির তুলনায় মিলের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে কবি যে দু-একটি মিলহীন দলমাত্রিক মুক্তক লিখেছেন, সেখানে ভাবযতির মর্যাদা আরও বেশী রক্ষা করেছেন। মুক্তকে ব্যবহৃত এই দলবৃত্ত ছন্দ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণেই পাঠ করতে হয় বটে, তবু পর্বের স্পন্দন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক রীতি থেকে এর জাত যে পৃথক সে বিষয়ে পাঠকের সংশয় থাকে না। উভয় কবির ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক রীতির পার্থক্য দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হল। 'পলাতকা'র (১৯১৮) কাহিনীমূলক কবিতাগুলিতেও কবি এই একই রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

তাহলে দেখা গেল, মধ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে পর্ব-পদ পংক্তি-স্তবক গঠনে যেমন নতুন অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন, অন্যদিকে ভাবমুক্তির ধারায় মিশ্রবৃত্ত এবং সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির মুক্তক ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ছন্দে নবীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। সনেট রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী পর্বে অনুসৃত ধারারই আরও পরিণতি লক্ষিত হয়। মিল এবং স্তবক বিন্যাসের গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করে তিনি সহজ প্রবহমান পয়ারবন্ধকেই দ্বিপংক্তির মিলে ব্যবহার করেছেন। একদিকে ছন্দোবন্ধের অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য বৃদ্ধি, অপরদিকে ছন্দের বন্ধনমুক্তির নতুন পথের সন্ধান,—উভয় দিকেই রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে (পূর্ববর্তী এবং

বর্তী পর্বের ন্যায়) নবীন কবিদের পক্ষে দিশারীরূপে কাজ করেছেন। একমাত্র জন্দ্রলাল ব্যতীত এ-যুগের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সমস্ত কবিই ছন্দের ক্ষেত্রে কমবেশী ীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

॥ খ ॥

জেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

জেন্দ্র প্রবর্তিত ছন্দে ীয়তা : ন্দ্রপ্রভাব-মুক্তি

রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল পর্বের প্রারম্ভেই, তাঁর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কাব্যছন্দে এক মৌলিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আলোচ্যযুগ মুখ্যতঃ রবীন্দ্রযুগ,—রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিদের যুগ। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, প্রমথ ীধুরী প্রভৃতি শক্তিমান কবি নব নব ছন্দের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেও—কেউই বীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। পূর্ববর্তী পর্বের অধিকাংশ কবি যেমন বীন্দ্রপূর্ব বাংলা ছন্দরীতির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নতুন রীতিগুলি গ্রহণ করতে ষ্ঠা দেখিয়েছেন,— এ-যুগে ঠিক বিপরীত ভাবেই বলা যায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ত্যেক কবিই রবীন্দ্রছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কেউই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে তিক্রম করে যেতে পারেননি। এমনকি পূর্ববর্তী পর্বের রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত অনেক বি এ-যুগে পৌঁছে রবীন্দ্রছন্দের অনুসরণ করেছেন। তার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম খা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ছন্দ সম্পর্কে তিনি যে সচেতন লেন একাধিক ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাব্যে নতুন নতুন ন্দের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

জেন্দ্রলালের প্রাথমিক নায় হেমচন্দ্রের প্রভাব

দ্বিজেন্দ্রলাল বয়সে রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র দু'বছরের ছোট ছিলেন। বারো বছর বয়সে বালক কবি যে গান রচনা করেছেন (নক্ষত্র ঃ আর্যগাথা ১ম ভাগ)[৪] সেখানে মিশ্রবৃত্ত রীতির চৌপদী ৮৷৷৮৷৷৮৷৷৭) বা দ্বিপদী (৮৷৷৭) বন্ধে হেমচন্দ্রের যুগের রচনাধারাকেই অনুসরণ রেছেন। বস্তুত 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের (কবির ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের চনা)[৫] সকল কবিতাগানেই সেই যুগের পরিচয় সুস্পষ্ট। সংস্কৃত-প্রভাবিত

। দ সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৬৯ খণ্ড (৬৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৃঃ

৫। দ ঐ পৃঃ ৩।

উচ্চারণের গান লিখেছেন (নীল গগন ঃ আর্যগাথা ১ম ভাগ দ্র.), পাঁচমা
পর্বভাগে যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ বর্জন করে (বন প্রবাহিনী নদী ঃ আর্যগাথা ১ম ভাগ
এ-কবিতায় যুক্তবর্ণ একটি আছে, দুমাত্রায় উচ্চারিত হয়েছে) কলাবৃত্তের বিশ্লি
উচ্চারণভঙ্গি ফোটাতে চেয়েছেন। হেমচন্দ্র এবং সে যুগের অন্যান্য স্বদেশী সংগী
লেখক দের মতোই গেয়েছেন,—

(১) এই অন্ধকারে বীণা একবার
বাজ্‌রে গম্ভীর বাজ্‌রে আবার [আর্যগাথা ১ম ভাগ :
বীণা বাজিবে কি আর

অথবা (২) মেল রে নয়ন
ভারত সন্তান উঠ, উঠ রে এখন [ঐ ঃ মেল রে নয়ন

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছয়মাত্রার পর্বভাগ এবং ষোলমাত্রার (৮।।৮) পংক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল
'হেম-নবীন' যুগের কবিদের আদর্শেই রচনা করেছিলেন। 'আর্যগাথা' ১ম ভাগের
কবিতা-গান রচনাকালে ভাব, ভাষা ও ছন্দে তিনি রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের কবিদের
দ্বারা, বিশেষতঃ হেমচন্দ্রের রচনারীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য এই সময়ে
রবীন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই যুগের রচনায় সবচেয়ে লক্ষ করবার বিষয় হল, যে দলবৃত্ত ছন্দকে
কবি পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে প্রয়োগ করে বাংলা ছন্দের একটি নতুন রীতি
প্রবর্তন করলেন, 'আর্যগাথা' ১ম ভাগ-এর একটিও গান বা কবিতায় সে ছন্দের লৌকিক
ছড়াগানের রূপটিও ব্যবহার করেননি। বস্তুত কিশোর কবির সঙ্গে ইংল্যান্ড
প্রত্যাগত তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে। 'আর্যগাথা' ২য়
ভাগ (১৮৯৪) রচনাকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগানে ভাব ও
ছন্দের মৌলিকতা প্রকাশ পায়। দীর্ঘ দশ এগারো বছরের ব্যবধানে শিক্ষা এবং
রুচি, ভাষা এবং ছন্দে কবির কি আমূল পরিবর্তন ঘটেছে 'আর্যগাথা' ১ম ভাগের
সঙ্গে কবির পরবর্তী কাব্যগুলির তুলনা করলেই তা উপলব্ধি করা যায়।

কালানুক্রমিক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল নিম্নরূপ ঃ
আর্যগাথা ১ম ভাগ ঃ ১৮৮২, আর্যগাথা ২য় ভাগ ঃ ১৮৯৩, আষাঢ়ে ঃ ১৮৯৯, হাসির
গান ঃ ১৯০০, মন্দ্র ঃ ১৯০২, আলেখ্য ঃ ১৯০৭ এবং ত্রিবেণী ঃ ১৯১২। কবির
রচিত গানগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর ১৯১৫তে। দ্বিজেন্দ্রলাল
একাধিক নাটকে পদ্যবদ্ধ ব্যবহার করেছেন। প্রবহমান পয়ার সংলাপের দিক
থেকে তাঁর তারাবাই (১৯০৩) এবং সীতা (১৯০৮)নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগে,—'আর্যগাথা' ১ম ভাগ সেই যুগের রচনা। রবীন্দ্র-যুগের আদিপর্বে 'আর্যগাথা ২য় ভাগ, 'আষাঢ়ে' এবং 'হাসির গান' রচিত হয়েছে। বাংলা ছন্দে কবির মৌলিকতার দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' এবং 'ত্রিবেণী'র কবিতাগুলি রবীন্দ্রযুগের মধ্য-পর্বেই রচিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালকে আলোচ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের ও (ছন্দোবদ্ধ) নাটকের প্রকাশকাল ঃ

কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণকে দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার করে দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গানে'র (১৯০০) কয়েকটি গীত রচনা করেছেন।[৬] তবে 'আর্যগাথা' ১ম ভাগ বা ২য় ভাগ রচনাকালেও এ ছন্দে প্রাচীন (সংস্কৃত-প্রভাবিত) উচ্চারণরীতির প্রভাব রয়ে গিয়েছে। 'আর্যগাথা' ১ম ভাগে পঞ্চমাত্রাপর্বিক 'বন প্রবাহিনী নদী' কবিতাটিতে একটিমাত্র যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকপংক্তি উদ্ধৃত করছি,—

কলাবৃত্ত রীতি

বিজন বনে গাহিয়া তুমি তুষরে বনবাসী ;
বিতর সবে বিমল তব সলিল সুধারাশি
যওরে পুরবাহিনী নদী সখী সন্নিধানে ;
শুনাতে তায় বিজন বনবাসী সুখগানে

[আর্যগাথা ১ম ভাগ ঃ বনপ্রবাহিনী নদীঃ
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (সা. প. সং) পৃ ২৩]

এখানে যেমন তৃতীয় পংক্তিতে 'সন্নিধানে' শব্দের যুক্তবর্ণে ব্যবহৃত রুদ্ধদল কবি দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার করেছেন, আবার চতুর্থ পংক্তিতে প্রাচীন কলাবৃত্তের আদর্শে 'বনবাসী' শব্দে পাঁচমাত্রা ব্যবহার করেছেন। 'আর্যগাথা' ২য় ভাগের একটি গানে অবশ্য কলাবৃত্তে যুক্তবর্ণের নির্ভুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন—

ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি অতুল গরিমা ভাসি ;
তার কপালে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি। [আর্যগাথা ২য় ভাগ ঃ কীর্তন ঃ
ঐ ঃ পৃ ৭৮]

৬। 'হাসির গানে'র নন্দলাল, বিলাতফের্তা, আমরা ও তোমরা প্রভৃতি কবিতা-গান দ্রষ্টব্য। 'হাসির গান' ৪র্থ সংস্করণ (১৯১০) থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলীতে যে পাঠ গ্রহণ করেছেন আমরা সেটাই দেখেছি। ১ম সংস্করণে এই গানগুলি ছিল কিনা এবং এরূপ নির্ভুল

গানটির সর্বত্র এমন নির্ভুল উচ্চারণ কবি রক্ষা করেননি। একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কৃত-প্রভাবিত দীর্ঘ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ যেমন এনেছেন, তেমনি কোথাও কোথাও আবার মিশ্রবৃত্ত উচ্চারণ রীতিতে স্বচ্ছন্দে লিখেছেন--

(১) পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, সরম, স্নেহ। [ঐ : পৃ ৭৯]

অথবা (২) যেন জীবন্ত কুসুম কনক ভাতি সুমিলিত, সমতান।
[ঐ : পৃ ৭৯]

বস্তুত উনবিংশ শতকে রবীন্দ্র-আদর্শে আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের নির্ভুল প্রয়োগ প্রায় কোন কবিই করতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালও ব্যতিক্রম নন। 'হাসির গানে'র পূর্বে রচিত তাঁর কোন কবিতাতেই কলাবৃত্ত রীতির আধুনিক পূর্ণাঙ্গরূপ লক্ষিত হয় না। 'হাসির গান' ছাড়া প্রখ্যাত অনেকগুলি স্বদেশী গানেও (যেমন, ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, বাজ ভেরী আজ উচ্চনিনাদে ইত্যাদি) কবি নিখুঁতভাবে আধুনিক কলাবৃত্ত রীতি প্রয়োগ করেছেন। সেগুলি সবই বিংশ শতকের রচনা।

কলাবৃত্ত রীতিতে প্রবহমানতা

'মন্দ্র' কাব্যের কয়েকটি কবিতা-গানে দ্বিজেন্দ্রলাল কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। পঞ্চমাত্রিক পর্বে লিখিত 'নববধূ' কবিতায় ছন্দ মাঝে মাঝে প্রবহমান হয়ে উঠেছে। যেমন—

কহেন পিতা—"এত কি বেশী হয়েছে বড় মেয়ে ?"
কহেন মাতা —"তুমি কি জানো ? তুমি কি দেখ চেয়ে ?
সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা,
আমিই ব'সে পাহারা দেই." কহেন তবে বাবা—
"সে কি গৃহিনি ? মেয়ে ত মোটে পড়েছে এই দশে ;
কাহার ক্ষতি করিছে ? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
থাক না কেন বছর দুই।" জননী ক্রোধে তবে
শয্যা ছাড়ি, গাত্র ঝাড়ি, কহেন ঘোর রবে
ঝঙ্কারিয়া, "তোমার মেয়ে আচ্ছা, বেশ, থাকো ;
কাটিতে হয় কাটো, কিম্বা রাখিতে হয় রাখো,

পাঠ ছিল কিনা জানিনা। এই সংস্করণেও 'কেউ না' জানানে স্বীকার করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগেই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত কলাবৃত্ত ছন্দের আধুনিক উচ্চারণরীতি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন 'আমরা ও তোমরা' কবিতাটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর অন্তর্গত 'আমরা ও তোমরা' কবিতার ভাব ও ছন্দ অনুসরণে। সং।

আমার ভারি দায়টি। আমি সহিতে নারি তবে
লোকের এই গঞ্জনাটি, তা যা হবার হবে
আমি ত হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা
চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ বেশ সোজা কথা।"

[মন্দ্র ঃ নববধূ ঃ দ্বি. গ্র. পৃ ৩৭৯]

এমন ছন্দ রচনায় অভিনবত্ব থাকলেও কবি সর্বত্র সফল হয়েছেন বলা চলে না। সংলাপের ভাবযতি অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দযতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কলাবৃত্ত অথবা লৌকিক দলবৃত্ত রীতির প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচনায় সর্বাংশে সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শেষোক্ত দুটি ছন্দরীতিই লঘু যতিভাগে লিখিত হয়। লঘু যতিভাগ প্রবহমান ছন্দ রচনার অনুপযোগী। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও বোধহয় একথা উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, কবিতাটির পরবর্তী অংশবিশেষ আরও সংলাপধর্মী করলেও সেখানে 'পংক্তি ডিঙানো' প্রবহমানতা আনেননি। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দে নাট্যসংলাপ কত নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আরও কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

কলাবৃত্ত রীতির সংলাপ-প্রধান বাকভঙ্গি

কেহবা বলে "ময়দা কৈ ?" কেহবা ডাকে "শশী !"
কেহবা বলে "কোথায় জল ? "কোথায় বারানসী ?"
"সিঁদুর ?"—"আহা বাদ্যটাকে বাজাতে বল রাজু";
কেহবা বলে "তাবিজ কই ? জসম কৈ ? বাজু ?"
বাহিরে গোল—"গেলাস কৈ ?" "কর্তা কৈ ?" "কেন ?"
"করো না চুপ্ !" "মিষ্টি কৈ ?" "বৃষ্টি হবে যেন !"
"আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে !" "চেচাও কেন দাদা ?"
"ফরাস বিছা ;" "সরিয়ে রাখ পাতার এই গাদা,"
"তামাক কৈ ?" "আনছে, খুড়ো থামাও না এ গোলে ;"
"এখনো বর এলো না !" "আহা এই যে এলো ব'লে !"

[মন্দ্র ঃ নববধূ ঃ পৃ ৩৮০]

মিশ্রবৃত্ত মুক্তক

মিশ্রবৃত্ত ছন্দ 'আর্যগাথা' ১ম ভাগে কিছুটা গতানুগতিক প্রাচীন (মিত্রাক্ষর) ঢঙে ব্যবহার করলেও, পরবর্তী কাব্যগুলিতে এ-ছন্দের ব্যবহারে কবি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। 'আর্যগাথা' ২য় ভাগেই (১৮৯৩) কবি দূরান্বিত মিলে মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,--

আহা— মিল

যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী ... ক
হইত আবদ্ধ একস্বরে, ... খ
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি ... ক
হত সত্য, নৈশ নীলাম্বরে ... খ
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর ... গ
হইত, অথবা যদি হেম ... ঘ
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত, ... ঙ
হইত আশ্চর্য তাহা। ... চ
কিন্তু হইত না অর্ধমধুর সংগীত ও ... ঙ
যেমতি মধুর ... গ
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'। ... ছ

[আর্যগাথা : উৎসর্গ : দ্বি. গ্র. : পৃ ৭৬]

ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এই কবিতাটিই 'মন্দ্র'কাব্যে 'উদ্বোধন' নামে সংকলিত হয়েছে। 'মন্দ্র' কাব্যে কবি আরও একটি সমিল মুক্তক লিখেছেন। তারও কিছুটা উদ্ধৃত করছি।—

আজ এই কোলাহলে,
এ উৎসব এ আনন্দ রবে, এই পুষ্প পরিমলে
এ মঙ্গল বাদ্যে, এই চন্দ্রাতপতলে,
পশিছ, জানিও, এক সুপবিত্র মন্দির বিমলে।
পূর্বজন্মকৃত পুণ্যফলে
—আজি শান্তিজলে
পবিত্রে! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্ধিস্থলে,
আমি আশীর্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
থাক পরিণীতে! পতি সখী ও সচিব হও —আর সুমঙ্গলে
ধন্য হও নিজ পুণ্যবলে। [মন্দ্র : আশীর্বাদ : ঐ পৃ ৩৭৫]

আশীর্বাদ কবিতাটিতে দুটি স্তবক আছে। একটী স্তবক উদ্ধৃত করেছি। প্রতি স্তবকের সমস্ত পংক্তিগুলিতে একমিল রাখা হয়েছে। প্রত্যেক স্তবকে ১০ পংক্তি করে রয়েছে।

এই কবিতা দুটি সম্পর্কে ১৩০৯, কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে । পবে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত)–'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থের-আলোচনা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ মন্তব্য কবেছিলেন, "তাঁহাব 'আশীবাদ' ও 'উদ্বোধন' কবিতায় ছন্দকে একেবাবে ভাঙিয়া চুবিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দ বচনা কবা হইয়াছে। তিনি সাংঘাতিক সংকটেব পাশ দিয়া গেছেন'—কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পাবে না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।"

ববীন্দ্র মন্তব্য

[আধুনিক সাহিত্য ঃ মন্দ্র ঃ ব ব (বিশ্ব সং) পৃঃ ৪৯০]

ববীন্দ্রনাথ নিজে ইতিপূর্বেই (মানসী ঃ নিষ্ফল কামনা, ১৮৮৭) সফলভাবে মুক্তক ব্যবহার কবেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালেব বচিত মুক্তক তাঁব দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমালোচক মন্তব্য কবেছেন 'কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই তাহা বলিতে পাবি না।'—দ্বিজেন্দ্রলাল আলোচ্য দুটি কবিতাতেই নিজেব অনুবোধে মাঝে মাঝে পংক্তি-শেষেব ভাবযতি ক্ষুণ্ণ কবেছেন,—সম্ভবত ববীন্দ্রনাথ এখানে তাবই উল্লেখ কবেছেন। 'উৎসর্গ' কবিতায় উদ্ধৃতাংশে কবি 'সুব হইত' কথাটিকে বিশ্লিষ্ট কবে দুটি পংক্তিতে সাজিয়েছেন। 'আশীর্বাদ' কবিতাটিব দ্বিতীয় স্তবকে এব জায়গায় পংক্তিবিন্যাস কবেছেন,

দ্বিজেন্দ্র মুক্তকে পংক্তি প্রান্তিক যতিব মর্যাদা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি

যে কামনা যে অর্চনা যে ধ্যান-নিবত
ছিলি,— শত
উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশা আকাশকুসুম, শিশু জীবনে শত
সাধ, ভাঙ্গাগড়া কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত

এখানে 'নিবত ছিলি', 'শত উদ্বেগ', এবং 'শতসাধ' শব্দগুচ্ছ তিনটিব প্রত্যেকটিকেই ভেঙে দুই পংক্তিতে সাজিয়েছেন। প্রবহমান পয়াবেব তুলনায় মুক্তকে অধিকতব ভাবমুক্তিব মূল উদ্দেশ্যই এখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মুক্তক বাক্যশেষে ভাবগত পূর্ণতা দেবাব জন্যই পংক্তি ভাবানুযায়ী ছোট বড় হয়, ছন্দযতি এখানে ভাবযতিব সম্পূর্ণ অনুগামী হয়। কবি পংক্তি বচনায় সেই ভাবেব পূর্ণতাকে উপেক্ষা কবেছেন। এই বিপদেব কথাই ববীন্দ্রনাথ উল্লেখ কবেছেন অনুমিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'আবগাথা' ২য় ভাগেব অন্তর্গত কবিতাগুলি লিখবাব সময় থেকেই

ছন্দে সাবলীল কথ্য ভঙ্গী প্রকাশের নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দও তাঁর হাতে এক নতুন গতিবেগ লাভ করেছে। 'মন্দ্র' কাব্যে এই ছন্দের বাক্‌ধর্মী ব্যবহারে তিনি যে বিদ্রোহী চেতনা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের সমালোচনায় যে মন্তব্য করেছেন এখানে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে।—

মন্দ্রকাব্যে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য

মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত এবং তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্ম-বিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে কি ছন্দোরচনায় কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে :- আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।

'মন্দ্র' কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই, ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্তনশীল নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময় সমস্তই পুরুষের—তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে।...

দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্য-ভাষার বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেগভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।...

[আধুনিক সাহিত্য ঃ মন্দ্র ঃ র. র. ৯, পৃ ৪৮৯-৪৯০]

এ কাব্যগ্রন্থে কবি মাত্র দুটি পদ্য (নববধূ এবং জাতীয় সংগীত) কলাবৃত্ত রীতিতে লিখেছেন। বাকী সমস্ত কবিতাই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লিখিত। এখানে বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে কবির বাকধর্মী রচনাদর্শের নিদর্শন দিচ্ছি।—

(১) প্রবহমান পয়ার :

বাকধর্মী প্রবহমান পয়ার : উদাহরণ

কি গো। তুমি কে আবার। বলি কোথা হতে ?
কি চাও ?—কি মনে করে এ বিশ্ব জগতে ?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ ; এই শাঠ্য, এই মিথ্যাকথা,
এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্তভূমি
মাঝখানে—বলি—ওগো কে আবার তুমি ?

[মন্দ্র : আগন্তুক : দ্বি.. গ্র. (সা. প. সং) পৃ ৩৩৭]

বাক্‌ধর্মী উচ্চারণের খাতিরে বাক্যাংশকে কবি এখানে যথেচ্ছ ভাবে ছোট বড়ো করেছেন।

(২) প্রবহমান স্তবকবন্ধ :

প্রবহমান পংক্তিবন্ধে রচিত স্তবক

আমি তরঙ্গিত আবর্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল ;—কবি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি ;
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী !— নীরব
সহ্য কর বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, অপমান, উপদ্রব,
সহ নিরবধি।

[মন্দ্র : দাঁড়াও : ঐ : পৃ ৩৪৮]

অনুরূপ পাঁচটি স্তবকে কবিতাটি রচিত। এখানে পংক্তি-মিল এবং সেই সঙ্গে ভাবের প্রবহমানতা একসঙ্গে রাখতে গিয়ে পংক্তিপ্রান্তের ছন্দযতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

(৩) দশ পংক্তিক (স্পেনসেরীয় স্তবক-প্রভাবিত ?[৭]) স্তবক : পয়ার+মহা-পয়ার : প্রবহমান :

দশ পংক্তিক স্তবক :

'খাসা'। 'বেশ'। 'চমৎকার'। 'কেয়াবাৎ'! 'তোফা'।—
কহিয়াছে নান বিধ— সকলেই বটে,

৭। স্পেনসেরীয় স্তবক নয় পংক্তিতে রচিত হয়। প্রথম আয়াম্বিক (দ্বিদল : দ্বিতীয় দলে প্রস্বর) পঞ্চ র্বিক আটটি পংক্তির মিল যথাক্রমে : কখকখ, খগখগ, নবম আয়াম্বিক ষট্‌পর্বিক পংক্তির মিল : গ। দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে দশপংক্তি স্তবক রচনা করেছেন, মিল যথাক্রমে : কখকখ, গঘগঘ, ঙঙ, স্পেনসেরীয় স্তবক মিল থেকে অনেকাংশে পৃথক প্রথম নয় পংক্তি ১৪ মাত্রার

দেখিয়াছে, তাজ! কভু যে তোমার শোভা,
উপবন অভ্যন্তরে, যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে, তুমি "বিশ্বে পরীভূমি";
কেহ কহে, "অষ্টম বিস্ময়"; কেহ কহে
"মর্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,"
আমি জানি, তুমি তার একটিও নহ;
আমি কহি, না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

[মন্দ্র : তাজমহল (আগ্রায়) : ঐ পৃ ৩৮৯

অনুরূপ দশটি দশপংক্তিক স্তবকে কবি 'তাজমহল' কবিতাটি রচনা করেছেন অত্যধিক সংলাপপ্রধান করাতে, এবং মাত্র ১৪ মাত্রার পংক্তির মধ্যে একাধিকবা ভাবযতি পড়াতে ধ্বনিগাম্ভীর্য অনেকাংশে শিথিল হয়েছে। পাঠকদের পক্ষ থেক এই ভাব- ও ছন্দ-গাম্ভীর্যের অভাব সম্পর্কে যে আপত্তি উঠতে পারে কবি সে বিষয় সচেতন ছিলেন মনে হয়। 'সমুদ্রের প্রতি (পুরীতে)' কবিতায় ছন্দোবন্ধেই ক লিখেছেন।—

'সমুদ্রের প্রতি' ১৮ মাত্রার মহাপয়ার রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার সঙ্গে তুলনীয়

(৪)—না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে!
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে!
ভারি অর্থপূর্ণ;— নয়?—হে সমুদ্র! বলো ভাই বলো,
মাফ করো কথাগুলো; অশ্লীলটা না হলেই হল;
তোমার যে প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব না হানি;—
যার যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর! আমি বেশ জানি।[৮]

[মন্দ্র : সমুদ্রের প্রতি (পুরীতে), ঐ : পৃ ৩৬১-৬২

১৮ মাত্রার পংক্তিতে (প্রয়োজনে প্রবহমানতা রেখে), ছয় পংক্তির স্তবকবন্ধে লিখি কবিতাটির কোথাও কিন্তু কবি ছন্দগাম্ভীর্য (বা ভাবগাম্ভীর্য) আনেননি। রত্নাকরে

পয়ারবন্ধে রচিত, দশম পংক্তিটি আঠার মাত্রার মহাপয়ার। খাঁটি স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শের এক উদাহরণ আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে দিয়েছি (পৃ ১৭৪ দ্র) দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বেই নবীনচন্দ্র দশপংক্তিক একই মিলের স্তবক রচনা করেছেন; তবে সেখা প্রত্যেকপংক্তি ১৪ মাত্রার পয়ারবন্ধে রচিত। দশম পংক্তিটি এমন ১৮ মাত্রায় বর্ধিত নয়।

৮। কবিতাটির প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি শেষে 'ঐ হে' 'লাগসৈ হে'—শব্দের উচ্চারণে মিশ্রবৃ রীতিবিরোধী মাত্রা-সংকোচন ঘটেছে।

তাঁর প্রাপ্য কবি পরিহাস তরল গ্রাম্যভাষার 'লাগসৈ' প্রকাশ ভঙ্গিতেই উপহার দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, 'সোনার তরী'র অন্তর্গত ১৮৯৩-তে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধে রচিত 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি তুলনীয়। একই ছন্দ, কিন্তু ভাব ও ধ্বনির পার্থক্যে উভয় কবির হাতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি কবিতার জন্ম দিয়েছে।

(৫) প্রবহমান দীর্ঘ বাইশমাত্রা পংক্তির ছন্দ :

বাইশ মাত্রার দীর্ঘ পংক্তিবন্ধ

তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মতো।—তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ, কভু ব্যঙ্গ, কভু ঘৃণা, ফেলিয়াছ বিষাদ নিঃশ্বাস
কভু, কভু অনুতাপ, গম্ভীর গর্জন কভু, কভু তিরস্কার,
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করেছ উদ্গার;
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায়;
পরের দেশের জন্য জ্বলিয়াছ কভু তীব্র মর্ম বেদনায়।

[মন্দ্র : বাইরণের উদ্দেশ্যে : ঐ পৃ ৩৮৬]

প্রয়োজনে কবি এখানে একটি পংক্তির মধ্যে চারটি পূর্ণ ভাবযতিও এনেছেন। মিলের অনুরোধে এখানেও কবি পংক্তিপ্রান্তিক স্বল্পতম যতির মর্যাদা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ করেছেন।—কিন্তু ভাবের যতি ঠিক রেখে পাঠ করলে এই মিল পাঠকের কান এড়িয়ে যায়। এত দীর্ঘ পংক্তিক সমিল প্রবহমান ছন্দকে কবি স্বচ্ছন্দে ভেঙে মুক্তক পংক্তিতে লিখতে পারতেন।

(৬) ৬।৬।৬।৩ পর্বভাগের ২১ মাত্রা-পংক্তিক প্রবহমান ছন্দ :

একুশ মাত্রার দীর্ঘ পংক্তিবন্ধ : প্রবহমানতা : সংলাপভঙ্গি

এ কি ঘুম বাপ্! শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষঃ ছিল এক, ছ'মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষঃ ফি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের—
একবার জাগো!—শুধু একবার—হে কুড়ের বাদশাহ্!
দেখিনা, অন্ততঃ একবার ভুলে নয়ন মেলিয়া চাহ।

[মন্দ্র : হিমালয় দর্শনে : ঐ পৃ ১৪৫]

এখানে ছন্দের এবং ভাবের যতিতে পদে পদে বিরোধ ঘটেছে। তবু স্বাভাবিক বাক্ভঙ্গি প্রবর্তনের এ প্রচেষ্টার মধ্যে কবির দুঃসাহসিক নতুন পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

'আর্যগাথা ২য় ভাগে' 'পিউ' নাম দিয়ে—দ্বিজেন্দ্রলাল যে স্তব, ইংরেজী এবং

আইরিশ গানের অনুবাদ করেছেন সেখানেই প্রথম দলবৃত্ত ছন্দের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখানে তিনি, (ক) মিশ্রবৃত্ত রীতির সঙ্গে দলবৃত্তের সংমিশ্রণে নতুন মিশ্র উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছেন। (খ) লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণ সংকোচণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় উচ্চারণ-ভঙ্গীর দলবৃত্ত ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছেন; (গ) সর্বোপরি, পাশ্চাত্য দলভিত্তিক দীর্ঘযতি (cæsuric) ছন্দের আদর্শে বাংলা পদযতি-প্রধান ছন্দে সংশ্লিষ্ট দল উচ্চারণের নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন।—এই পরীক্ষার পরিণত ফসল আরও পরে 'আলেখ্য' এবং 'ত্রিবেণী' কাব্য-গ্রন্থে মিলেছে।

আর্যগাথা ২য় ভাগের অনুবাদ কবিতায় ছন্দের বৈচিত্র্য

ছন্দে যথাসম্ভব ভাবমুক্তি এবং গদ্য বাচনভঙ্গির স্বাভাবিকতা আনতে এই সময় থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ভাবে সচেতন হয়েছেন। তিনি একাধিক কবিতায় মিশ্র কলাবৃত্ত উচ্চারণরীতির সঙ্গে প্রয়োজন মতো শব্দশেষের রুদ্ধ দলকে সঙ্কুচিত একমাত্রায় উচ্চারণ করে ছন্দে বাক্‌ধর্মী সংশ্লিষ্টতা আনতে চেয়েছেন। যেমন—

মিশ্র উচ্চারণের ছন্দ

মাত্রাভাগ

জেনো যদি তোমার চারু ॥ যৌবনের ও রূপরাশি ॥ ৮ ॥ ৮ ॥
দেখি যাহে প্রেমভরে কত; I ১০I

কাল আমার আলিঙ্গনে ॥ মিলাইয়া যায় আসি ॥
স্বপ্নলব্ধ ঐশ্বর্যের মত, I

তবু তুমি পূজ্য রবে ॥ তেমতি, এখন যথা ॥
—থাক চলে মাধুরী তোমার;

রবে প্রাণের প্রতি বাঞ্ছা ॥ জড়াইয়ে শ্যামলতায় ॥
সেই প্রিয় ধ্বংসের চারিধার। I

[আর্যগাথা ২য় ভাগ : Believe me if all : ঐ : পৃ ৯৬৩]

৮ ॥ ৮ ॥ ১০ I মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীতে কবি প্রয়োজন মতো শব্দশেষের রুদ্ধদলকে দুই মাত্রায় বা এক মাত্রায় উচ্চারণ করেছেন। এই মিশ্র রীতির পরীক্ষা কবি তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে' এবং 'হাসির গানে'ও করেছেন। আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এই জন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যকমত কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমবেশী করিয়া চলিতে হয়। অমন করিয়া বরঞ্চ মনে মনে পড়া চলে, কিন্তু কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে হইলে পদে পদে অপ্রতিভ হইতে হয়।...আষাঢ়ের অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। [আধুনিক সাহিত্য ঃ আষাঢ়ে]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও আলোচ্য কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন,—"এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য কবিতা নামেই অভিহিত করা সঙ্গত।

[আষাঢ়ে ঃ ভূমিকা ঃ ঐ ঃ পৃ ১৬৬]

এখানে আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থ থেকে মিশ্র উচ্চারণ রীতিতে লিখিত কবিতার একটি স্তবকবন্ধ উদ্ধৃত করছি,—

হরিনাথ দত্ত চড়ে সকাল বেলার ট্রেন,
দুর্গাপূজার ছুটি শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।
এ কথাটি সত্য, হরিনাথ দত্ত
পাটনায় চাকরী করেন ; কিন্তু সে চাকরীর অর্থ
বলা কিছু শক্ত ; কারণ এটি ব্যক্ত
যে হরিনাথ মাঝে মাঝে শ্বশুরকে তাঁর ত্যক্ত
করেন টাকার জন্য ; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে করে, অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃমাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

[আষাঢ়ে ঃ হরিনাথ দত্তের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ঃ ঐ ঃ পৃ ২১২]

এই কবিতাটির মিশ্ররীতি এবং কথ্যভাষা সম্পর্কে কবি আরও মন্তব্য করেছেন,—"যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদের দুন্দুভিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?" [আষাঢ়ে ঃ ভূমিকা দ্র.] ছন্দের উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে মিশ্ররীতির উচ্চারণে, প্রবহমান পংক্তিবন্ধে, চমৎকার পদ-পংক্তি-মিলের স্তবক-সজ্জায় এমন একটি সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব ছিল না। তবে এ কথা স্বীকার্য মিশ্ররীতির উচ্চারণে [illegible]

কবিকে ঠিকমত অনুসরণ করতে, প্রয়োজনমত মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অথবা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের পদযতিপ্রধান দলবৃত্ত রীতিতে পাঠভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করতে যথেষ্ট দ্বিধায় পড়েন।

হাসির গানের মিশ্র ছন্দের কবিতা ইংরেজী শব্দ বহুল একটি উদাহরণ

'হাসির গানে'ও দ্বিজেন্দ্রলাল, মিশ্রছন্দের অনেকগুলি গান লিখেছেন। সেখানে কোনও কোনও গানে ইংরেজি শব্দের বহুল প্রয়োগে ছন্দকে আরও শিথিলবদ্ধ করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত তুলছি,—

যদি জানতে চাও আমরা কে,

আমরা Reformed Hindoos.

আমাদের চেনে নাক যে,

Surely he is an awful goose;

কেননা, আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood

যে একটু heterodox আমাদের food;

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এটা' 'ওটা' 'সেটা' যখন

we choose

কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think

তবে you are an awful goose.

[হাসির গান : Reformed Hindoos : ঐ : পৃ ২৭০–৭১]

কবিতাটি বিশুদ্ধভাবে মিশ্রবৃত্ত, সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত বা অন্য কোন প্রচলিত রীতির ছন্দেই লিখিত হয়নি, তবু পদবন্ধন বা যতিভাগ স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। কবি একমাত্র লক্ষ রেখেছেন, পদ্যের কাঠামোতে স্বচ্ছন্দভাবে গদ্য উচ্চারণ-ধর্মী স্বাভাবিক বাকপদ ব্যবহারের প্রতি। প্রয়োজনমত কলাবৃত্তের বিশিষ্ট উচ্চারণ রীতিও এখানে এনেছেন। তবে হাসির গানের অন্তর্গত এই কবিতা আসলে গান হিসাবে রচিত; গানের সুরারোপে ছন্দের উচ্চারণ-শিথিলতা ঢেকে যায়। বিশুদ্ধ পাঠ্য কবিতা এমন মিশ্ররীতিতে পাঠ করতে হলে কিছুটা বিভ্রান্তির সম্ভবনা থাকে।

লৌকিক দলবৃত্তের ব্যবহার

ছড়াগানে ব্যবহৃত লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক কবিতা-গানে ব্যবহার করেছেন। এই রীতিতে, কিছুটা শিথিল ছন্দোবন্ধে, তিনি সর্বপ্রথম আর্যগাথা ২য় ভাগের কয়েকটি গান লিখেছেন।

এখানে তার থেকে দু-একটি উদাহরণ তুলছি।—

(১) লয়ে তার প্রাণের কথা
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে ;
কভু বা মনের দুখে,
অধো মুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

[আষাঢ়গাথা ২য় ভাগ ঃ ঐ পৃ ৯০]

(২) উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্‌রে চলে
পাষাণ ভাঙা নির্ঝরিণী— ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ;—
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ—চুলগুলি তার দোলে ;
—যাসরে কোথা — আয়রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে।

[ঐ ঃ পৃ ১১০-১১]

অতিপর্বিক স্পন্দন

'হাসির গানে'ও কবি এই ছন্দে অতিপর্বিক অপূর্ব ধ্বনিস্পন্দ ফুটিয়েছেন এমন নিদর্শন মিলছে। যেমন –

কৃষ্ণ বলে, "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর—রাধা বলে, "কেন মিছে আমারে জ্বালাও
মরি নিজের জ্বালায়।"
কৃষ্ণ বলে, "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর—রাধা বলে, "এখন তাতে মোটেই রাজী নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"

[হাসির গান ঃ কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ ঃ ঐ ঃ পৃ ২৬৯]

ইংরেজি ট্রোকে ছন্দের (ˈ‿) ঝোঁকসহ সুরাশ্রয়ী উচ্চারণে ভাবগত আমেজ কত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হতে পারে হাসির গানের একটি রচনায় কবি তারও পরীক্ষা করেছেন। যেমন—

হ'লকি! এ | হ'ল কি! | – এত ভারি | আশ্চয্যি!
বিলাত-ফের্তা | টান্‌ছে হুক্কা, | সিগারেট খাচ্ছে | ভশ্চায্যি।
হোটেল ফের্ত, মুন্সেফ ডাকছেন "মধুসূদন কংসারি!"
চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারি!

[হাসির গান ঃ হ'লকি ঃ ঐ পৃ ২৭৬]

এখানে প্রত্যেকটি পর্ব সমান গুরুত্ব পেয়েছে। শিথিল লয়ের উচ্চারণে প্রতিপর্বের প্রথমাংশে প্রস্বর ব্যবহারের ফলে 'সিগারেট খাচ্ছে' এবং 'মুন্সেফ ডাকছেন' পর্বদুটিতে কলাবৃত্তের গুরুভারও সমতা পেয়েছে। দল এবং কলার পরিমাপের দিক থেকে এ-ছন্দকে লৌকিক উচ্চারণ-প্রকৃতির দলবৃত্ত রূপে গণ্য করতে হয়।[৯]

লৌকিক দলবৃত্তের কলা-সংকোচন

আর্যগাথার 'পিউ' অংশভুক্ত একশ্রেণীর অনুবাদ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম এই লৌকিক কলাবৃত্তের উচ্চারণের সঙ্কোচন ঘটিয়ে তাকে বহুলাংশে গভীর ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তুলেছেন। যেমন—

যখন দেখবে। চারিধারে ॥
শীতের পাতা। গ্যাছে ঝরে ॥
আমায় একবার। মনে কোরো ; ।
দেখ্‌বে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—
আমায় একবার মনে কোরো।
যখন শুনবে প্রেমগানে,
ঢালিবে সে মধু কানে,
হয়তো ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখি'পর ;
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে,
আমায় একবার মনে কোরো।

[আর্যগাথা ২য় ভাগ : Go where glory waits thee : ঐ : পৃ ১৬০]

'হাসির গানে'ও লেখক লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছেন। যেমন :

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার ;
এম্নি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম ব্যক্ত ;

৯। ইংরেজি রীতিতে স্ট্রোকে উচ্চারণে ছন্দটির পাঠ হল :

হল : কি এ | হল : কি। | এত : ভারি | আশ্‌চর্‌ : য্যি,—
বিলাত্‌ : ফেরতা | টান্‌ছেন্‌ : হুক্‌কা | সিগা রেট : খাচ্‌ছে | ভশ্‌চাব : যা,—

দিনের মত জিনিষ হত রাতের মত অন্ধকার,

জলের মত বিস্ময় হত ইঁটের মত শক্ত।

[হাসির গান ঃ চণ্ডীচরণ ঃ ঐ ঃ পৃ ২৯০]

অথবা ঃ

বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা রূপোর নয় ;

তার আকাশেতে সূর্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ;

তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে ;—

—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কর্ছ্ব নাক মোটে ;

কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি, এ সব সত্যি কথা ভাই ;

তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

[হাসির গান ঃ বিলেত ঃ ঐ ঃ পৃ ৩১১-১২]

এখানে কবি দলের উচ্চারণ-প্রসারণ এবং পর্বযতিস্পন্দন যথাসম্ভব কমিয়ে পদযতির দীর্ঘ চাল এনেছেন। তবু এ-সব উদাহরণে প্রাচীন ছড়ার ছন্দকেই বাক্‌ধর্মী সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের স্বাভাবিকতা দিয়ে নতুন রীতিতে চালাবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা পুষ্টতরভাবে রবীন্দ্রনাথও করেছেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যে অনমনীয় উচ্চারণ-দৃঢ়তা এবং বাকধর্মী স্বাভাবিকতা ছন্দের কাঠামোতে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন এমন লৌকিক পর্বযতিপ্রধান ছন্দোবন্ধে উচ্চারণ সংকোচনের দ্বারা তা প্রকাশ করা পুরোপুরি সম্ভব নয় বুঝেই আরও দুঃসাহসিক নতুনতর রীতির পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর এই রীতিকে বলা চলে পদপ্রধান দীর্ঘ যতিভাগের ছন্দের দলমাত্রিক রূপ। আট, ছয় বা দশ মাত্রার পদভাগে তিনি এখানে রুদ্ধ-মুক্ত নির্বিশেষে প্রত্যেক দলে এককলা উচ্চারণ রেখেছেন। তার ফলে ছন্দ বিস্ময়কর রূপে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দৃঢ়তা পেয়েছে। আর্যগাথা ২য় ভাগে এ-ছন্দ রচনার প্রাথমিক সূচনা কিভাবে হয়েছিল তার উদাহরণ তুলছি।—

(মার্জিনে: দীর্ঘ পদভাগের দলবৃত্ত ছন্দ)

তোমার ভক্ত অনুরাগী॥ চলে যাবে যখন শুধু—॥

অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি ?।

যখন তারা দুষ্‌বে জীবন অর্পিত যা তোমার পদে

ঝরবে কি গো তোমার দুটি আঁখি—

কেঁদো, যতই দুষুক শত্রু, তোমার চোখের জলে প্রিয়ে

ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—

জানেন যিনি অন্তর্যামী তাদের কাছে দোষী হ'লেও
ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

[আর্যগাথা ২য় ভাগ : When he who adores thee : ঐ পৃ ১৫৮-৫৯]

এখানে ৮॥৮॥১০ I দলমাত্রা-ভাগে দীর্ঘ পদযতির ছন্দ রচিত হয়েছে। দীর্ঘত্রিপদী-বন্ধের কাঠোমোতে কবি মিশ্রবৃত্ত রীতি প্রয়োগের পরিবর্তে প্রতিমাত্রায় এক একটি রুদ্ধ বা মুক্ত দল বিন্যাস করে গেছেন।—সে কারণেই লঘু পর্বযতির স্পন্দন এখানে অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছে। একটু শিথিল ভঙ্গিতে হলেও, এই পদযতিপ্রধান সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলমাত্রিক ছন্দ কবি আর্যগাথার 'পিউ' অংশে সংকলিত আরও কয়েকটি কবিতায় এবং আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি গানে নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের পূর্ণবিকাশ

তবে এই ছন্দের গম্ভীর ভাবাত্মক পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনার দিক থেকে 'আলেখ্য' (১৩০৭) কাব্য গ্রন্থটির গুরুত্ব সবাধিক। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও যে এ বিষয়ে পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন, গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত ছন্দ বিষয়ক আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ভূমিকায় কবি লিখেছেন,—

ভূমিকায় কবির মন্তব্য

> এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (Syllabic); 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূব হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভরতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কবিগণ প্রায়ই এ ছন্দ বর্জন ক'রে, 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্তিত ক'রেন। আমি সেই পুরোনো মাত্রিক ছন্দেই এই কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে, আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্তে চেষ্টা করেছি। [ঐ : পৃ ৪০৫]

কবি 'মাত্রিক' বলতে এখানে দলমাত্রিক এবং অক্ষর হিসাবের ছন্দ বলতে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ বোঝাতে চেয়েছেন। পূর্ব যুগেও বাংলা কবিতায় যে 'মাত্রিক ছন্দ' অর্থাৎ দলমাত্রিক (লৌকিক ছড়া গানের) ছন্দ প্রচলিত ছিল কবি তার উল্লেখ করেছেন। সে ছন্দে উচ্চারণ-শিথিলতা ছিল (সম্ভবত এখানে কবি দলমাত্রিক কলা-প্রসারণের কথাই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন)। এ-কাব্যগ্রন্থে কবি দলমাত্রিক ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার (অর্থাৎ একদলে এককলামাত্রিক উচ্চারণের) এবং তালের অধীন করতে চেয়েছেন। লৌকিক ছড়া-গানে প্রচলিত দলবৃত্ত ছন্দ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত দলমাত্রিক ছন্দে পার্থক্য কোথায় এই মন্তব্যে কবি সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।[১০] লৌকিক দলবৃত্তে এতকাল পর্বযতি এবং বলপ্রস্বর

১০। আলেখ্য কাব্যের ভূমিকাতে লেখক আরও স্পষ্টতর উদাহরণ সহযোগে এ ছন্দের তাল

(stress accent) দিয়ে প্রসারিত উচ্চারণে সুরধর্মী ভাবে পাঠ করা হত। দ্বিজেন্দ্রলাল লঘুযতি এবং বলপ্রস্বর তুলে দিলেন ; পদযতির দীর্ঘচাল এবং উচ্চারণের সংশ্লিষ্টতা এনে দলবৃত্ত ছন্দ স্বাভাবিক বাক্‌ধর্ম পরিস্ফুটনে কতটা উপযোগী তা প্রমাণ করলেন। বাংলা ছন্দে এটিই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যেতে পারে।

আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা

কি ভাবে দিতে হবে তাও বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,— "আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্তে চেষ্টা করেছি।

১ম উদাহরণ। প্রাতরাশে ব্যস্ত ছিলাম আমি
প্রাঙ্গে, একা বাড়ীর মধ্যে নীচে

এ কবিতায় প্রতি পংক্তিতে মাত্রা দশ (অক্ষর যতই হোক), ও তাল বা ঝোঁক (কোথায় কোথায় ঝোঁক পড়বে, তা মাথায় দাঁড়ি টেনে দেখানো হয়েছে) প্রতি পংক্তিতে তিন।

২য় উদাহরণ। কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা।

এখানে মাত্রা প্রতি দুই পংক্তিতে পর্যায়ক্রমে বারো ও দশ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষ মাত্রা (দশম মাত্রা) যুক্তাক্ষরধ্বনিক

৩য় উদাহরণ কাব্য নাটক ছন্দোবদ্ধ
মিষ্ট শব্দের কথার ছাব

এখানে মাত্রা পর্যায়ক্রমিক আট ও সাত। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

৪র্থ উদাহরণ। সহে নাক কিছুই বেশী সহে নাক রাজাধিরাজ
অতি দম্ভী অত্যাচারী পেতে হবে সাজা।

এখানে মাত্রা আনুক্রমিক ষোল ও চৌদ্দ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

তাল বিভাগ করে আরও বাড়ানো যায়, তবে তাতে ছন্দ রচনা করা একটু অধিক দুরূহ হয়। অনেক সময় তাল ঠিক কোন জায়গায় পড়বে, তা অর্থের উপর নিভর করে।

আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই বোধ হয়। একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে এ ছন্দ পড়া অত্যন্ত সোজা হবে। আর এই ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা সংগীত ও শক্তি লক্ষিত হবে।

এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "কোমল তরল জল" কেহ "কো ম ল ত র ল জ ল" পড়েন না। "কোমল্ তরল জল" এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, সেইরকম উচ্চারণ) করতে হবে অন্যরূপ উচ্চারণ করলে ছন্দ মাত্রিক হবে না ও গীত ভঙ্গ হবে।"

[৭. ভূমিক : পৃ ৪০৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে যে তাল বা ঝোঁকের কথা বলেছেন এবং উদাহরণ তুলেছেন, আলেখ্য কাব্য গ্রন্থের একাধিক দীর্ঘ পদভাগের কবিতায় এত ঘন ঘন ঝোঁক আসেনি,—অনেক ক্ষেত্রে 'পংক্তি ছাপানো' প্রবহমানতা এসেছে, এবং তাতেও উচ্চারণে সংহত দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে। ঝোঁক বা stress accent এর দিকে যেখানে কবি আদৌ গুরুত্ব দেননি সেখানেই এই ছন্দ সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক উচ্চারণের শক্তি ও দৃঢ়তা লাভ করেছে।

আলেখ্য কাব্যে ব্যবহৃত এই সংশ্লিষ্ট রীতির দলবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

আলেখ্যের ছন্দ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য

> দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য (এবং অন্যান্য) কাব্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেকস্থলেই আমরা যাকে স্বরবৃত্ত বলি ঠিক সেই ছন্দটি রচনা করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই একটি syllabic রূপ দিতে। আমার মনে হয়, এই তথ্যটি ভালো করে উপলব্ধি না করলে তাঁর আলেখ্য গ্রন্থের ছন্দের আসল রূপটি ধরা পড়বে না। যা হোক, এই জন্যই দেখতে পাই তাঁর এই syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয়নি। এমন কি, তাঁর এই syllabic ছন্দে স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোকসাহিত্যের অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্বরবৃত্ত তালটিকেই অভিজাত সাহিত্যে স্থান দিতে চাননি। তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত যৌগিক ছন্দকেই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জন্যেই তার এই অভিনব syllabic ছন্দে যৌগিক ছন্দেরই যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি দেখা যায় এবং এই syllabic ছন্দেও যৌগিক ছন্দেরই সুর ও ধ্বনিগাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে অথচ ছন্দটা syllabic বলে তাতে যৌগিক ছন্দে দুষ্প্রাপ্য একটা অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্যও দেখা যায়।...তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাতে যৌগিক ছন্দের শ্লথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই,....অথচ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্য-পরায়ণতাও নেই।..এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও যৌগিকের অলস একটানা সুর বর্জিত হয়ে একটি অভিনব পৌরুষশক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি Iambic ছন্দের কবিতায়। আর দ্বিজেন্দ্রলালের এই syllabic ছন্দের প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয় না।
>
> [দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্তছন্দ : উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন, পৃ ৬৪৭-৬২] [১১]

১১। দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে লেখক এ-প্রবন্ধে যথাক্রমে স্বরবৃত্ত এবং যৌগিক ছন্দ নামে পরিচিত করেছিলেন।

(১) ষোল মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী : মাত্রাভাগ ৮।।৮ I

কবিতা উদাহরণ

এটা খারাপ।—কিসে খারাপ ।।—এতে শরীর খারাপ করে I
রাত্রি জাগাও খারাপ তবে ।। যাত্রায় কিম্বা থিয়েটারে। I
যে জন রাত্রি জাগে তাকে নিন্দা কর হেন ভাবে ?
আমি যদি উচ্ছন্ন যাই, উচ্ছন্ন তো সেও যাবে।
... ...
ক্রমাগত সন্দেশ কিম্বা ইলিশ মৎস্য খেলে পরে,
উদরাময় হোক বা না হোক, শরীর নিশ্চয় খারাপ করে ;
'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্' এটা বটে আমি মানি,
তবে কিসে খারাপ যদি একটু আধটু ব্রাণ্ডি টানি।

[আলেখ্য : দ্বাদশ চিত্র (মদ্যপ) : ঐ : পৃ ৪৫৬]

কথোপকথনের ভঙ্গিতে, ছোট বড় বাক্যে, চলতি ভাষায়, এখানে কবি দীর্ঘ দ্বিপদীবন্ধের দলবৃত্ত ছন্দে যে স্বাভাবিক বলিষ্ঠ উচ্চারণ ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সম্ভব ছিল মনে হয় না।

(২) দীর্ঘ ত্রিপদী : মাত্রাভাগ ৮।।৮।।১০ I

একখানি তার তরী ছিল ।। বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা ;— ।।
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ; I
একদিন তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে ;— পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।

[ঐ : নবম চিত্র (হতভাগ্য) : পৃ ৪৩৮]

বিষাদ-ভাব পরিস্ফুটনে কথ্য ভাষায় যে দীর্ঘ ত্রিপদী চালের ছন্দ পদান্তেও অনেক সময় প্রবহমানতা রেখে ব্যবহার করেছেন কবির বক্তব্য তাতে চমৎকার স্বাভাবিকতা পেয়েছে।

(৩) দীর্ঘ চৌপদী : মাত্রাভাগ : ৮।।৮।।৮।।৬ I

গভীরা তামসী রাত্রি ; ।। বিশ্বজগৎ ঘুমিয়ে গেছে ; ।।
আকাশ জুড়ে চতুর্দ্দিকে ।। ঘিরে আছে মেঘে ; I
মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ে ; শূন্য প্রান্তরেতে কেবল,
হু হু করে বহে যাচ্ছে সজল বাতাস বেগে ;
নাইক আলোক, নাইক শব্দ ;—কেবল আকাশ দীর্ণ করে
মুহুর্মুহু পূর্বভাগে খেলে বিদ্যুচ্ছটা ;

কেবল দূরে অতি দূরে—'গুরু গুরু' গুরু শব্দে
মুহুর্মুহু বজ্র হানে কৃষ্ণ ঘনঘটা ;

[আলেখ্য : একাদশ চিত্র (সিরাজদ্দৌলা) : ঐ : পৃ ৪৫০]

পরাজিত, পলাতক সিরাজদ্দৌলার চিত্র বর্ণনায় কবি এখানে দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে উপযুক্ত প্রকৃতি-পরিবেশের ছবি এঁকেছেন।

(৪) ছয়মাত্রা পর্বের চতুষ্পবিক দীর্ঘ দ্বিপদী : মাত্রাভাগ : ৬।।৬।।৬।।৩ I

দেখতে ভালো যাহা | দেখতে ভালবাসি, ।।
শুনতে ভালো যাহা | শ্রাব্য সে ; I
কিন্তু যেন মিষ্ট | ছন্দোবদ্ধ হলেই ।।
হয় না কোন কালেই | কাব্য সে। I

[ঐ : অষ্টম চিত্র (নর্তকী) : ঐ : পৃ ৪৩৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল এ-কবিতায় ছয়মাত্রার পর্বযতি এবং দীর্ঘ বারোমাত্রার পদযতি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তে এই ছন্দোবন্ধের প্রয়োগে নূতনত্ব রয়েছে।

(৫) ত্রিপদী : মাত্রাভাগ : ৮।।৮।।৬ I

কি আশ্চর্য ! কি সম্পূর্ণ ? | কি সুন্দর এ বিশ্ব বিকাশ | হচ্ছে অহরহ ? I
ব্যাপ্তি হতে নীহারিকা, | নীহারিকা হতে সূর্য, | সূর্য হতে গ্রহ ; I
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহা বিনাশ ; সৃষ্টি হতে লয় ;
কি তালে কি মহাছন্দে চলেছে এ মহানিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।
ভাবি সে কি মহাজ্বালা—"শূন্য" পাত্রের অন্ধকারে উর্ধে অধঃ হতে--
ফুটে উঠ্ছে জ্যোতিবিম্বে, বিম্ব ফেটে পড়্লে শেষে, কোথায় যাচ্ছে উড়ে ?
সে শক্তিমণ্ডলী কোথায় ?—যাহার বিকশিত শক্তি ঘোরাচ্ছে, গগনে,
বিশ্বঘড়ির কোটি কক্ষায়, কোটি এ জ্যোতিষ্ক চক্রে, মহা আবর্তনে !

[ঐ : উনবিংশ চিত্র (সত্যযুগ) : ঐ পৃ ৪৮৫]

এই কবিতাটি সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য

"পড়বার ভঙ্গি একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে পাঠক সহজেই অনুভব করবেন, কি স্বাভাবিক এই ছন্দ, এবং এর শক্তি ও গাম্ভীর্য কত ! বোধ করি লৌকিক ছন্দের চরম শক্তি ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতাটিতে ; আর কারও রচনায় লৌকিক ছন্দের শক্তি এর চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে বলে জানি না।"

আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের উনশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কবিতাতেই ছন্দোবন্ধের নতুনতর পরীক্ষা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে প্রত্যেক কবিতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া গেল।—

(আলেখ্যের কবিতা বিশ্লেষণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা)

প্রথম চিত্র (ঘুমন্ত শিশু) ঃ পয়ার ৮॥৬। ; আংশিক পর্বযতিস্পন্দ রয়েছে। যতিপ্রান্তিক, দু'একটি পংক্তি প্রবহমান।

দ্বিতীয় চিত্র (পুত্রকন্যার বিবাদ) ঃ দ্বিপদী ১০॥১০। , ভাব-প্রবহমানতায় পদযতি মাঝে মাঝে লুপ্ত ; পংক্তি যতিপ্রান্তিক।

তৃতীয় চিত্র (নূতন মাতা) ঃ দ্বিপর্বিক একাবলী ৬।৬। ; অনেক সময় ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ ঘটেছে। দলবৃত্ত ছয়মাত্রার যতিভাগ সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম ব্যবহার করেছেন। যতিপ্রান্তিক।

চতুর্থ চিত্র (বুড়োবুড়ী) ঃ ত্রিপদী ৮॥৮॥১০। ; ভাব-প্রবহমানতায় পদযতি সর্বত্র সমান নেই। যতিপ্রান্তিক।

পঞ্চম চিত্র (বিপত্নীক) ঃ ত্রিপদী ৮॥৬॥৬। ; ভাব প্রবহমানতায় পদযতি সর্বত্র সুনির্দিষ্ট থাকেনি। যতিপ্রান্তিক।

ষষ্ঠ চিত্র (মাতৃহারা) ঃ পদযতির ছন্দ ; পংক্তিবন্ধ অসমান ; সমিল মুক্তকধর্মী—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর মিশ্রবন্ধ।

সপ্তম চিত্র (বিবাহ যাত্রী) ঃ চৌপদী ; ত্রিপংক্তিক স্তবক ; মিল লক্ষণীয়।—

৮॥৮॥৮॥৮ । ৮॥৮॥৮॥৮ । ৮॥৮॥৮॥৭ ।
ক॥ক। —॥খ । গ॥গ॥ - ॥খ । ঘ॥ঘ॥ - ॥ঘ ।

অষ্টম চিত্র (নর্তকী) ঃ দ্বিপদী, ছয় মাত্রার পর্ব, ৬।৬॥৬।৩। ; তৃতীয় চিত্র থেকে এখানে ছন্দোবন্ধ ও মিল পৃথক, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই ছয় দলের যতিভাগ আছে।

নবম চিত্র (হতভাগ্য) ঃ ত্রিপদী ৮॥৮॥১০ । ; পদযতি সর্বত্র সুনির্দিষ্ট নয়।

দশম চিত্র (বিধবা) ঃ দ্বিপদী-ত্রিপদী মিশ্র-স্তবক।

মাত্রাভাগ ১০॥১০ । ৮॥৮॥১০ । ৮॥৮॥১০ ।
মিল ক॥ক । খ॥খ॥গ । খ॥খ॥গ ।

একাদশ চিত্র (সিরাজদ্দৌলা) ঃ চৌপদী ৮।।৮।।৮।।৬ I ; পদযতি মাঝে মা
ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দ্বাদশ চিত্র (মদ্যপ) ঃ দ্বিপদী ৮।।৮ I ; ভাবের অনুরোধে দু-এক স্থলে পদয
পরিবর্তিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ চিত্র (রাখাল বালক) ঃ ত্রিপদী ৮।।৮।।১০ I ; পদযতি সর্ব
স্পষ্ট নয়।

চতুর্দশ চিত্র (নেতা) ঃ দ্বিপদী ৪।৪।৪।।৪।৪।২ I ; এখানে চতুর্দল পর্বযতিস্প
সুস্পষ্ট। পদান্তর মিল।

পঞ্চদশ চিত্র (ভক্ত) ঃ দ্বিপদী ৬।৬।।৬।৩ I ; ছয় মাত্রার যতিভাগ সর্ব
স্পষ্ট নয়।

ষোড়শ চিত্র (রাজা) ঃ দ্বিপদী ৬।৬।।৬।৬ I ; যতি সর্বত্র স্পষ্ট নয়।

সপ্তদশ চিত্র (কবি) ঃ দ্বিপদী ৪।৪।।৪।৩ I ; চতুর্দল পর্বযতিস্পন্দ রক্ষিত হয়েছে

অষ্টাদশ চিত্র (বিপত্নীক২) ঃ ত্রিপদী ৮।।৮।।৬ I ; পদযতি সর্বত্র স্পষ্ট নয়।

ঊনবিংশ চিত্র (সত্যযুগ) ঃ ত্রিপদী ৮।।৮।৬ I ; ভাব-প্রবহমানতায় অনেক স
পদযতি লুপ্ত করেছেন। দীর্ঘ বাক্যে ভাব ও ছন্দে
গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একসময়ে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে দলবৃত্ত ছন্দে মেঘনাদব
কাব্য লিখিত হলে আরও স্বাভাবিক হত। তখন একাধিক সমালোচক কবির এ
অভিমতকে কটাক্ষ করেছিলেন। সম্ভবত তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকা
থেকে অংশ বিশেষ যে ভাবে তর্জমা করে পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন তাতে তাঁ
সন্তুষ্ট হতে পারেননি।[১২] কবি সেখানে লৌকিক দলবৃত্তের উচ্চারণ-সংকোচন ঘটি
যে ছন্দ রচনা করেছিলেন, ভাতে দ্বিজেন্দ্রলালের পদযতিপ্রধান দলমাত্রিক রীতি

মেঘনাদবধ কাব্যে দলমাত্রিক ছন্দ প্রয়োগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

১২। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে ল
দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আর
করা যেত—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হোতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে

সংহত উচ্চারণ এবং ধ্বনিগাম্ভীর্য পরিস্ফুট হয়নি। পর্বযতিস্পন্দের আংশিক চটুল নৃত্যভঙ্গি সেখানে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিতর্কের দীর্ঘকাল পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় সুগম্ভীর মহিমান্বিত ভাবছন্দে এই সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির উপযোগিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত এখানে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির দলবৃত্ত ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে পার্থক্যটি কোথায় একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বহুবারই উল্লেখ করেছেন যে, প্রাকৃত ছড়ার ছন্দই প্রাণবান সচল বাংলা ছন্দ। একে সাহিত্যের আসরে তিনি স্থান দিতে চেয়েছেন এবং দিয়েছেনও।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র-লালের সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দে পার্থক্য

রবীন্দ্র-কবিতায় এ-ছন্দের দুটি রূপ পাওয়া যায়। একটি সেই 'ছেলেভুলানো ছড়া'র প্রসারিত বল-প্রাস্বরিক উদাহরণের সুপরিচিত রূপ; অপরটি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের (যেরূপ 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতে মেলে) রূপ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ভাবগাম্ভীর্য ফোটাতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ পদযতি আনলেও পর্বস্পন্দন সম্পূর্ণ লোপ করেননি। পর্বযতিপ্রধান লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ থেকেই যে এ ছন্দের রূপান্তর ঘটেছে রবীন্দ্র ছন্দোরীতিতে সেটি স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল পদপ্রধান দলবৃত্ত ছন্দ রচনায় Cæsuric section-এ বিভক্ত ইংরেজি ছন্দের ছাঁদটিই মনে রেখেছেন। তারই বিকল্পরূপ হিসাবে মিশ্রবৃত্তে ব্যবহৃত আট-দশ বা আট-ছয় মাত্রার পদভাগের ছন্দোবন্ধে কলামাত্রার পরিবর্তে দলমাত্রা বিন্যাসের দ্বারা নতুন ছন্দ উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন। তার ফলে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনিশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ নতুন রীতির একটি ছন্দ বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছে। এ ছন্দ লৌকিক ছড়ার ছন্দের আদর্শে রচিত নয়। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত থেকে এখানে ধ্বনিগাম্ভীর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও উভয়েই বাক্‌ধর্মী চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন, তবু প্রয়োগরীতির দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। এই জন্যই 'মেঘনাদবধকাব্যে'র অংশবিশেষের দলমাত্রিক অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত বিশুদ্ধ পদভাগের

কোন্ বীরকে বরণ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

[ছন্দ (১ম সং) বাংলা ছন্দের প্রকৃতি : পৃ ৫৩]

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না।...

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেছিলেন।

দলবৃত্ত রীতিতে এই কাব্যাংশের রূপান্তর করলে সেখানে যথোচিত ভাব- ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য পরিস্ফুট করা সম্ভব বলেই মনে হয়।

'ত্রিবেণী' (১৯১২) কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তিন শ্রেণীর ছন্দ ব্যবহার করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন।[১৩] গ্রন্থের ভূমিকায় কবি ছন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতি সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কলাবৃত্তের মধ্যে "যুক্তাক্ষর, ঐ কার, ঔ কার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হয়" বলে কবি মন্তব্য করেছেন;—এখানে স্পষ্টতই তিনি কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত রীতির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কাব্যগ্রন্থটির 'মিতাক্ষর' বিভাগে লেখক বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত ছন্দের ('বিবাহের উপহার' পৃ ৫০৮, 'প্রথম চুম্বন' পৃ ৫১১ দ্র.) এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কবিতা চয়ন করেছেন। মাত্রিক বিভাগে প্রধানত যে কবিতা-গান বিন্যস্ত হয়েছে তার ছন্দ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতির দলমাত্রিক হলেও, লৌকিক দলবৃত্তেরই সংহতরূপ বলা চলে। পর্বযতি লোপ পেলেও তার স্পন্দনটুকু আংশিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে। তবে 'দশপদী' বিভাগে দলমাত্রিক যে ১৮ মাত্রা পংক্তির ২৭টি দশপংক্তিক কবিতা সংগ্রথিত করেছেন তার ছন্দ 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলির ন্যায় বিশুদ্ধ পদযতিভাগে (এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রবহমান) সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের উচ্চারণে রচিত হয়েছে।

(পার্শ্বটীকা: ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের ছন্দ)

১৩। ত্রিবেণীর ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মিতাক্ষর—অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর ঐকার ও ঔকার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্রচিত 'মন্দ্র' কাব্যে সমস্ত কবিতা, এই শ্রেণীর। (২) মাত্রিক—অর্থাৎ যে কবিতায় ছন্দ মাত্রা ('syllable') দ্বারা পরিমিত হয় মদ্রচিত 'আলেখ্য' কাব্যে সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীর। (৩) দশপদী—অর্থাৎ 'মাত্রিক কবিতা' যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দশপদী কবিতা না লিখিয়া দশপদী কবিতা লিখি কেন ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজী বা ইটালিয়ান Sonnet এর অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী। অষ্টপদী, ষট্‌পদী বা চতুর্দশপদী কবিতা কেহ প্রচার করিতে চাহেন—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার কাছে বেশ 'যুৎসৈ' ঠেকে। এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে 'আলেখ্যে'র কবিতাগুলিরই মত একটু শক্ত ঠেকিবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট হইবে না আশা করি।

(পার্শ্বটীকা: ত্রিবেণীর ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্য)

[ত্রিবেণী: ভূমিকা. ঐ পৃ ৪৯১]

ইংরেজি কাব্যে Rhyme Royal (সাত পংক্তির স্তবক), Ottava Rima (আট পংক্তির স্তবক), Spenserian Stanza (নয় পংক্তির স্তবক) ইত্যাদি বিশিষ্ট রীতির স্তবক সুপরিচিত। দশ পংক্তির স্তবকেও কীট্‌সের Ode to Nightingale, ম্যাথু আর্নোল্ডের Scholar Gipsy, রসেটির Burden of Nineveh প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা লেখা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন বাংলা কবিতায় সুপ্রচলিত সনেটের তুলনায় দশপংক্তিক, প্রবহমান, আঠারমাত্রা পংক্তির সংশ্লিষ্ট নবরীতির দলবৃত্ত ছন্দ কবিতা বেশী পছন্দ করেছিলেন। ত্রিবেণী কাব্য-গ্রন্থের 'দশপদী' বিভাগে তিনি মোট সাতাশটি এই শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন (মাত্রিক বিভাগেও দু-একটি কবিতায় মাঝে মাঝে দশপংক্তিক স্তবক ব্যবহার করেছেন)। এই কবিতাগুলিতে চতুর্বিধ পংক্তিমিল লক্ষিত হয় : (১) কখখক গঘঘগ ঙঙ, (২) কখখক গঘগঘ ঙঙ, (৩) কখকখ গঘগঘ ঙঙ, (৪) কখকখ গঘঘগ ঙঙ।—সবগুলিই প্রবহমান আঠারো (কদাচিৎ সতের) দলমাত্রিক মহাপয়ার পংক্তিবন্ধে রচিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি 'দশপদী' কবিতা উদ্ধৃত করছি।—

দশপংক্তিক প্রবহমান সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির কবিতা

একটি বর্ণময়ী চিন্তা, একটি ক্ষুদ্র স্বপ্ন স্বর্ণময়, ক
গীতিময়ী স্মৃতিসম প্রভাত হয়েছিলে—হে উর্বশী। খ
যে দিন আমার জীবনে এ ; বুঝেছিলাম এ প্রকৃত নয়, ক
রবে না এ ;—যবে বিশ্বের সমগ্র মাধুরী মহীয়সী খ
ওঠে স্বর্গে ধূমায়িত হয়ে, নিঃস্ব করি মর্তভূমে, গ
শেষে একটি রূপবিন্দু হয়ে ধীরে ধরাতলে নামে ; ঘ
সহে না প্রকৃতি তাহা ; আমি যবে মগ্ন মোহঘুমে, গ
তোমায় বক্ষে রেখে প্রিয়ে, তুমি (করি বিদলিত কামে ঘ
প্রেমসম) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত ক'রে ঙ
উড়ে গেলে, মিশে গেলে সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত অম্বরে। ঙ

[ত্রিবেণী : উর্বশী : ঐ : পৃ ৫৩৫]

ভাবের দিক থেকে বিচারে প্রত্যেকটি কবিতা সমান সার্থক হতে পেরেছে বলা চলে না। তবে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার যে কত বলিষ্ঠভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং মহাকাব্যের মহিমান্বিত বিষয়বস্তু যে এ ছন্দেই কত সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করা যায়—আলেখ্য ও ত্রিবেণী কাব্যের অন্তর্গত আলোচ্য শ্রেণীর কবিতাগুলি পাঠ করতে গেলে সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত বা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত ছন্দ, যেটাই ব্যবহার করুন না কেন, সর্বত্রই প্রধানত বাক্‌ধর্মী স্বাভাবিক ভাবমুক্তির দিকে তাঁর সচেতন দৃষ্টি ছিল। সেই একই কারণে কৃত্রিম সাধু উদাহরণের ভাষার তুলনায় হসন্তপ্রাণ কথ্যভাষা ব্যবহারের দিকেই তাঁর বেশী প্রবণতা দেখা যায়। এ সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট মতবাদ আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় (এবং অংশত আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়) প্রকাশ পেয়েছে। আলেখ্যের ছন্দ আলোচনা শেষে কবি লিখেছেন,

দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দের ভাষাবৈশিষ্ট্য

"তার পরে ভাষা। যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কত্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন যাচ্ছি, কচ্ছিলাম, ইত্যাদি। অন্য পদ নির্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জন করিনি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা এই যে, যেখানে বাঙ্গলা শব্দ বা বচন আসল বাঙ্গালা ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গলা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে, সেখানে সেই বাঙ্গালা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্তব্য। তাতেই বাঙ্গালা কবিতা হবে। ইংরাজি বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ করে লিখলে সে ইংরেজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা হবে না। "গুঁতোর চোটে বাবা বলায়" কি "ভাতে মেরোনা" এই রকম জোরের বচন কেহ ইংরেজিতে কি সংস্কৃততে অনুবাদ করুন দেখি।

[আলেখ্য ঃ ভূমিকা ঃ ঐ ঃ পৃ ৪০৬]

স্বাভাবিক ও প্রচলিত বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা বচন ব্যবহারের অত্যধিক প্রবণতায় মাঝে মাঝে কবি ছন্দের এবং ভাবের 'সুশ্রাব্যতা ও মর্যাদা' কিছু ক্ষুণ্ণ না করেছেন এমন নয় (মন্দ্র ঃ সমুদ্রের প্রতি দ্র.)। তবু চলতি ভাষার হসন্তপ্রাণ ধ্বনি-সৌন্দর্য পরিস্ফুটনে এবং স্বাভাবিক বাক্‌ধর্মী প্রকাশভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধনে তাঁর এই বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ভাবপ্রকাশ ও ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টিতে বাংলা ভাষার বিপুল সম্ভাবনাময় অন্তশক্তি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন।

সংস্কৃতছন্দ ব্যবহার

সংস্কৃত উচ্চারণের ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল যথাক্রমে কৌতুক কবিতায় এবং সংগীতে অল্পস্বল্প ব্যবহার করেছেন। যেমন—

— — — ◡ ◡ — —◡ ◡— — ◡ ◡— ◡—

(১) অনুষ্টুভ ব্যারি ষ্টা র উ কী লাদি ম হা য জ্ঞ স মা ধিলা।

— ◡ — — ◡ —◡ ◡ — — ◡ ◡ ◡— ◡—

ভা র তে ভা ল্লি অ স্তু ত আ শ্চ র্য ম হতী স ভা।।

আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।

মাদ্রাজি উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে।।[১৪]

[আষাঢ়ে ঃ কলিযজ্ঞ ঃ ঐ ঃ পৃ ২৫২]

— — — ◡ ◡ — — ◡ — —

(২) পজ্‌ঝটিকা ঃ জানোনাকি ক দা চ ন মূ ঢ়

— ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ — —

ক র্ণ বি ম র্দ ন ম র্ম কি গূ ঢ়?

কর্ণ দিবার কি কাবণ অন্য,

যদি না তা আকর্ষণ জন্য?[১৫]

[কর্ণবিমর্দনকাহিনী ঃ আষাঢ়ে ঃ ঐ পৃ ২৫৪]

কৌতুক-কবিতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই কৃত্রিম উচ্চারণের ছন্দ কিছু বেমানান হয়নি। তবে গভীর ভাবের কোনও কবিতায় যে এ ছন্দ চলবেনা বাকধর্মী দলমাত্রিক ছন্দের উদ্গাতা নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করেছিলেন; আর সে কারণেই এই কৃত্রিম ছন্দ তিনি সেরূপ কোনও কবিতায় আদৌ ব্যবহাব করেননি। একাধিক গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত উচ্চাবণেব ছন্দ ব্যবহাব কবেছেন। যেমন—

◡ ◡ — — ◡ ◡ — —

প তিতোদ্ধাবি ণী গ ঙ্গে!

— ◡◡◡ ◡ ◡◡ ◡◡ — — ◡ ◡ — ◡◡ ◡ — ◡ — —

শ্যা ম বি ট পি ঘ ন ত ট বি প্লা বি নী ধ স ব ত ব ঙ্গ - ভ ঙ্গে।

[গান ঃ দ্বি গ্র প ৬১৮]

১৪। পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ। গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীযাৎ শেষেস্বনিযমো মতঃ।।

[ছন্দোমঞ্জরী : ২৫৮ শ্লোক]

অনুষ্টুভে সর্বত্র পঞ্চম বর্ণ লঘু, দ্বিতীয ও চতুর্থ পাদের সপ্তমবর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠবর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণে বিশেষ কোনও নিয়ম নেই।

১৫। প্রতিপদযমকিতষোড়শমাত্রা নবমগুরুত্ববিভূষিতগাত্রা।

'পজ্‌ঝটিকা' পুনরত্র বিবেকঃ ক্বাপি ন মধ্যগুরুর্গণ একঃ।। [ছন্দোমঞ্জরী : ২৬১ শ্লোক]

প্রতিপাদে যদি যুগ্মবর্ণে যতি ও ষোড়শমাত্রা থাকে এবং নবম মাত্রা গুরু হয়, ত ব তাহা 'পজ্ঝটিকা'। এ.তে মধ্যগুরু গণ থাকবে না।

নাট্যসংলাপে ব্যবহৃত প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দ

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দিকে রচিত তিনটি পৌরাণিক, (পাষাণী ১৯০০, সীতা ১৯০৮ এবং ভীষ্ম ১৯১০)১৬ একটি ঐতিহাসিক (তারাবাই) এবং একটি অপেরা শ্রেণীর (সোরাব রুস্তম) নাটকে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার জাতীয় মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ভাবোচ্ছ্বাসধর্মী গদ্যরীতির চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। কারণস্বরূপ নাট্যকার বলেছিলেন,

দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্য

"প্রথম Shakespeare এর অনুকরণে Blank verse লিখিতে আরম্ভ করি। তারাবাই প্রকাশ হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এককপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনের কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespeare এর অমিত্রাক্ষর Milton এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক।...Shakespeareএ খানিক গদ্য, খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরেজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাংলাতে, "যদি তুমি আস সখি, আমি সেখা যাবো" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই চলে। গদ্যের সে অবস্থা আসিয়াছে।"

[আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭ : পুনরুদ্ধার : দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার : রথীন্দ্রনাথ রায়। পৃ ৩৫১]

নাটকে পদ্যবন্ধ ব্যবহার না করায় প্রকৃত কারণ

দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তি কিন্তু সমর্থনীয় নয়। ইতিমধ্যেই গিরিশচন্দ্র নাট্যসংলাপের উপযোগী মুক্তক ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার ছন্দে লিখিত কয়েকটি নাটকও (রাজা ও রাণী, মালিনী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আসল কথা হল, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবোচ্ছ্বাসকে যত বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ

১৬। 'ভীষ্ম' রচিত হয়েছিল অনেক আগে কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পর।

করতে চেয়েছেন, মিশ্রবৃত্তের প্রবহমান পয়ারবন্ধে তাতে অসাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তাছাড়া, এযুগের নাটকে ছন্দোবদ্ধ সংলাপ বহুলাংশে কৃত্রিম বলেই গণ্য হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে শেকস্‌পীয়র-মার্লোর ছন্দোবদ্ধ-নাট্যসংলাপ পরবর্তী যুগে বাক্‌ধর্মী বিশুদ্ধ গদ্যসংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্র ছন্দোবদ্ধ সংলাপ বহুলভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু বিংশ শতকে এসে সে প্রচেষ্টা ক্রমানুয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র নিজেই পরিণত জীবনে ছন্দোবদ্ধ-সংলাপের পরিবর্তে গদ্যসংলাপ বেশী ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বিংশ শতকের নাটকগুলিতে ছন্দোবদ্ধ-সংলাপ পরিত্যাগ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং এই যুগের অন্যান্য নাট্যকারেরাও একই পথ অনুসরণ করেছেন। বাংলা নাটকে সাময়িকভাবে শেকস্‌পীরীয় আদর্শে যে ছন্দোবদ্ধ নাট্যসংলাপ প্রবর্তিত হয়েছিল, বিংশ শতকে পৌঁছে সে প্রভাব থেকে আবার মুক্তি ঘটেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসে, গদ্যভাষা নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক একথা উপলব্ধি করেও বিংশ শতকে লিখিত 'সীতা' (১৯০৯ প্রকাশ, ১৯০১-২ রচনা) নাটকের সংলাপে লেখক সমিল প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার ব্যবহার করলেন কেন? গ্রন্থটিকে কবি-নাট্যকার বিশুদ্ধ নাটক না বলে নাট্যকাব্য বলেছেন। তাতে মনে হয়, শেষ জীবনে কাব্যলক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিয়ে নাটক ও গানে আত্মসমর্পণ করলেও ছন্দের প্রভাবকে কবি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বিশুদ্ধ গদ্যসংলাপী নাটক রচনা না করে তাই এখানে ছন্দোবদ্ধ নাট্যকাব্য রচনায় আগ্রহী হয়েছেন।

বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবন বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, তাঁর কবি-স্বভাবের উপর গীতি ও নাট্য প্রবণতার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। তাঁর প্রথম রচনার (আর্যগাথা ১ম ভাগ) সূত্রপাত গান দিয়ে। আর্যগাথা ২য় ভাগের গীতি কবিতাগুলি দেশী-বিদেশী সুরের দ্বারা প্রভাবিত। আষাঢ়ে, হাসির গানেও সুরের প্রভাবে কাব্যছন্দ বার বার শিথিল হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নাট্যধর্মী সংলাপের প্রভাবও তার কাব্যছন্দের পরিমিত যতিভাগকে বার বার বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী—সর্বত্রই তার সাক্ষ্য মিলবে। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে মৌলিক সুরস্রষ্টা ছিলেন, বাংলা নাটকেও তিনি একটি নতুন ধারার প্রবর্তক। সুরের সম্মোহন জাল এবং নাটকের উপযোগী চলিত ভাষার স্বাভাবিক বাক্‌ধর্ম দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ছন্দ-কাঠামোকে সর্বাংশে পূর্ণতা লাভ করতে দেয়নি। সেই কারণেই আর্যগাথা ২য় ভাগ ('পিউ' অংশ), আষাঢ়ে এবং হাসির গানে শিথিল মিশ্র-উচ্চারণরীতির ছন্দ প্রাধান্য পেয়েছে। বিদেশী ছন্দের আদর্শে

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি স্বভাবের সঙ্গে গীতি ও নাট্য স্বভাবের বিরোধ

দলমাত্রিক বলিষ্ঠ উচ্চারণভঙ্গির ছন্দ নিয়ে তিনি মৌলিকভাবে পরীক্ষা করেছেন। আংশিকভাবে সিদ্ধিলাভও করেছেন। অবশ্য তাঁর ছন্দের সাবলীলতা বিদেশী ভাষাভঙ্গির একঘেয়ে অনুকরণে (mannerism) কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেকথা স্বীকার করতে হয়। নতুন কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ ফললাভের পূর্বেই কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সংগীত ও নাটকের রাজ্যে আত্মনিমজ্জন করেছেন। দলমাত্রিক ছন্দের গাম্ভীর্যময় আশ্চর্য প্রকাশশক্তির পরিচয় তাঁর আলেখ্য কাব্যেই রয়েছে। ত্রিবেণীর 'দলপলা' কবিতাগুলিতে এ ছন্দের প্রবহমান রীতির সার্থক পারিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কবি নিজেই সিদ্ধি করায়ত্ত হবার মুখে কাব্য রচনাই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজের ভার পরবর্তীরাও কেউ গ্রহণ করেননি। লৌকিক 'ছড়ার ছন্দ' থেকে উদ্ভূত পর্বস্পন্দনময় সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিরাও সেই রীতিরই অনুসরণ করেছেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ এই বিশুদ্ধ দীর্ঘপদভাগের দলবৃত্ত ছন্দ আজও পর্যন্ত অবহেলিত রয়েছে।

॥ গ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত এ যুগের উল্লেখযোগ্য সমস্ত কবিই কমবেশী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যেও সবচেয়ে কম প্রভাব পড়েছে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫২) এবং সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) উপর। বিজয়চন্দ্র উনবিংশ শতকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। তবে তাঁর প্রখ্যাত তিনটি কাব্যগ্রন্থ, ফুলশর (১৯০১), যজ্ঞভস্ম (১৯০৪), এবং হেঁয়ালি (১৯১৫) বিংশ শতকেই প্রকাশিত হয়েছে।[১৭] কবি তৎকালীন প্রচলিত বাংলা কবিতার সবরকম ছন্দরীতি সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার (সমিল), যতিপ্রান্তিক মহাপয়ার ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত রীতিতে বহুল যুক্তবর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতির আদর্শে বাংলাছন্দে যুক্তদলের কৃত্রিম দীর্ঘ উচ্চারণের পরীক্ষা করেছেন। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের আদর্শে দলমাত্রিক রীতির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ আনবার চেষ্টা করেছেন।

এই যুগের অপর কবিগণ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৭। ফুলশরের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৮৯৫-১৯০০, যজ্ঞভস্মের কবিতাগুলির প্রকাশ কাল ১৮৯৯-১৯০৩, হেঁয়ালিতে মুখ্যত কবি উক্ত দুটিগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতাই পুনর্বার সংকলিত করেছেন।

কবির প্রবহমান (সমিল) পয়ার বা যতিপ্রান্তিক মহাপয়ার ব্যবহারে নির্ভুল প্রয়োগরীতির পরিচয় থাকলেও, নূতনত্বের পরিচয় নেই। কলাবৃত্ত ছন্দে অতিপর্বিক দোলা এবং অনুপ্রাসবহুল যুক্তবর্ণ প্রয়োগে কবির ছন্দকুশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

ঐ সানুর সোপান মালার উর্দ্ধে
শৃঙ্গ চরণ রঞ্জিকা
শোভে অভ্রসুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা।
তথা অর্ধধূসর ভূধরখণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে,
যেন নন্দীর মত রুদ্র প্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে।

[হেঁয়ালি : হিমাচলে : পৃ ১৭]

কবিতাটিতে নানা দিক থেকে কবি ছন্দের অলঙ্করণে সাজিয়েছেন। অতিপর্বের দোলা প্রত্যেক পংক্তির প্রথমে এসেছে, যুক্তবর্ণবহুল রুদ্ধদল প্রয়োগে প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব তরঙ্গায়িত করেছেন। ছয়মাত্রার পর্বে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনমাত্রার গতিচঞ্চল দুটি করে শব্দ প্রয়োগে ছন্দকে এক নতুন গতি বেগ দিয়েছেন। পংক্তিশেষে চারমাত্রার পর্বে সেই গতিকে স্তিমিত করেছেন, সেখানেও ত্রিদল শব্দে প্রথম দুটি রুদ্ধ, বাকী দুটি মুক্ত রেখে সেই সঙ্গে ললিত মিল (feminine rhyme : অর্থাৎ, পংক্তি প্রান্তিক শব্দ মিলে তিনটি স্বরধ্বনির এবং প্রান্তস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির মিল, যেমন রঞ্জিকা-অম্বিকা, গৌরবে-রৌরবে) দিয়ে ধ্বনির আবর্তন-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। সম্ভবত এতগুলি শ্রুতি-মনোহারী অলঙ্করণ লক্ষ্য করেই কবি-সমালোচক কালিদাস রায় আলোচ্য কবিতাটিকে 'ছন্দহিল্লোলে'র একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করেছেন (দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গ : ২য় সং : পৃ ৭৮)।

বাংলা কবিতায় সচেতনভাবে সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই চলেছে। সংগীতে কিছুটা সফল হলেও, আধুনিক যুগের কবিতায় এমন কৃত্রিম উচ্চারণ সফল হওয়া সম্ভবপর নয়,—সে সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিজয়চন্দ্র তার যজ্ঞভস্ম এবং হেঁয়ালি কাব্যগ্রন্থে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দরীতি এবং আংশিক স্বাধীন হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের ছন্দরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। মুক্তদলের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-সমন্বিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ ব্যবহারে

তিনি আদৌ সফল হয়েছেন বলা চলে না। যেমন তোটক ছন্দোবন্ধে লিখেছেন,—

⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑–
গ গ নে গু রু গ র্জ ন কে ন ক র?
অতি ভৈরব মূরতি কেন ধর?
তব ঘূর্ণিত রক্তিম চক্ষু দিয়া
অনলের কণা পড়িছে খসিয়া।[১৮] [গজভস্ম : পৃ ৬৮]

অনুরূপ 'বসন্ততিলক', 'মন্দাক্রান্তা' প্রভৃতি ছন্দও ব্যবহার করেছেন। বসন্ততিলকের উদাহরণে কবি ভারতচন্দ্রের কৌশল অবলম্বন করেছেন। কবিতাটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পাঠ না করে একটি আধুনিক মিশ্রবৃত্ত পয়ার হিসাবে পড়া যেতে পারে। যেমন—

– – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏑ – –
মেঘে ডুবে ঝ রি পড়ে ত ব রশ্মি মালা,
দীপ্ত প্রভা পরশিয়ে তম যায় দূরে;
সংজ্ঞা স্ফুটে নরগৃহে হরষে প্রভাতে,
গীতিস্বরে বিহগিনী বনরাজি পূরে।[১৯]

[গজভস্ম : সূর্যপূজা : পৃ ৬৩]

এ কবিতায় সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ এবং মিশ্রবৃত্ত বাংলা উচ্চারণ, -উভয় পাঠক্রম রাখবার ফলে অনুমান করা চলে যে কৃত্রিম উচ্চারণে পাঠকের মন তৃপ্ত না হতে পারে এমন সংশয় কবির মনেও ছিল।

হেঁয়ালি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় 'ফুলেশ্বরে'র নির্বাচিত কবিতাগুলি কবি 'লঘু-গুরু' উচ্চারণে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর একটি উদাহরণ তুলছি।

⏑⏑–⏑–⏑⏑⏑ ⏑––
ত ম প ক পু ষ্প র চি ত কান্তি
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – –
নি শী থ কু সু ম চাপে

১৮। বদ 'তোটক' মব্ধিসকারযুতম্ [ছন্দোমঞ্জরী : ৭০ সংখ্যক সূত্র]
যে ছন্দে ক্রমশ চারটি স গণ (⏑ ⏑ –) হয়, তাকে 'তোটক' বলে।

১৯। জ্ঞেয়ং 'বসন্ততিলকং' তভজা জগৌ গঃ [ছন্দোমঞ্জরী : ১১২ সংখ্যক সূত্র]
যে ছন্দের প্রতিপাদে ক্রমশঃ একটি ত (– – ⏑), একটি ভ (–⏑⏑), দুইটি জ (⏑–⏑) এবং দুইটি গ (––) গণ থাকে তাকে 'বসন্ততিলক' বলে জানবে।

সিত ইন্দু কিরণ রঞ্জিত তনু
অতনু তরিল তাপে।
তুমি স্নিগ্ধমন্দ মধুর গন্ধি
মলয় পবন সেবিত,
তবু কান্ত পরশ লভি, পরবশ
অন্তর পরিদেবিত। [হেঁয়ালি : ফুলশর : পৃ ১০৯]

এখানে কবি সংস্কৃত বৃত্তছন্দের মতো রুদ্ধমুক্ত দলবিন্যাসের সুনির্দিষ্টতা রক্ষা করেননি। সমগ্র পংক্তিতে দলসংখ্যা সমান নয়, (২) ৬৷।৬৷।৬৷।৪ I—পর্ব-পদভাগে পংক্তি বিন্যাস করেছেন,—আর মুক্তদলের দীর্ঘ (গুরু) উচ্চারণ কেবলমাত্র প্রতি পংক্তির সর্বশেষ শব্দের মাত্রা-বিনাসে রেখেছেন।—তার ফলে পূর্ববর্তী বিশুদ্ধ উচ্চারণের সংস্কৃত ছন্দের তুলনায় এই উচ্চারণরীতি অনেকটা সফল হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ (দ্র. দেশ দেশ নন্দিত করি) ও দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্র. গতিতোজ্জারিনি গঙ্গে)—সংগীতে আংশিক সংস্কৃত উচ্চারণরীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথও সংগীতে অনুরূপ উচ্চারণ এনেছেন। কাব্যে এ-ছন্দ সর্বপ্রথম সচেতনভাবে বিজয়চন্দ্র ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন। দিলীপকুমার রায় পরবর্তী কালে এই রীতির প্রধানতম সমর্থক হয়েছিলেন। আরও একাধিক আধুনিক কবি এই উচ্চারণরীতির পরীক্ষা করেছেন। বাংলা ছন্দের আধুনিক উচ্চারণভিত্তিক প্রধান রীতিগুলির পাশে পুরানো সংস্কৃত উচ্চারণরীতির ছন্দকে ফিরিয়ে আনবার নানা প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রত্যেক যুগেই লক্ষিত হয়েছে। এ-যুগে সে প্রচেষ্টা আরও তীব্র হয়েছিল, আংশিকভাবে সফলও হয়েছিল ;- পরবর্তী সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দে তার নিদর্শন মিলবে। বিজয়চন্দ্র এই ধারারই অন্যতম পথিক ছিলেন বলা চলে।

বাংলা কবিতা-গানে সংস্কৃত উচ্চারণের ছন্দ ব্যবহারে সফলতা

বিজয়চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। হেঁয়ালির অন্তর্ভুক্ত 'দ্বিদেশীস্মৃতি' কবিতাগুচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির প্রতি ভক্তমনের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এই অংশের অধিকাংশ কবিতায় সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দলমাত্রক পদযতিপ্রধান ছন্দ (সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনারীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে) ব্যবহার করেছেন। এখানে দীর্ঘ ত্রিপদী (৮৷।৮৷।১১ I) এবং মহাপয়ারের (৮৷।১০ I) দুটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। -

বিজয়চন্দ্রের কাব্যে সাশ্লিষ্ট দলমাত্রক রীতির ব্যবহার

(১) একলা বসে থাকি পাড়ে ; সাঁঝের পরে ক্লান্তি আসে ;
জলের তলে জ্বলে তারার দেয়ালি ।
শূন্য পথে এসে, আমার মৌন প্রাণের উপর ভাসে
জন্ম এবং মৃত্যুতত্ত্বের হেঁয়ালি ।

[হেঁয়ালি : অমানিশায় : পৃ ৩]

(২) এই জীবনের উষাকালে, সাঁঝের বেলা, মায়ের কোলে শুয়ে,
দেখেছিলাম প্রথম তোমায় এমনি করে' আসতে নেমে ভুঁয়ে ।
... ...
কুজ্ঝটিকায় ঢাকা তোমার অঙ্গ থেকে আলো আসুক ধেয়ে,
সন্ধ্যা ভুলে আঁধার ভুলে, 'থাকি তোমার হাসির পানে চেয়ে ।
ভোরের পাখির মত আমি গীতিস্বরে ভ'রে বিশ্বখানি,
সুপ্ত আঁখির তলায় তলায় জাগিয়ে তুলি জাগরণের বাণী ।

[হেঁয়ালি : এস তুমি : পৃ ৯]

এ ছন্দে সংহত উচ্চারণ-গাম্ভীর্য এবং দীর্ঘ পদযতির দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য কাব্যে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক ছন্দের মতো অতটা সংহত হতে পারেনি। তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল যে রীতিতে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন, বিজয়চন্দ্র সে রীতি অবলম্বন করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো, ছড়ার ছন্দকেই যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন ;—তার ফলে পদযতি প্রাধান্য পেলেও পর্বযতির স্পন্দন সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ আলোচনার পূর্বে এ-যুগের আর একজন কবির নামোল্লেখ করতে হয়,—তিনি হলেন হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী। ১৯০৩-এ সংস্কৃত ছন্দে তিনি 'দশানন বধ কাব্য' রচনা করে প্রকৃত পক্ষে সতেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ছন্দ রচনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কবি

সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ কৃত্রিম

নিজে কাব্যগ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তাঁর নবপ্রবর্তিত ছন্দ সম্পর্কে যা লিখেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"বঙ্গ ভাষায় এ পর্যন্ত যে প্রণালীতে কবিতা রচিত হইতেছে আমি সে প্রণালী অবলম্বন না করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইতে অনেকেই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই প্রকৃতরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ; আমিও যে কৃতকার্য হইয়াছি এরূপ কথা বলি না ; তবে ছন্দগুলি আমি এরূপভাবে

গ্রথিত করিয়াছি যে বালক বৃদ্ধ যুবা যে কেহই হউন পাঠ করিতে পারিলেই ছন্দঃ সমূহ অনায়াসে অনর্গল নির্গত হইবে, হ্রস্ব দীর্ঘাদি উচ্চারণ করিবার জন্য কোনও ক্লেশই করিতে হইবে না। বঙ্গভাষায় দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যবহার না থাকায় দীর্ঘস্বরগুলি টানিয়া পাঠ করিতে হয় যথা "দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে" "রে সতি রে সতি কাঁদিল পশুপতি" ইত্যাদিতে 'ভা' 'তো' 'রে' 'কাঁ' ইত্যাদি শব্দ টানিয়া পাঠ কয়িতে হয় নচেৎ ছন্দ রক্ষা হয় না ; এবং এই জন্যই বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত সংস্কৃত ছন্দ লিখিয়া কেহ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি দীর্ঘ উচ্চারণ স্থানে কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরের পূর্ব অক্ষর গুরু হয় এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ উচ্চারণ রক্ষা করিয়াছি।......এইরূপ নিয়মে আমি সমস্ত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি, তবে কুচিৎ কোন স্থানে ব্যক্তিগণের নাম ব্যবহার অন্য উপায় না পাইয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইয়াছে যথা 'ভরদ্বাজ' 'কৈকেয়ী' এসবস্থলে ছন্দের গতি অনুসারে পাঠকগণ পাঠ করিবেন।"

কবির মন্তব্য

[দশাননবধ কাব্যের ভূমিকা ঃ পৃ ৵০-৶০]

কলাবৃত্ত রীতিতে মুক্তদলের লঘু এককলা এবং রুদ্ধ দলের গুরু দুইকলা উচ্চারণকে রক্ষা করে হরগোবিন্দ উনবিংশ শতকের শেষ দশকেই সংস্কৃত ছন্দের সুনির্দিষ্ট গণবিন্যাসে বাংলা পদ্য রচনার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক। দশাননবধ কাব্যে কবি স্বরচিত এবং মূল সংস্কৃত ৫৭টি ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত 'উপেন্দ্রবজ্রা' ছন্দের একটি উদাহরণ তুলছি।---

উপেন্দ্রবজ্রা ঃ ⌣ - ⌣— ⌣⌣- ⌣— [জ ত জ গ গ]

⌣ — ⌣ —⌣⌣—⌣—

ত্রু ক্ষা র্ত্ত স ম্প্রা প্ত সু গ ন্ধি খ ন্ডে

সমীক্ষি সম্পূজ্য পদাব্জ রত্নে।

প্রশান্ত মৎ-চিত্ত সহর্ষ অদ্য,

সুধন্য সম্যক চতুরাস্য সদ্যঃ ॥

কিন্তু এ ছন্দেও কবি উচ্চারণের কৃত্রিমতা সর্বাংশে পরিহার করতে পারেননি। বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরুদ্ধে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন,—

"...অকারান্ত শব্দগুলি স্পষ্টরূপে অকারান্ত উচ্চারণ করিতে হইবে। বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যথা

'ভবন', 'গিরিশ', 'বিষয়' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ 'ভবন্', 'গিরিশ্', 'বিষয়্'—এইরূপ উচ্চারিত হয়। বাস্তবিক অকারান্ত শব্দগুলি অনর্থক ব্যঞ্জনান্ত করিয়া উচ্চারণ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

[দশাননবধকাব্য ঃ ভূমিকা ঃ পৃ ।০]

হরগোবিন্দ প্রবর্তিত ছন্দ উচ্চারণের দিক থেকে সফল না হবার প্রধান কয়েকটি কারণ হল ঃ (১) রুদ্ধদল ব্যবহারে লেখক কেবলমাত্র যুক্তবর্ণ ব্যবহার করতে চেয়েছেন ; তারফলে, অপ্রচলিত দুরূহ তৎসম শব্দ অত্যধিক সংখ্যায় (মধুসূদনের তুলনায় বহুগুণে বেশী) ব্যবহৃত হয়েছে। (২) সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের সুনির্দিষ্ট লঘুগুরু দলবিন্যাস করতে গিয়ে ভাবযতি ও ছন্দযতির সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি। (৩) বহু শব্দকে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী অ-কারান্ত রূপে উচ্চারণ করেছেন ; স্বাভাবিক উচ্চারণের রুদ্ধ-মুক্ত দলে লঘু-গুরু উচ্চারণ-বিন্যাসে তাঁর এত যত্ন সত্বেও এই তিনটি প্রধান ত্রুটির জন্য ছন্দ কৃত্রিম রয়ে গেছে। তবে এ কথা স্বীকার করতে হয়, বাংলা ছন্দে সংস্কৃত গুরু-লঘু সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ যে রুদ্ধ-মুক্ত দলের সাহায্যে আনা সম্ভবপর, কৃত্রিম গুরুস্বর উচ্চারণের যে প্রয়োজন থাকে না, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি পরবর্তীদের বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ছন্দে বাংলা পদ্য রচনার পথ সুগম করে দিয়েছেন। বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ-পরীক্ষায় তাঁর এই মূল্যবান সংযোজনটুকুর মূল্য অনস্বীকার্য।

॥ ঘ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

এই যুগের ছন্দ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন। মাত্র চল্লিশ বৎসরের স্বল্পায়ু জীবনে ষোলখানি কাব্যগ্রন্থের (চারখানি মৃত্যুর পর প্রকাশিত) মাধ্যমে তিনি বাংলা ছন্দে অলঙ্করণ-বৈচিত্র্যের বিপুল পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার কাব্যরসিক-সমাজ তাঁকে 'ছন্দ যাদুকর' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হল, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষা-ছন্দের আভাষ, বাংলা উচ্চারণরীতি অবিকৃত রেখেও, আংশিকভাবে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশ কাল নিম্নরূপ ঃ সবিতা ঃ ১৯০০, সন্ধিক্ষণ ঃ ১৯০৫, বেণু ও বীণা ঃ ১৯০৬, হোমশিখা ঃ ১৯০৭, তীর্থসলিল ঃ ১৯০৮, তীর্থরেণু ঃ ১৯১০, ফুলের ফসল ঃ ১৯১১, কুহু ও কেকা ঃ ১৯১২, তুলির লিখন ঃ ১৯১৪, মণি মঞ্জুষা ঃ ১৯১৫, অভ্র-আবীর ঃ ১৯১৬, হসন্তিকা ঃ ১৯১৭, বেলাশেষের গান ঃ ১৯২৩, বিদায় আরতি ঃ

রচিত কাব্যগ্রন্থ

১৯২৪, কাব্যসঞ্চয়ন ঃ ১৯৩০, সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা ঃ ১৯৪৫।

ভারতচন্দ্র বা হেমচন্দ্র সংস্কৃতের আদর্শে কৃত্রিম হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণরীতি বাংলায় চালাবার যে চেষ্টা করেছিলেন, সর্বপ্রথম হরগোবিন্দ সেই রীতির দুর্বলতা উপলব্ধি করে কেবলমাত্র রুদ্ধদলকে দুই কলার এবং মুক্তদলকে এক কলার মর্যাদা দিয়ে, সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘ দলবিন্যাসে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তিনি লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বেশী মাত্রায় ব্যবহার করেছেন; অনেক সময়ই ছন্দযতি এবং ভাবযতির ন্যূনতম সামঞ্জস্যবোধ অস্বীকার করেছেন এবং বাংলা বহু শব্দের শেষে রুদ্ধদলকে কৃত্রিম স্বরান্ত উচ্চারণে যুক্ত দ্বিদলরূপে ব্যবহার করেছেন। ছন্দের স্বাভাবিকতা তাতে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ হরগোবিন্দের ন্যায়, বাংলা শব্দে সংস্কৃত গুরু মুক্তদলের উচ্চারণ কৃত্রিম বিবেচনায় তুলে দিলেন এবং রুদ্ধ-মুক্ত দলের সাহায্যে সংস্কৃত 'গুরু-লঘু' সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের উচ্চারণ পরিস্ফুট করলেন। সেই সঙ্গে হরগোবিন্দের ছন্দের দুর্বলতাগুলি ও যথাসম্ভব পরিহার করলেন। তিনি (১) রুদ্ধদল ব্যবহারে সংস্কৃত অপ্রচলিত শব্দের সাহায্য তেমন না নিয়ে, প্রয়োজন মতো রুদ্ধদলবহুল দেশজ এবং বিদেশী শব্দ এনে ভাষা ও ছন্দে সজীবতা দান করলেন; সাধু ভাষার পরিবর্তে রুদ্ধদলবহুল চলিত ভাষাও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। (২) ছন্দের এবং ভাবের যতিবিন্যাসে যথাসম্ভব বিরোধ ঘটতে দিলেন না, এবং (৩) বাংলা রুদ্ধদলান্তিক শব্দকে সংস্কৃত উচ্চারণে কৃত্রিম স্বরান্ত রূপে ব্যবহারের চেষ্টা করলেন না। এই কারণেই তাঁর ছন্দ অনেকাংশে স্বাভাবিক এবং যথাযোগ্য ভাবানুগ ও গতি-সম্পন্ন হতে পেরেছে। কৃত্রিম উচ্চারণ যথাসম্ভব পরিহার করলেও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের পূর্ণ আমেজ আনতে পারেন নি। তার প্রধানতম কারণ হল, প্রথমত বাংলায় মুক্তদলের গুরু উচ্চারণ নেই;—গুরু স্বরধ্বনির সেই বিশ্লিষ্ট সুরধর্মী উচ্চারণভঙ্গি বাংলা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত তিনি বাংলায় কলাবৃত্তে বা প্রসারিত উচ্চারণের দলবৃত্তে সংস্কৃত ছন্দের বাপাদশ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বাংলার এই দুই ছন্দরীতিতে দীর্ঘ পদযতি উচ্চারণের সময় স্বভাবতই পর্বের লঘু যতিভাগে ভেঙে যায়। সংস্কৃতের তরঙ্গায়িত দীর্ঘ যতি-ভাগের উচ্চারণভঙ্গি তাতে পরিস্ফুট হতে পারে না। প্রধানতম এই দুটি অসুবিধার জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা অনেকাংশে আনলেও সংস্কৃত ছন্দের 'কল্লোলিত' উচ্চরণভঙ্গি ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। সম্ভবত

সত্যেন্দ্রনাথ রচিত সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য

এই বাধা কোনও কবির পক্ষেই সর্বাংশে অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। এই একই কারণে ইংরেজি, চীনা, জাপানী বা পার্শী ছন্দ প্রয়োগেও কবি সেই ছন্দগুলির বিশিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় ঠিক মতো পরিস্ফুট করতে পারেননি। অংশত কৃতকার্য হয়েছেন মাত্র। তবে অন্যান্য কবির তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এখানেই, তিনি সংস্কৃত বা অন্যান্য বহিরাগত ছন্দের বাংলা রূপায়ণে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, হরগোবিন্দ প্রভৃতি পূর্ববর্তী কোনও কবিই এ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না।

উদাহরণ

এবারে কবি রচিত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।২০—

(১) পঞ্চচামর ছন্দ ঃ

◡— ◡— ◡— ◡—
মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
◡— ◡— ◡— ◡—
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল,
মহেশ্বরের প্রলয় পিণাক
শোনাও আমায়, শোনাও কেবল।

[অভ্র আবীর ঃ সিন্ধু তাণ্ডব]

(২) মন্দাক্রান্তা ঃ

— — — — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ — — ◡ — — ◡ — —
পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভ তল | কই গো কই মেঘ উদয় হও, |
সন্ধ্যার তন্দ্রার | মূরতি ধরি আজ | মন্দ্র মন্থর বচন কও ; |

[কুহু ও কেকা ঃ যক্ষের নিবেদন]

২০। মূলসূত্রসহ সংস্কৃত পদ্যের অনুরূপ দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা হল। তাতে উভয় দৃষ্টান্তের উচ্চারণগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য সহজে ধরা পড়বে আশা করা যায়।—

(১) প্রমাণিকা পদদ্বয়ং বদন্তি 'পঞ্চচামরম্' [ছন্দোমঞ্জরী ১৫১ সূত্র]
যাহার প্রতিপাদ প্রমাণিকা ছন্দের [প্রমাণিকার প্রতিপাদ যথাক্রমে জ (◡—◡), র (—◡—), ল (◡), গ (—) গণে রচিত] দুই পাদে গঠিত হয় তাকে 'পঞ্চচামর' ছন্দ বলে। যেমন—

◡—◡—◡—◡— —◡—◡—◡—◡—
সু র দ্রু মূ ল ম ণ্ড পে বি চি ত্র র ত্ন নি র্মি তে
লসদ্বিতানভূষিতে সলীলবিভ্রমালসম্।
সুরাঙ্গনাভবল্লবীকরপ্রপঞ্চচামর—
স্ফুরৎসমীরবীজিতং সদাচ্যুতং ভজামি তম্॥

[ছন্দোমঞ্জরী ১৫১ শ্লোক ঃ উদাহরণ পৃ ১০৩ দ্র]

(৩) মালিনী ঃ

⌣⌣ ⌣⌣ ⌣⌣ — —
উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্ ।
— ⌣ — — ⌣ — —
শূন্য ময় স্বর্ণ পিঞ্জর ; I
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, ।
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর। I [কুহু ও কেকা ঃ রিক্তা]

(৪) রুচিরা ঃ

⌣ — ⌣ — ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ — ⌣ ⌣
তখন কেবল । ভরিছে গগন । নূতন মেঘে, I
কদম কোরক । দুলিছে বাদল । বাতাস লেগে ; I

[কুহু ও কেকা ঃ তখন ও এখন]

---

(২) 'মন্দাক্রান্তা'ম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ যগ্যুগ্মম (ছন্দোমঞ্জরী ১৬৪ সূত্র)
যাহার পদগুলি ক্রমশঃ ম (— — —), ভ (— ⌣ ⌣), ন (⌣ ⌣ ⌣) গ ( ) গ (—), য (⌣ — —), য (⌣ — —) গণে গঠিত হয় এবং প্রথমত চতুর্থাক্ষরের পরে ষষ্ঠাক্ষরে তদনন্তর সপ্তমাক্ষরে যতি থাকে তাকে মন্দাক্রান্তা বলে। যেমন -

— — — — ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — — ⌣ — — ⌣ — —
প ত্যাসন্নে I ন ভ সি দ য়ি তা I ল ঙ্ঘি তা স্ত্র ম না গী I
জীবনে I স্ব ন শ ল ম যীং I হ্যা যিবন প্রার্থম I [পুরাণেন ৬ শ্লোক]

(৩) ননমযযযুতেয়ং 'মালিনী' ভোগিলোকৈঃ। (ছন্দোমঞ্জরী ১৩৪ সূত্র) প্রতি পাদে যথাক্রমে ন (⌣ ⌣ ⌣) ন (⌣ ⌣ ⌣) ম (— — —) য (⌣ — —), য (⌣ — —) গণ থাকবে এবং যথাক্রমে অষ্টমাক্ষরে এবং সপ্তমাক্ষরে যতি পড়লে 'মালিনী' ছন্দ হয়। যেমন

⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — — — ⌣ — — —
মৃ গ ম দ কৃ ত চর্চা I পী ত কৌ ষেয় বা সা I
রুচিরশিখিশিখণ্ডা I বদ্ধধম্মিল্লপাশা I [ছন্দোমঞ্জরী পৃ ৮৩]

(৪) জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ। [ছন্দোমঞ্জরী ৯৬ সূত্র]

যে ছন্দে প্রতিপাদে ক্রমশঃ জ (⌣ — ⌣), ভ (— ⌣ ⌣), স (⌣ ⌣ —), জ (⌣ — ⌣), গ (—) গণ থাকে এবং যথাক্রমে চতুর্থ ও নবম অক্ষরে যতি পড়ে তাকে রুচিরা ছন্দ বলে। যেমন—

⌣ — ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ — ⌣ — ⌣ — — ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ — ⌣ —
পু না তু বো I হ রি র তি বা স বি ভ্র মী I প বি ত্র মন I ব্র জ রু চি রা ঙ্গ না স্ত বে। I
ন মী র ণো I ল সি ত ল তা স্ম রা ল য়ে I য মু ন ক I ভু ব ল ত মা ল ভূ রু হঃ॥ I

[ছন্দোমঞ্জরী পৃ ৭৩]

(৫) শার্দ্দুল বিক্রীড়িত ঃ

— — —
সিন্ধুর রোল
⏑ ⏑ — ⏑ —
মেঘে ভিড়ল আজ,
⏑ ⏑ ⏑ —
গ র জে বাজ, |

— — ⏑ —
বিদ্যুৎ বিলোল—
— ⏑ — —
র ক্ত চোখ। I

— — —
ঝঞ্ঝার দোল
⏑ ⏑ — ⏑ —
সারা সৃষ্টি ময়,—
⏑ ⏑ ⏑ —
জাগে প্রলয়, |

— — ⏑ —
তাণ্ডব বিভোল্—
— ⏑ — —
হায় দ্যুলোক। I

[কাব্যসঞ্চয়ন ঃ বিদ্যুৎবিলাস

(৬) তোটক ঃ

⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ —
আমি চলব কি, চললে যে ফুল মাড়াব,
শেষে সাধ করে ভুল করে দিক হারাব,

[অভ্র আবীর ঃ জাফরানের ফুল

(৫) সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্। [ছন্দোমঞ্জরী সূত্র ১৮৬]
যাহার প্রতিপাদে ক্রমে ম (— — —), স (⏑ ⏑ —), জ (⏑ — ⏑), স (⏑ ⏑ —), ত (— — ⏑), ত (— — ⏑), গ (—) গণ থাকে এবং যথাক্রমে দ্বাদশ ও সপ্তমাক্ষরে যতি পড়ে তাকে 'শার্দূল বিক্রীড়িত' ছন্দ বলে। যেমন—

— — — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑ — — — ⏑ — — ⏑ —
গোবিন্দং প্রণমোত্তমাঙ্গ রমনে। তং গোষয়াহর্নিশং I
পাণী পূজয়তং মনঃ স্মর পদে। তস্যালয়ং গচ্ছতম্। [ছন্দোমঞ্জরী পৃ ১৩০

(৬) বদ 'তোটক' মব্ধিসকারযুতম্।
যে ছন্দে ক্রমশঃ চারিটি স (⏑ ⏑ —) গণ থাকে, তাকে 'তোটক' বলে। যেমন
⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ —
প্রণমামি শিবং শিব কল্প তরুম (শঙ্করাচার্যের শিবস্তোত্র)।

(৭) বিদ্যুন্মালা ঃ

— — -- —
ছিপখান তিন দাঁড়
— — - - —
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন ভোর
দেয় দূর পাল্লা।

[কাব্যসঞ্চয়ন ঃ দূরের পাল্লা]

['চরকার গান' কবিতাটিও 'বিদ্যুন্মালা' ছন্দে লিখিত বলা যেতে পারে]

(৮) গৌড়ী (?)-গায়ত্রী ঃ

— ◡◡ — ◡ — ◡◡
জয় করি! জয় জগৎ প্রি য়
◡ -- ◡ ◡ — ◡◡◡
ব রে ণ্য হে ব ন্দ নী য়।
◡ — ◡ — — ◡◡ — —
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!
— ◡◡ — - ◡ ◡◡
প্রাণ - প্রণবের দ্রষ্টা - ন ব!
-- ◡ ◡◡ — ◡ ◡ ◡
গান সে অ স প ত্ন ত ব
◡◡◡ ◡ — ◡◡ -- —
অ মৃ ত স মু দ্ভ ব! জয়! জয়!

[কাব্যসঞ্চয়ন ঃ শ্রদ্ধা হোম]

উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে কবি সংস্কৃত ছন্দের লঘু-গুরু দলবিন্যাস-রীতি রক্ষা করেছেন, - তবে এই লঘু-গুরু বা এক কলা ও দুই কলা উচ্চারণে কলাবৃত্ত রীতির

\- - — -

(৭) মো মো গো গো 'বিদ্যুন্মালা'।

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে দুটি ম (— —) গণ ও দুটি গ (—) গণ থাকে তাকে বিদ্যুন্মালা বলে।

\- - - - - - - - - - - - - - - -

যেমন— "বা সো ব ল্লী বি দ্যু ন্মা লা ব র্হ শ্রে ণী শাক্রশ্চাপঃ। [ছন্দোমঞ্জরী ঃ পৃ ২৮]

(৮) 'গায়ত্রী' প্রাচীনতম বৈদিক যুগের সংস্কৃত ছন্দ। প্রতিপংক্তিতে আটটি দল (রুদ্ধ মুক্তের সুনির্দিষ্টতা নেই),—এরূপ ত্রিপংক্তিতে এক এক শ্লোক। সত্যেন্দ্রনাথ 'গৌড়ী' রীতি উদ্ভাবনে তৃতীয় পংক্তিতে নয় দল প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে আট দল রেখেছেন।

মুক্ত ও রুদ্ধ দল প্রয়োগ করে আধুনিক বাংলা ছন্দের উচ্চারণ-স্বাভাবিকতাও পাশাপাশি রক্ষা করেছেন।[২১] এ প্রসঙ্গে 'ছান্দসিকী' লেখক শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি মন্তব্য বিচার্য। দিলীপকুমার তাঁর 'অনামী' কাব্যগ্রন্থের একটি পত্রে লিখেছেন—

দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্য

"...সংস্কৃত গুরুস্বর অতি অপূর্ব কল্লোল আনে। কিন্তু কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না। তাই তিনি স্বরমাত্রিকের (কলাবৃত্ত) যুগ্মধ্বনিকে (রুদ্ধদল) সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরবর্ণের বদলী হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলুন তো তাতে কি সংস্কৃত ছন্দের প্রতিরূপটি এসেছে? ঠাট এসেছে মানি, কিন্তু উদাত্তধ্বনি—ডমরু রোল—গাম্ভীর্য ?—আসতেই পারে না। কেন পারে না? কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘস্বরবর্ণের দরাজ আওয়াজের পরে ওর অনেকখানি সৌন্দর্য নির্ভর করে।...আমার কেবল দুঃখ বৈষ্ণব কবিদের তথা ভারতচন্দ্রের দীর্ঘস্বরপ্রীতি আমাদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হতে বসেছে বাংলা যুগ্মধ্বনিগুলির নানারকম ফুলঝুরির চটকে।...আমি একথা বলছি শুধু এই জন্যে যে সত্যেন্দ্রনাথের যুগ্মধ্বনি দিয়ে সংস্কৃত গুরুস্বরের ওজন রাখার চেষ্টাকে আমি বন্ধ্যা মনে করি। ওতে সংস্কৃত ছন্দের "সিংহের" সেই শরীর লাভ হবে যাকে খানিকটা সিংহের মতো দেখালেও সংস্কৃত সিংহবীনসমন্বিত হবেনা—সহজেই তাকে গাভীতে ভক্ষণ করতে পারবে।"

[কল্পনাকুমারকে লেখা পত্রগুচ্ছ : অনামী ১ম সং. পৃ ৪০২-২৪]

এখানে দিলীপকুমার রায়ের প্রধানতম বক্তব্য হল, সত্যেন্দ্রনাথ রুদ্ধ-মুক্ত দল ব্যবহারে যেভাবে বাংলাছন্দে সংস্কৃতের লঘু-গুরু সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ আনতে চেয়েছেন তাতে আকৃতিগত বা বহিরঙ্গ রূপ ফুটলেও, সংস্কৃত ছন্দের গুরুস্বর উচ্চারণের প্রকৃতিগত চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাবে না। ফলে তার এ-ছন্দ একান্তই নিষ্প্রাণ হয়ে থাকবে। একথা অবশ্য স্বীকার্য, রুদ্ধদলের গুরুধ্বনি আর দীর্ঘস্বর-মুক্তদলের গুরুধ্বনিতে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উচ্চারণ অনেক বেশী সুরাশ্রয়ী। যেদিন থেকে বাংলা ছন্দ 'আধুনিকতা'র মর্যাদা পেয়েছে,—সেদিন থেকে ক্রমানুয়ে তার ধ্বনিগত সুর-প্রাধান্য কমে এসেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে

২১। এ-ছাড়াও কবির 'চণ্ডবৃষ্টি' (গগনে গগনে নীল নিবিড়), 'অনুষ্টুভ' (আর্ত সংসার ব্যথায় কাঁদছে) ও 'ছালিকা' (আছের গুরু অর্ধেক ধরার) ছন্দে রচিত কবিতার নিদর্শন মিলছে।--এসব কবিতাতেও তিনি রুদ্ধ মুক্ত দলের সাহায্যে লঘু গুরু গণ-বিন্যাসক্রম রক্ষা করেছেন।

লঘু-গুরু উচ্চারণ ছিল, কিন্তু সেগুলি মূলত কীর্তনগীতি হিসাবে গীত হত।

মন্তব্যের সত্যতা বিচার

ভারতচন্দ্রের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের বাংলা ছন্দ আধুনিক বাংলা পঠনরীতিতে নিতান্তই কৃত্রিম মনে হবে। এই কারণেই বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে কোন কবিই ঠিক সফল হতে পারেননি। দিলীপকুমার যে অভিযোগ এনেছেন, 'কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না' সেকথা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সংগীতে মুক্তদল-স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ তিনিও এনেছেন। যেমন—

চলে ধীরে! ধীরে! ধীরে!
অনিবার মৃদুধারা ঘিরে ঘিরে ধরণীরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
খর রৌদ্রে বায়ু মূর্চ্ছে, জ্বলে জ্বালা,
চির স্বপ্নে, রহে চম্পা চির বালা ;
তনু আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধূলি ঘুরে ফিরে।
ধীরে! ধীরে! ধীরে!

[বিদায় আরতি ঃ বৈশাখের গান]

এমনকি প্রয়োজন মতো কোন কবিতায় দীর্ঘযতি স্থানে (পংক্তি শেষে) দ্বিমাত্রিক উচ্চারণে মুক্তদল ব্যবহার করেছেন। আধুনিক উচ্চারণের স্বাভাবিকতা (আবৃত্তির স্বাভাবিক পঠনভঙ্গি) রাখতে গিয়ে সতেন্দ্রনাথ ছন্দকে সুরাশ্রয়ী করা সঙ্গত মনে করেননি। তিনি বুঝেছিলেন অন্য ভাষার ছন্দ স্বীয় মাতৃভাষায় আনতে হলে, নিজস্ব ভাষাছন্দের মূল উচ্চারণ-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ না করেই আনতে হবে। নাহলে পাঠকের অভ্যস্ত ধ্বনিগত প্রত্যাশাবোধ ক্ষুণ্ণ হবে, এবং তার ফলে এই বিভাষার ছন্দ বাংলায় আমদানির আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সর্বাংশে বাংলায় তিনি আনতে পারেননি ;—কিন্তু জোর করে তেমনটি আনতে গিয়ে যে আধুনিক বাংলা ছন্দের উচ্চারণগত স্বাভাবিকতা, সজীব প্রাণধর্ম নষ্ট করেননি, বাংলাছন্দকে 'প্রত্ন' উচ্চারণের কৃত্রিমতায় রূপান্তরিত করেননি সেটিই তাঁর প্রধানতম কৃতিত্বের পরিচায়ক বলতে হয়।

অন্যান্য বিদেশী ছন্দ ব্যবহার

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যতীত ইংরেজি, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি ছন্দও বাংলায় আমদানি করতে গিয়ে এই একই রীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'পিয়ানোর গান' কবিতাটি এ

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।—

তুল্ তুল্ | টুক্ টুক্ |

ট্রোকী পর্বভাগ

টুক্ টুক্ | তুল্ তুল্ I

কোন্ ফুল | তার তুল্ |

তার তুল্ | কোন্ ফুল্ ? I

[কাব্যসঞ্চয়ন : পিয়ানোর গান]

ইংরেজী ট্রোকী পর্বভাগে (দ্বিদল পর্ব : প্রথম দলে প্রস্বর) কবিতাটি পাঠ করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে কবি চতুর্মাত্রা কলাবৃত্তের পর্বভাগও রক্ষা করেছেন।

'সিংহল' কবিতাটি স্কটের 'Young Lochinvar'-এর ছন্দে লিখিত বলে কবি জানিয়েছেন। উভয় কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি।

স্কটের Young Lochinvar থেকে,—

Young Lochinvar ও সিংহল কবিতা

O young | Lochinvar | is come out | of the west,
Through all | the Bor | der his steed | was the best
And save | his good broad | sword he wea |
pons had none,
He rode | all unarm'd, | and he rode | all alone,
So faith | ful in love, | and so daunt | less in war,
There ne | ver was knight | like the young | Lochinvar

[Lochinvar Lady Heron's song : 1st Stanza : From
Scott's Poetical Works : by J. G. Lockhart]

সত্যেন্দ্রনাথের সিংহল কবিতা থেকে,—

ওই | সিংহল দ্বীপ | সুন্দর শ্যাম, | -নির্মল তার | রূপ, I
তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

[কাব্যসঞ্চয়ন : সিংহল]

সত্যেন্দ্রনাথ স্কটের কবিতাটি থেকে দলসংখ্যার হিসাবটি নিয়েছেন।২২ অতিপর্ব ইংরেজি কবিতাটিতে নেই, শুধু চারটি পর্ব আছে। সত্যেন্দ্রনাথ চারটি পর্বের অতিরিক্ত প্রথমে একটি অতিপর্বের প্রস্বর-স্পন্দন রেখেছেন। Lochinvar কবিতাটিতে Iambic (◡ ´)-মিশ্রিত Anspaest (◡◡ ´) পর্বভাগ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাটিতে অতিপর্ব সহ ২।৬।৬।২ মাত্রার পর্বভাগে কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। সমগ্র কবিতায় মাত্র দুটি অতিপর্বে মুক্তদল ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রেই রুদ্ধদল দিয়েছেন। অতিপর্বে এবং পর্ব-সূচনায় রুদ্ধদলের স্পন্দনে আংশিকভাবে ইংরেজি প্রাস্বরিক উচ্চারণের অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন অনুমিত হয়।

এই প্রসঙ্গে 'তাজের প্রথম প্রশস্তি' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মূল ফার্সী ছন্দের অনুকরণে রচিত বলে কবি জানিয়েছেন। সম্ভবত ফার্সী 'মোতাকারিব' ছন্দের একটি ধারায় (ফউলুন | ফউলুন | ফউলুন | ফোল্) কবিতাটি রচিত হয়েছে। এখানে প্রথম ছন্দের চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।—

ফার্সী মোতাকারিব ছন্দ প্রয়োগ

◡— — ◡—— ◡—— —

জগৎ সার। | চমৎকার। | প্রিয়ার শেষ | শেষ
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ।
উজল দিক্। শোভায় ঠিক স্বরগ-উদ্যান,
সদাই তর্ সুবাস-ঘর— যেমন প্রেম-ধ্যান।

[কাব্যসঞ্চয়ন ঃ ত্যাজের প্রথম প্রশস্তি]

কবি গোলাম মোস্তাফা এই রীতির মোতাকারিব ছন্দের বাংলা উদাহরণ দিয়েছেন,—

সরাব নাও, | গজল গাও | মাতাও মন | দিল,
নূপুর ঘায় | মুখর হোক। হৃদয় মন্ | জিল্।

[প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ ঃ পৃ ৪৬-৫৭]

২২। Young Lochinvar কবিতাংশের প্রথম ও ষষ্ঠ পংক্তির বিকল্প ছন্দ-বিশ্লেষণ :

১ম O young Lo | chinvar | is come out | of the west,

৬ষ্ঠ There never | was knight | like the young | Lochinvar

অনুমিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রথম ছন্দ-বিশ্লেষণরীতিই যথাসম্ভব অনুসরণ করেছিলেন। এমন রুদ্ধদল সর্বস্ব ছন্দে নূতনত্ব থাকলেও অত্যন্ত কৃত্রিম ও আয়াসসাধ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিতাটি পঞ্চমাত্রাপর্বিক কলাবৃত্ত (৫।৫।৫।২) অথবা ত্রিদল সমন্বিত দলবৃত্ত পর্বে স্বচ্ছন্দে পাঠ করা যায়। তাছাড়া, কবি প্রতি পর্বের রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসেও সুনির্দিষ্টতা রেখেছেন দেখা যাচ্ছে।

জাপানী তানকাসপ্তক

'তীর্থরেণু' এবং 'অভ্র আবীর' কাব্যগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ যথাক্রমে 'তান্‌কা' এবং 'তান্‌কাসপ্তক' ও 'বৈকালী' নামে একই স্তবকবন্ধের তিনটি কবিতা লিখেছেন। তান্‌কাসপ্তকের একটি স্তবক এখানে তুলছি,—

— ◡ ◡

অশ্রুর দেশে।

◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡

হা সি এ সে ছি ল | ভুলে ; I

◡ ◡ — ◡ ◡

সে হা সিও শেষে

◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡

ম র ণে প ড়ি ল চু লে।

— ◡ ◡ — ◡ ◡

অ শ্রু সাযব- কূ লে।

[অভ্র আবীর : তানকাসপ্তক]

কবি নিজে জাপানী তানকা ছন্দোবন্ধ সম্পর্কে লিখেছেন

> "এই সমস্ত কবিতা পাঁচ পংক্তির অধিক দীর্ঘ হইবার নিয়ম নাই; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, জাপানী ভাষায় এইগুলিকে 'তানকা' বলে। তানকার পাঁচপংক্তিতে সাধারণত একত্রিশটি মাত্রা থাকে।
>
> [১৯১৮, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'তানকা' প্রবন্ধ দ্র.]

কবি আলোচ্য কবিতা দুটিতে যে কলাবৃত্ত রীতির ৬।৬।২।৬।৬।২।৬।২। পর্ব-পংক্তি বিভাগ করেছেন এবং তিনটি পংক্তি শেষে (এবং প্রথম দুই পংক্তির পর্বশেষে) মিল দিয়েছেন তার ফলেই কবিতাটি বাঙালী পাঠকের শ্রুতিবোধকে তৃপ্ত করেছে।

একদল শব্দের চীনা ছন্দ

চীনা ভাষায় একদল শব্দে (mono-syllabic word) ছন্দ রচিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তার অনুকরণে 'আলগ পাপড়ি' ছন্দ রচনা করেছেন। যেমন

শিষ্ কে ঃ দ্যায় গো । আজ।
ত্যার কি ভিন্ গাঁ ঘর ?
দুখ্ সে ত্যার কি পর ?
চাঁদ সে ত্যার কি ত্যাজ ?

[ছন্দ সরস্বতী ঃ ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ]

এখানে রুদ্ধ এবং মুক্ত দলবিন্যাসের সুনির্দিষ্টতা এসেছে এবং প্রতি তিনমাত্রায় (উপপর্ব বিভাগে) যতি স্পষ্ট হয়েছে ; উপপর্বিক দ্বিদলযতি-ভাগে প্রথম রুদ্ধদলটিতে প্রাস্বরিক উচ্চারণ ফুটে উঠেছে। সমস্ত পংক্তিটি ৩ ঃ ৩।২। যতিবিভাগে আট মাত্রার কলাবৃত্ত রীতির (অথবা, ২ঃ২।১। দলবৃত্ত রীতির) ছন্দে রচিত হয়েছে।

গুজরাটি অঁজনী ছন্দের[২৩] একটি নিদর্শন দিয়েছেন কবি ঃ

গুজরাটী অঁজনী ছন্দ

স্বরগের সন্দেশ | তুই যে শোনাস্ রে, ।
দেবতার গান মোর আঙিনায় গাস্ রে ;
ভাবরস চন্দনে মন যে ভিজাস্ রে
তুই সুধা মৌচাক রে।

[মণিমঞ্জুসা ঃ খোকা]

এটি বিশুদ্ধ কলাবৃত্তে, ৪।৪।।৪।৪। মাত্রাভাগে রচিত। তিনটি অনুরূপ ষোড়শ মাত্রক পংক্তির পর দশ মাত্রার একটি ছোট পংক্তি এনে চতুস্পংক্তিক স্তবক রচিত হয়েছে। পংক্তিশেষে 'রে' একমুক্তদল শব্দটিকে দীর্ঘ (দ্বিকলারূপে) উচ্চারণ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের এই জাতীয় সংস্কৃত এবং দেশী ও বিদেশী লঘু-গুরু বা প্রাস্বরিক-অপ্রাস্বরিক ছন্দকে মোহিতলাল 'হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত' নাম দিয়েছেন। আলোচ্য ছন্দ সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।—

> এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা তুম, দের সর,

[২৩] । গুজরাটী অঁজনী ছন্দ, ৮।।৮। ৮।।৮। ৮।।৮ । ১০। মাত্রক চতুষ্পংক্তিক স্তবকবন্ধ। যেমন,—

আ গো মা লা অাঁসু খুতা।।
হ ই আ লা দোদীআ তুত্যা।
বণনন্দে লভাবে সুত্যা।
জাবুক্যা হাবা॥

এটি লঘু গুরু উচ্চারণের কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ আধুনিক কলাবৃত্তের উচ্চারণে ছন্দোবন্ধকে এনেছেন। অঁজনী হিন্দী ও মারাঠীতেও প্রচলিত আছে।

নার্) গুরু এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা—তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে ; তথাপি কথ্য বাংলা ভাষায় উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই—আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকেই কাজে লাগাইয়া, তিনি এক নূতন ছন্দধ্বনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং শিল্প হিসাবে উপভোগ্যও বটে ; কিন্তু সে ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা 'চিত্রকাব্য' রচনাই সম্ভব কারণ, বাংলা কাব্যের উচ্চারণে আদ্য ঝোঁককে কোনক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না ; এজন্য গুরু-লঘু স্বর সন্নিবেশকালে, সেই ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া—ছন্দের আবশ্যকমত, যে কোন স্থানে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনিচাতুর্যই প্রধান হইয়া উঠে,— কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

মোহিতলালের মন্তব্য

[বাংলা কবিতার ছন্দ (২য় সং) : পৃ ৬৮

এককালে গ্রীকে এবং পরে ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে প্যাটার্ন কবিতা (partern poetry) রচনার রেওয়াজ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথও নিছক দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু প্যাটার্ণ কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'রাজর্ষি রামমোহন' এবং 'দিগ্বিজয়ী' কবিতাদুটি গ্রীক Bumos বা বেদীভূমক ছন্দে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রীক কাব্যের উচ্চারণ রীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র বহিরঙ্গ পংক্তিসজ্জায় এ কবিতাদ্বয় যজ্ঞবেদীর আকার লাভ করেছে। মূলত এটি মিশ্রবৃত্ত রীতির অসমান পংক্তিবন্ধের প্রবহমান ছন্দে রচিত। যেমন,—

গ্রীক Bumos বা বেদীভূমক ছন্দ

তোমারে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়
তব শ্রাদ্ধ দিনে বঙ্গ। চিত্ত তার ধায়
তোমার সমাধিতীর্থে, হে মনস্বী। নিত্য স্মরণীয়!
নব্য বঙ্গে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ! ওহে সত্যপ্রিয়!
আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাচালে স্বদেশ,
অর্থহীন নারীহত্যা পাতকের শেষ
করিলে, বাঁচাতে বহু প্রাণী
যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি

বেদান্ত, কোরান, বাইবেল
মিলালে তুমি হে অবহেলে
নবযুগ প্রবর্তিলে তুমি
উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি ;
উচ্চে ধরি তর্ক তরবার
বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার ।
কীর্ত্তি তব কীর্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত ।
বিশ্বে মহামিলনের তুমি অগ্রদূত,
যুগ যুগন্ধর রাজা ! রাজপূজা প্রাপ্য সে তোমার
মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত আপনার ।[২৫]

[অভ্র আবীর : রামমোহন স্মরণে]

পরবর্তী 'দিগ্বিজয়ী' (অভ্র আবীর) কবিতাটিও অনুরূপ পংক্তিবন্ধে লিখিত,- সেখানে শেষের দিকে আঠারো মাত্রার পংক্তি চারটি আছে।—অর্থাৎ বেদীভূমিকে আরও দৃঢ় করেছেন কবি। এই পর্যায়ে 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের 'গ্রীষ্মের সুর'

ছন্দের ছবি আঁকা

কবিতাটির নাম করা যেতে পারে। চতুষ্কোণাকৃতি পংক্তি-বিন্যাসে দুইমাত্রা থেকে চব্বিশমাত্রা পর্যন্ত পংক্তি-পরিসরে বারো পংক্তিতে স্তবক সাজিয়েছেন।[২৬] সে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় কবিতার ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে, ছন্দ দুর্বল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছন্দ-মিলের মাঝে মাঝে রেখাচিত্র আঁকতেন।—সত্যেন্দ্রনাথের এ কবিতাগুলিকে সেই পর্যায়ভুক্ত করে দেখা যেতে পারে।—মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লিখিত কবিতায় 'চিত্র ছাঁদ' কিছু হয়তো আছে, তবে সেটি চিত্র-সৌন্দর্যের আলোচনার বিষয়। 'ছন্দ যাদুকর' কবি এখানে কিছুটা স্বকীয় ছন্দোধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সে কারণে ধ্বনিসৌষম্য বিচারে কবিতাগুলি সর্বাংশে সফল হতে পারেনি।—

রুদ্ধদল বিন্যাসের ধ্বনিসৌন্দর্য

সত্যেন্দ্রনাথ শুধু সংস্কৃত এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দ প্রয়োগ করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি রুদ্ধদল বিন্যাসের দ্বারা বাংলা ছন্দের নতুনতর ধ্বনিতরঙ্গও সৃষ্টি করেছেন ; বিভিন্ন যতিবিভাগের এবং প্রাস্বরিক উচ্চারণের দ্বারা, রুদ্ধ ও মুক্তদলের সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের দ্বারা বাংলা কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিস্পন্দনগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধি

২৫। কবিতাটির 'বেদীভূমি'র আকৃতি চারপাশে রেখা টানলেই ধরা পড়ে।
২৬। 'গ্রীষ্মের সুর' কবিতার চতুষ্কোণ আকৃতি [illegible] কবি ভিক্টোর হুগোর কবিতা[illegible]কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

করেছেন। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথও যে অনুরূপ পরীক্ষা করেছেন পূর্বেই আমরা দেখেছি। এখানে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কলাবৃত্ত রীতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,--

(১)

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ । । ॥ ॥
ঝর্ণা! | ঝর্ণা! | সুন্দরী | ঝর্ণা! I

। । । । ॥ । । ॥ । । ॥ ॥
তরলিত | চন্দ্রিকা! | চন্দন- | বর্ণা! I

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ ॥
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,

। । ॥ । । । । ॥ । । ॥ ॥
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,

। । । । ॥ । । । । । । ॥ ॥
তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা।

॥ ॥
ঝর্ণা

[কাব্যসঞ্চয়ন : ঝর্ণা]

চতুষ্কল পর্বভাগের এ-ছন্দে প্রয়োজনে কবি মুক্তদলের গুরু দ্বিকলা (॥) উচ্চারণ এনেছেন। রুদ্ধদলের বহুল ব্যবহারে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। চতুষ্কল পর্বভাগের আরও বৈচিত্র্য কবি দেখিয়েছেন।--

(২)

॥ ॥ ॥ ॥
টুপ টুপ টুপ টাপ।

॥ ॥ ॥ ॥
দেয় পান | বৌ টি, I

টা | ডুব | টুপ টুপ |
ঘোমটার বৌটি।

[কাব্যসঞ্চয়ন : দূরের পাল্লা]

এখানে কবি সর্বত্র রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন। দুটি রুদ্ধদলে চার কলামাত্রায় পর্ব সাজিয়েছেন। এ ছন্দকে সরল কলারীতির ছন্দ না বলে দলবৃত্ত ছন্দ বলা যায় কি?—মুক্তদলের কলাপ্রসারণ (একমাত্র পংক্তিশেষের দলটিতে ছাড়া) ঘটেনি বলেই দলবৃত্ত

সুনির্দিষ্ট রুদ্ধ মুক্ত (সংস্কৃত ছন্দের ন্যায়) দলবিন্যাস রচিত

প্রকৃতির উচ্চারণ প্রকাশ পায়নি।—সুতরাং এটি কলাবৃত্ত রূপেই গণ্য করতে হবে।[২৬]

(৩) মনে প্রা ণে হিল্লোল
বনে ব নে হিন্দোল
মেঘে মৃ দ ঙের বোল মৃ দু ম ন্থর
শ্রা ব ণে রি ছন্দে
ক দ মে রি গ ন্ধে
আয় তুই চঞ্চল! চি র সুন্দর

[বিদায় আরতি : হিল্লোল বিলাস]

কবি এ কবিতার নাম দিয়েছেন হিল্লোল বিলাস। ৪।৪।।৪।৪।।৪।৪।।৪।২ I-মাত্রা ভাগের চৌপদীবন্ধ, রুদ্ধ ও মুক্ত দলের অনেকটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস-রীতিতে এ-ছন্দ রচনা করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসে ত্রিদল-পঞ্চকলা, এবং চতুর্দল-পঞ্চকলা ছন্দ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।—

(৪) ত্রিদল-পঞ্চকলা পর্ব :

চ পল পায় কে বল ধাই
উপল ঘায় দিই ঝি লিক
দুল দোলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দি খিদিক।

[বিদায় আরতি : ঝর্ণার গান]

(৫) চতুর্দল-পঞ্চকলা পর্ব :

সি ন্ধু তু মি ব ন্দ নী য়, বি শ্ব তু মি মা হে শ্ব রী,
দী প্ত তু মি; মু ক্ত তু মি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণপ্রিয়!
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

[অভ্র আবীর : সমুদ্রাষ্টক]

২৬। 'বিদায় আরতি'র 'চরকার গান' কবিতাটিও এই একই ছন্দে রচিত।

ছন্দহিল্লোল

'ছন্দোহিল্লোল' কবিতায় চতুর্দল-সপ্তকলা পর্ববিন্যাসে একটি সার্থক ছন্দোবন্ধ রচনার নিদর্শন দেখা যায়।—

(৬) ঝর্ ছে ঝ র্ঝর, ঝর্ছে ঝম্ ঝম্

— ⌣ — — — ⌣ —

ব জ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্ গম্

- ⌣ — — — ⌣ —

লিখছে বিদ্যুৎ ম ন্ত্র অদ্ভুত,

— ⌣ — — - ⌣ — —

বলছে তিনলোক "বম্ ব বম্ বম্!"

[কাব্য সঞ্চয়ন ঃ ছন্দোহিল্লোল]

এখানে একদিকে কবি লঘু-গুরু শব্দবিন্যাসক্রম ঠিক রেখেছেন, সেই সঙ্গে সাতমাত্রা পর্বের শব্দবিন্যাসেও তিন ও চার মাত্রার ক্রম ঠিক রেখেছেন।

অতিপর্বিক দোলা, মিল বৈচিত্র্য বিচিত্র মাত্রার পর্ববিন্যাস

(৭) মিল-বৈচিত্র্য, অতিপর্বিক দোলা এবং বিচিত্র মাপের পর্ব বিন্যাস-নিদর্শন হিসেবে একটি উদাহরণ তুলছি।—

			পর্ব-পদভাগ	মিল
বয়েস	আড়াই কি দুই	...	(৩) ৬॥	ক
মনটি	নিরমল যুই	...	(৩) ৬॥	ক
হালকা	যেন হাওয়া	...	(৩) ৫॥	খ
মেয়ে সে	মুখ চাওয়া	...	(৩) ৫॥	খ
মায়ের	কাছে কাছে	...	(৩) ৪॥	গ
ছায়ার	মত আছে	...	(৩) ৪॥	গ
জানেনা	মা বিনা কিছুই।	...	(৩) ৬ I	ক
একদা	দুল দু'টি বোনে	...	(৩) ৬॥	ঘ
পুতুল	নিয়ে কি কারণে	...	(৩) ৬॥	ঘ
ঝগড়া	কাড়াকাড়ি	...	(৩) ৪।	ঙ
তখন	দিয়ে আড়ি	...	(৩) ৪॥	ঙ
হারিয়ে	কাঁদো কাঁদো	...	(৩) ৪॥	চ
হয়ে সে	আধো আধো	...	(৩) ৪॥	চ
কহিল	"ডিডি! টুমি টুষ্ট!"	...	(৩) ৬ I	ক

[অন্ত্য আবীর ঃ প্রথম গালি]

অনুমিত হয়, কবি এখানে ৩।৬—মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দই রক্ষা করতে চেয়েছেন। যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, চারদলে ছয় কলার প্রসারণ ঘটিয়েছেন।

দলবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ

দলবৃত্ত ছন্দেও সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্র পর্ব ও পদের বিন্যাস করেছেন। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

		পর্ব-পদভাগ
(১)	লাল প রী গো। লাল প রী।	৪।৩।।
	ই ন্দ্র পু রীর সু ন্দ রী।	৪।৩
	কখন আসিস্ কখন যাস্।	৪।৩।।
	কার গালে যে গাল বোলাস্।	৪।৩।
	কার হাতে পায় তুলতুলি—	৪।৩।।
	ফোটাস রাঙা পদ্ম গো।	৪।৩।
	জানবে তা কোন্ মন্দ গো।	৪।৩।
	তোর চুমাতে হয় যে লাল	৪।৩।।
	খোকা খুকুর হাত পা গাল।	৪।৩।
	... ...	
	লালপরী গো। লালপরী।	৪।৩।।
	স্বপ্ন পুরীর অপ্সরী!	

[অভ্রআবীর ঃ লালপরী]

(২) ঝড় রুসিয়ে

ধায় তুসিয়ে

ফোঁস ফুসিয়ে

খুব হুসিয়ার।

ডাল মট কায়

এক ঝট্ কায়

ফুল চট কায়।

সব দুনি য়ার। [শিশু কবিতা ঃ ঝড়ের ছড়া]

কবিতাটি দলবৃত্ত অথবা কলাবৃত্ত যে কোনও রীতিতে পড়তে বাধা নেই। ত
পর্বসূচনার প্রস্বর এবং দ্বিদল পর্বের কলা (চার কলা ?)-প্রসারণ এখানে দলর
রীতির প্রকৃতিধর্মই এনে দিয়েছে। দলবিন্যাসে, যতি সংস্থাপনে কবি সুনির্দিষ
একটি রীতি গ্রহণ করার ফলে ছন্দের নতুন রূপাদর্শ (pattern) পরিস্ফুট হয়েছে

(৩) খোকন ধন | ঘুম চায়-গো |
ঘুম আয় গো I
চোখ পিট্ পিট্ | মিট্ মিট্ মিট্—
ঘুম পায় গো— | ঘুম আয় গো। I

[মণিমঞ্জুষা : ঘুমপাড়ানি গান

দলবৃত্তে তিনদল-পর্বের ব্যবহার

দলবৃত্ত রীতির ছন্দে চারিটি দলে সাধারণত পর্ব গঠি
হয়।—এখানে সত্যেন্দ্রনাথ তিনদলে পর্ব গঠন করেছেন,
তাতে ছন্দ এতটুকু দুর্বল হয়নি সেটি লক্ষনীয়।

ছড়া জাতীয় কবিতায় এমন বহু বিচিত্র পর্ব-পদ-পংক্তিবন্ধে, রুদ্ধদলে
উপলভঙ্গের তরঙ্গধ্বনি তুলে, পর্বের প্রথমে প্রস্বর দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ঐশ্ব
বৃদ্ধি করেছেন। দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত ছন্দ তাঁর হাতে এসে নতুন সঞ্জীবনী
শক্তি লাভ করেছে।

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দে দীর্ঘ ত্রিপদী

সত্যেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট রীতির দলবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার
করেছেন। এখানে একটি দীর্ঘ ত্রিপদী-বন্ধের উদাহরণ
দিচ্ছি। -

তোমার নামে নোয়াই মাথা ॥ ওগো অনাম ! অ নি র্ব চ নী য়। ॥
প্রণাম ক রি হে পূ র্ণ কল্যাণ। I
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ ॥ সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়, ॥
আলোয় জাগো সকল আলোর ধ্যান।

[বিদায় আরতি : বর্ষবোধন]

কবি এখানে ৮॥১০॥১ মাত্রার পদযতিতে পংক্তি সাজিয়েছেন। অবশ্য
দ্বিজেন্দ্রলালের সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির মতো এ ছন্দ অতটা সংবদ্ধ হতে পারেনি

স্বীকার করতে হয়। এ ছন্দে লৌকিক ছন্দোদ্ভূত (রবীন্দ্র-প্রভাবিত) সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দের রূপটিই পরিস্ফুট হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দেও প্রচলিত প্রায় প্রত্যেকটি ছন্দোবন্ধের ব্যবহার করেছেন। কিছু সনেট কবিতাও লিখেছেন। প্রবহমান অমিল পয়ার-বন্ধে মধুসূদনের ছন্দের 'প্যারডি' (হসন্তিকা ঃ অম্বলসম্বরা কাব্য) রচনা করেছেন।

সমালোচক অজিত চক্রবর্তী সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন, "ফরাসী কবি পল্ ভারলেন সম্বন্ধে যেমন বলা হয় যে 'he paints with sound' তিনি ধ্বনির দ্বারা চিত্র আঁকেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই কথা বলা যাইতে পারে।" [প্রবাসী কার্তিক ১৩২৫ দ্র] এই মন্তব্যের আলোকে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের প্রকৃতি বহুলাংশে উপলব্ধি করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও ছন্দ বিষয়ক একটি আলোচনায়[২৭] বলেছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁকে বললেন, "বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃত ছন্দস্পন্দ বাংলায় আনতে হবে। ..তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না। .. মন্দাক্রান্তা নিয়ে সুরু কর।" ওই প্রবন্ধেই অন্যত্র বলেছেন, ছন্দেশ্বরী দেবী তাকে জানালেন, "বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই বা থাকল? যুক্তাক্ষর তো আছে। যুক্তাক্ষরের পর্য্যায় বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি বৈচিত্র্যের গতিক্রম প্রবর্তিত কর।" সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপায়নে মূলত এই নীতিই সযত্নে পালন করেছেন। নতুন বাংলা ছন্দস্পন্দও এই পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ যুগে এত বেশী সচেতন ছন্দকুশলী কবি আর দেখা যায় না।-- অবশ্য ছন্দ সম্পর্কে অতিরিক্ত রীতি-সচেতন হবার ফলে কিছুটা কুফলও তাঁর রচনায় মেলে। ধ্বনিস্পন্দন ও মিল সৃষ্টির জন্যে মাঝে মাঝে দুর্বল শব্দ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তেমন উদাহরণ তাঁর সমগ্র কবিতার ঐশ্বর্যের তুলনায় বেশী নয়।

অজিত চক্রবর্তীর মন্তব্য

কবির ছন্দ আলোচনা

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে একজন বিশিষ্ট ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা ছন্দচিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য ছান্দসিকের সম্মানও তাঁরই প্রাপ্য। সে বিষয়ে একটি পৃথক আলোচনা গ্রন্থ-পরিশিষ্টে সংযোগ করা হল।

২৭। দ্র. ছন্দসরস্বতী : চতুর্থ প্রকাশ।

॥ ঘ ॥

সুকুমার রায়ঃ শিশুপাঠ্য কবিতায় কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার

আলোচ্য যুগের অপর শক্তিমান ছন্দকুশলী কবি হলেন সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রতিভার উন্মেষ-যুগেই এই তরুণ কবি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর 'আবোল তাবোল' নামক ছড়াগ্রন্থটির (শিশু সাহিত্য) ছন্দবৈচিত্র্য এবং নির্মল হাস্যরসের ও অদ্ভুতরসের নিদর্শন হিসেবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি প্রধানত কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে বিচিত্র পর্ব-পদ-পংক্তি-বন্ধের ব্যবহার করেছেন।

প্রথম তাঁর কলাবৃত্ত রীতির কয়েকটি উদাহরণ তুলছি।—

॥ । । । । ॥ । । ॥ । । ।
— ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣

(১) হাস ছি ল, স জা রু, (ব্যা করণ মা নি না),

। । । । ॥ । । । । । । । । ।
⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣

হ য়ে গে ল হাস জারু কে ম নে তা জা নিনা।

বক কহে কচ্ছপ—বাহবা কি ফুর্তি।

অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।

[আবোল তাবোল ঃ খিচুড়ি]

এখানে লক্ষণীয়, কবি সচ্ছন্দে প্রয়োজন মতো যেমন 'সজারু' শব্দে উচ্চারণ-প্রসারণ ঘটিয়ে তিনমাত্রার স্থলে চার মাত্রা দিয়েছেন, তেমনি 'বকচ্ছপ' শব্দে উচ্চারণ সংকোচন করে পাঁচমাত্রার স্থলে চার মাত্রা দিয়েছেন।– তাতে কিন্তু কবিতাটি পড়তে ছন্দের কোনও দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি।—তার কারণ, ছড়ার প্রাস্বরিক (প্রতি পর্বের প্রথমে) উচ্চারণে এই গৌণ দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গেছে।

দ্বিমাত্রিক উপযতি ভাগের (কলাবৃত্ত) ছন্দে প্রস্বর এবং কলা-প্রসারণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলছি।—

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ । ॥।
— — — — — — ⌣ —

(২) চুপ্ চুপ্ ঐ শোন! ঝুপ্ ঝুপ্ ঝ পা—স্।

চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?—গব গব্ গবা—স্।

খ্যাশ্ খ্যাশ্ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐ রে!

দুড় দাড় চুরমার ঘুম ভাঙে কইরে!

[আবোল তাবোল ঃ শব্দ কল্পদ্রুম]

এখানে, শব্দের ধ্বনি-অনুপ্রাস, রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং প্রয়োজনে রুদ্ধদলের তিন কলামাত্রার প্রসারণ ('ঝপা—স্' 'গবা স্') লক্ষণীয়।

বিচিত্র পর্বভাগের একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

(৩) আয় তোর | মু শু টা দে খি, ॥ আয় দে খি | 'ফুটো স্কোপ' দি য়ে, I
দেখি কত | ভেজালের মেকি ॥ আছে তোর | মগজের ঘিয়ে। I
কোনদিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোনদিকে থেকে যায় চাপা
কতখানি ভস্ ভস্ ঘীলু, কতখানি ঠক ঠকে ফাঁপা।

[আবোল তাবোল ঃ বিজ্ঞান শিক্ষা]

এখানে ৪।৬॥৪।৬I—পর্ব-পদ-মাত্রাভাগ এনে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

(৪) ক হ ভাই ক হ রে, ॥ অ্যাকা চোরা স হ রে
বদ্যিরা কেন কেউ ॥ আলুভাতে খায় না?
লেখা থাকে কাগজে ॥ আলু খেলে মগজে,
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে ॥ বু দ্ধি গজায় না।

[আবোল তাবোল ঃ বুড়ীর বাড়ী]

এখানেও পদের শেষ মুক্তদলে গুরু দ্বিকল উচ্চারণ দিয়েছেন,—তার ফলে কবিতাটিতে নতুন ধ্বনি-সুষমা প্রকাশ পেয়েছে।

এবারে দু-একটি দলবৃত্ত বিন্যাসরীতির উদাহরণ তুলছি। 'ভালরে ভাল' কবিতাটিতে আটদল পংক্তিবিন্যাসে এবং একই শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে ধ্বনিগত অনুপ্রাস-সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

কবি সুরু করেছেন,---

দাদাগো! দেখছি ভেবে অনেক দূর- -
এই দুনিয়ার সকল ভাল,
আসল ভাল, নকল ভাল,
সস্তা ভাল, দামীও ভাল,

এমনি 'ভাল'র দীর্ঘ ফিরিস্তি শেষে

শিমুল তুলো ধুনতে ভালো,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,

কিন্তু সবার চাইতে ভাল—
—পাউরুটি আর ঝোলাগুড়।

[আবোল তাবোল : ভালোরে ভাল]

অনুরূপ আটদল পদ ব্যবহার করতে গিয়ে, প্রতি চার পংক্তি শেষে একটি অতিরিক্ত একরুদ্ধদল শ্বাসাঘাতপ্রধান শব্দ বিন্যাসের দ্বারা পংক্তিবদ্ধ রচনা করে ছন্দে নতুনতর ধ্বনিস্পন্দ এনেছেন,—

দেখ বাবাজি দেখবি নাকি ॥ দেখরে খেলা দেখ চালাকি, ॥
ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি ॥ পড়্ পড়্ পড়্ পড়বি পাখী—ধপ্। I
লাফ দিয়ে তাই তাল্টি ঠুকে ॥ তাক করে যাই তীর ধনুকে, ॥
ছাড়ব সটান উর্ধ্বমুখে ॥ হুস ক'রে তোর লাগবে বুকে—খপ। I

অনুমান করা যেতে পারে, ছন্দের এই রুদ্ধদল-বিন্যাসে চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ ফুটিয়ে তুলতে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন। তবু সেখানেও বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তু এবং ভাবানুযায়ী লঘু পর্বযতি, প্রাস্বরিক স্পন্দন এবং রুদ্ধদল বিন্যাসের তরঙ্গ-ভঙ্গ সৃষ্টিতে কবির সূক্ষ্ম ধ্বনিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্র প্রভাব

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কবিদের মধ্যেও ছন্দের গুরুত্ব বিচারে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বিদেশী (বিশেষত ইউরোপীয়) ছন্দকে সচেতনভাবে বাংলায় আমদানীর প্রচেষ্টা খুব কম কবিই করেছেন। মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানে প্রমথ চৌধুরীর নামও সংযুক্ত হতে পারে। তাঁর কবিতা রচনার সূত্রপাত ১৯১৩-তে ভারতী এবং সাহিত্য পত্রিকায় কয়েকটি সনেট প্রকাশের মাধ্যমে। সে বছরই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রকাশিত হয়েছিল।— আর তাঁর কাব্যচর্চার সমাপ্তি হল মাত্র ছয় বছর পরে (১৯১৯) প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণ' রচনার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নতুন ছন্দের পরীক্ষার দিক থেকে এই দুটি কাব্যগ্রন্থেরই গুরুত্ব রয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী

'সনেট পঞ্চাশৎ' কবির পঞ্চাশটি সনেটের সংকলন। লেখক নিজের এ সনেট-গুলির রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন, "সনেট পঞ্চাশতের প্রতি সনেটই ফরাসী সনেটের আদর্শে লেখা। প্রথমে দুটি চৌপদী তারপর একটি দ্বিপদী তারপর আর একটি চৌপদী।" [শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৫।১১।৪১ তারিখে লেখা পত্র : 'দেশ' ১৩৬৩, সাহিত্য সংখ্যা দ্র]

ফরাসী আদর্শে সনেট রচনা

পূর্ববর্তী আর একটি চিঠিতে আরও বিশদভাবে লিখেছেন,—

"এখন আমার সনেটের জন্মকথা লিখছি!...আমি Renaud প্রভৃতি ফরাসী কবিদের পদানুসরণ করে সনেট লিখতে সুরু করি। ফরাসী কবির মণ্ডব্য সনেটের সহিত ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই প্রথম অষ্টক সমান। শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুইভাগ করেছেন। প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী। সনেটের technique বড় কঠিন, অন্ততঃ আমার পক্ষে। ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি এ formটাই নিই। ওরি মধ্যে একটু সহজ বলে।

[শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৬।১০।৪১ তারিখে লেখা পত্র : দেশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংখ্যা দ্র]

'সনেট পঞ্চাশৎ' থেকে তাঁর একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

মি

সত্যকথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি ক
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল, ... খ
কথায় কথায় যাহে নেবে আসে জল,— ... খ
আমি খুজি লোকে চোখে আনন্দের হাসি ॥ ... ক

আর আমি ভালবাসি বিদ্রুপের হাসি, ... ক
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল, ... খ
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল ... খ
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণ রাজি ॥ ... ক

হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়, ... গ
সুখ তারা দেয় নাকো তাই দুঃখ পায় ॥ ... গ

তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা, ... ঘ
সঙ্গী যারা তারা মোর মনের মানুষ। ... ঙ

হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর মমতা, ... ঘ
মনে জেনো বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুস ॥ ... ঙ

[সনেট পঞ্চাশৎ : হাসি ও কান্না]

সনেটের আঙ্গিক সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য

সনেটের বিশিষ্ট আকৃতিবন্ধ যে তার ভাবধর্মকে ফুটিয়ে তোলে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন,—

রবীন্দ্রনাথের lyric মূলতঃ গীতধর্মী, তার flow অসাধারণ। সনেট হচ্ছে আমার মতে sculpture ধর্মী—এর ভিতর উদ্দাম flow নেই যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত। সনেটের ভিতর এমন কোন তোড় নেই যা পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সনেট প্রতিমাধর্মী। অবশ্য আমি একথা বলতে চাইনা আমার প্রতি সনেট একটি প্রতিমা। কিন্তু দান্তে প্রভৃতি বড় কবিদের সনেট তাই। এবং সৌন্দর্য অনেকটা technique-এর উপর নির্ভর করে।...কবিতা বস্তুকেই আমরা আর্টের কোঠায় ফেলি। সনেটে এই আর্ট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিস।...আর্ট অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসেবে। যদি তা সত্ত্বেও আমার কবিতা হিসেবে উতরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়মের গুণে।"

[শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৬।১০।৪১ তারিখে লিখিত পত্র : দেশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংখ্যা দ্র]

ফরাসী অঙ্গিকের সনেট প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও দু-একটি ('কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত চরণ, হাসি সনেট দুটি দ্র) রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর সনেটগুলির বিশেষ প্রশংসাও করেছিলেন। তবু বলতে হয়, পেত্রাকীয় সনেটের প্রগাঢ় ভাব ও ছন্দের আবর্তন এই 'ত্রিভঙ্গ' সনেটে প্রকাশ পায় না। রবীন্দ্র-সনেটের দৃঢ়বন্ধ সংহতি-বোধও 'বীরবলী' সনেটে দেখা দেয়নি।

তের্জারিমা ও ট্রিয়োলেট রচনা

'পদচারণ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে সনেট ছাড়াও ইতালীয় তের্জারিমা (Terza Rima) এবং ফরাসী ট্রিয়োলেট (Triolet) নামক আরও দুই রীতির ইউরোপীয় ছন্দোবদ্ধ রচনা করেছেন। তের্জারিমা তিন পংক্তির স্তবকবন্ধ, প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে মিল থাকে, মিলহীন দ্বিতীয় পংক্তিটির সঙ্গে পরবর্তী স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মিল রাখতে হয়।—এই ভাবে পর পর বিনুনি বিন্যাসে (inter-lace-rhyme) ক্রমানুয়ে অগ্রসর হতে থাকে। আর ট্রিয়োলেট হচ্ছে 'কখকক কখকখ' মিলের, আট পংক্তির স্তবকবন্ধের কবিতা। এ কবিতায় ১ম, ৪র্থ, ৭ম পংক্তি অনেকাংশে

অভিন্ন থাকে, তেমনি ২য় এবং ৮ম পংক্তিতেও সাধর্ম্য রক্ষিত হয়।—এই দুই রীতির পদ্য রচনা সম্পর্কে লেখক একটি পত্রে জানিয়েছেন,—

পদচারণে...Terza Rima ও Triolet লিখতেও চেষ্টা করেছি।

: বিষয়ে কবির মন্তব্য Terza Rima যে কেন লিখতে গেলুম মনে পড়ছে না। ইংরেজি ভাষায় ও জাতের কবিতা নেই। বোধ হয় একমাত্র Browning এর The Statue of the Bust ছাড়া। আমি পরে আবিষ্কার করেছি যে Dantea Divina Comedia আগাগোড়া Terza Rima ছন্দে লেখা। যেন ও ছন্দ পয়ারের স্বগোত্র। কিন্তু আমি কথাকে ও ছন্দে লেখা অসম্ভব মনে করেছি। একটি Terza Rima লিখতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রতি তিন ছত্রের মধ্যে একছত্র unrhymed থাকে তার পরের ত্রিপদীতে তার মিল টেনে আনতে হয়। সনেট চৌদ্দ ছত্রে লিখেই খালাস কিন্তু Terza Rimaয় শেষ পযন্ত ছুটি নেই। . Triolet লেখাও কঠিন -তার পুনরুক্তির জন্য। এ দুই হচ্ছে experiment—আর এ দুই বিষয়েই আমি পাস হয়েছি। অর্থাৎ হাতের পাঁচ রেখেছি।

[শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৫।১১।৪১ তারিখে লিখিত পত্র : দেশ : ১৩৬৩ সাহিত্য সংখ্যা দ্র]

কবির তেজারিমা এবং ট্রিয়োলেট ছন্দোবন্ধের দুটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(১) তের্জারিমা : মিল

"এদিকে সুমুখে দেখি সময় সংক্ষেপ	...	ক
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,	...	খ
বণসুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।	...	ক
আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ	..	খ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্নেট,	...	গ
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।	...	খ
এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,	...	গ
কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,	...	ঘ
প্রকৃতি যাহার 'জেঠ', আকৃতি 'কনেঠ'।	...	গ

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য, ... ঘ
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী, ... ঙ
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।" ... ঘ

[পদচারণ ঃ কৈফিয়ৎ (Terza Rima ছন্দে)]

(২) ট্রিয়োলেট ঃ মিল

তোমাদের চড়া কথা শুনে ... ক
হয় যদি কাটিতে কলম্ ... খ
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে ... ক
তোমাদের চড়া কথা শুনে। ... ক
তার চেয়ে ভালো শত গুণে ... ক
দেয়া চির লেখায় অলম্, ... খ
তোমাদের চড়া কথা শুনে ... ক
হয় যদি কাটিতে কলম। ... খ

[পদচারণ ঃ সমালোচকের প্রতি] ২৭

কবি 'তের্জারিমা'তে পয়ার পংক্তি (৮ ৬ I) এবং 'ট্রিয়োলেটে' দশমাত্রিক একপদী পংক্তি ব্যবহার করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রমথ চৌধুরীর পর এই যুগে ছন্দবৈচিত্র্যের দিক থেকে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের (১৮৭১-১৯৫১) নাম করা যেতে পারে। শিল্পচর্চায় জীবন কাটালেও প্রায় প্রথম যৌবন থেকেই (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'শকুন্তলা' ঃ ১৮৯৫ জুলাই-আগস্ট) তিনি সাহিত্যচর্চা সুরু করেছেন। এবং জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও গদ্য ও পদ্যের বিশিষ্ট ছন্দোময় ভঙ্গীতে বহু বিচিত্র সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশুদের বা বড়োদের আসরে তিনি যে রূপকথা বলার ছলে গল্প শোনাতে বসেছেন তাতে ছন্দোবদ্ধ ভাষাও সার্থক সংলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। ছন্দের সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগ প্রয়োজন মতো তিনি শিথিল করেছেন, ছন্দের প্রকৃতিগত পরিবর্তন করেছেন। গদ্য ভাষাতেও ধ্বনি-অনুপ্রাস এবং মিল দিয়ে চমৎকার শ্রুতিমাধুর্য

পালাগানের দলমাত্রিক ছড়া

২৭। প্রমথ চৌধুরী সনেট পঞ্চাশতে আটটি ট্রিয়োলেট লিখেছেন। সবগুলি আঙ্গিকের দিক থেকে বিশুদ্ধ বলা চলে না। এখানে তাঁর একটি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ট্রিয়োলেটের উদাহরণ দেওয়া গেল।

এনেছেন, যাত্রার পালাধর্মী ছন্দোবদ্ধ নাটকেও তাঁর ভাষা আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। এখানে দু-একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

(১) ঘুম্‌তা ঘুমায়

ঘুমেতে ঘুমায়

রাত বিরেতে

চাঁদটা ঘুমায়;

নীলের ক্ষেতে

বাদলা ঘনায়

ঘুম্‌ ঘুম্‌ যায় গাঙের বাতাস—স্‌-স্‌...

নিশার পিদুম রাতের আকাশ—শ-শ...

এ পর্যন্ত আকৃতিবন্ধের একটি রূপ। তারপরই পদযতির কিছু পরিবর্তন করে লিখেছেন,—

হুস্‌-পরীর ধীর নিশ্বাস

থেকে থেকে উলু ঘাস—দুলায়

পোড়ো বাড়ির ভাঙা আলিসায়।

চিল ছত্তর রাজপুত্তুর ঘুমাতে ঘুমাতে কলাই চিবায়—

চিলে কোঠায়।

ভঙ্গি পরিবর্তন করে সংলাপকে আরও স্পষ্ট করে এরপরে আবার লিখেছেন,—

'ও বড়াই বুড়ি।

কয়লা ঘরে কয়লা ঝুড়ি

তাতে নড়ে কি?

দেখ দেখি!'

'নড়ে কালো বেড়ালের বাচ্চা কটি

দেখেচি দেখেচি

দেখে এসেছি!'

[অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ঃ ভূতচৌদশী, পৃ ১৯৫-৯৬]

মূলত কবি লৌকিক দলবৃত্ত রীতিই ব্যবহার করেছেন। সমগ্র কবিতায় পর্বের দলবিন্যাসে প্রয়োজন মতো এরূপ শৈথিল্য রেখেছেন। বিচিত্র অনুপ্রাস-মিলে, উচ্চারণের বাকধর্মী শিথিলতায় এ-জাতীয় কবিতাগুলিতে রূপকথার ছন্দোবদ্ধ গল্প বলার একটি

নিজস্ব ভঙ্গি কবি প্রকাশ করেছেন।

কবিতার সংলাপধর্মী ছন্দ

'চট জল্‌দী' কবিতাগুলিতে[২৮] কথ্য সংলাপ-ভঙ্গির আর একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

(২) 'সমুদ্রটা কেমন ঠেকল
চক্কোত্তি মশায়,
'যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয়।'
'হুঁকোটা নেন খুলে, কন
ধুলো পায়ে কেমন হল
সমুদ্র মজ্জন।'
'মশায় কিত্তিবাসে পড়েছিলেম
সাগর বণন –
... ...
বুঝি না কোন্ সাহসে
সাগরের এত কাছে আছেন এসে
বেঁধে বালির ঘর—
বাপ্‌রে বাপ্ কি জলের ডাক
বুঝিনা সারারাত জগন্নাথের
কি প্রকারে ঘুম হয়।
আমরা মানুষ বই তো নয়।'

এখানেও কবি লৌকিক দলবৃত্ত রীতিই ব্যবহার করেছেন। প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাস এবং সংলাপী ভঙ্গি এ পদ্যবন্ধে অনেকটা নতুন আমেজ সৃষ্টি করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্র গদ্যকবিতার ভাবাবেগ

গদ্যকবিতা: অন্ত্যমিল

না থাকলেও সে কবিতায় অনুপ্রাস মিলের নূতনত্ব আছে। যেমন—

(৩) অন্তকালে কেউ মুখে জল ঢালে
কেউ দেয় পাখার বাতাস।
কেউ চাপড়ায় আপনার গালে।

২৮। চট জলদী কবিতা সমষ্টি ১৩৪৬ ভাদ্র থেকে ১৩৪৭ ফাল্গুন পর্যন্ত নিয়মিত 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ত্রিকোটি-পতি মলো বলে—

করে কেউ হা-হুতাশ।

অন্তর্জলির কালে

পড়শিরা শুধালে—

সন্তাপন দাদা, ধনের ঘড়া কটা পুঁতে পালালে?

বেলা অসকালে, চোখ তুলে কপালে

তিন আঙুলে কি দেখালে—

বোঝা গেল কি বোঝা গেল না।

রটনা হল, তেমাথা পথে পুঁতে গেল

তিন ঘড়া সোনা

মান কচুর আড়ালে

[ঐ ঃ গজ কচ্ছপের বৃত্তান্ত ঃ পৃ ১৮২]

গদ্যভাষা রচনাতেও অবনীন্দ্রনাথ ধ্বনিমিলের এবং গতিস্পন্দের অলঙ্করণে অনতি-স্পষ্ট ছন্দোবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর অধিকাংশ গদ্যভাষায় লেখা গ্রন্থগুলিতে এই ছন্দোসৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

গদ্য ভাষার ছন্দস্পন্দ। রূপকথা রচনার চং

ঘরে-ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে-জ্বলতে, হঠাৎ একসময় দপ্ করে নিভে গেল; আর জ্বলল না— কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো দুখানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতো বৃষ্টির এক একটি ফোঁটা ঝরে পড়েছে—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর। তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে—শাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোন শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছে বুক ফাটা কান্নায়, কিন্তু কোন কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে—যে দিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেই দিকে দুই উদাস চোখ রেখে হন্ হন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে-মুখে দূরে-দূরে, অনেক দূরে— ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে — ঘরে

আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে—
চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।

[নালক ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সিগনেট সং ঃ পৃ ৩০-৩১]

নাটকেও অবনীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে লৌকিক যাত্রার পালার ঢঙে এক নতুন রীতির সংলাপ ব্যবহার করেছেন। পদ্যের ছন্দোবন্ধ সেখানেও শিথিল, গদ্যে ধ্বনি-অনুপ্রাসের ফুলঝুরি সেখানেও ঝিকমিক করছে। 'ভূতপত্রীর যাত্রা' থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি।—

নাটকের গদ্য পদ্য মিশ্র সংলাপ

মূল গায়ন দিশা। হল সন্ধিপূজা সমাপন—
গোধূলিতে গোষ্ঠে ফিরেন কৃষ্ণের গোধন ;
কৃষ্ণের মায়া বোঝা ভার,
মোহ হয় বিধাতার ;
বচ্ছরে একবার জগবন্ধুরও করতে হয়
মাসি পিসির ভবনে গমন—
অন্যে পরে কা কথা,
অবুনাথ তো সামান্য জন ;
জগন্নাথের নাটঘরে শঙ্খ বাজায়ে বলে দাস গোবর্দ্ধন ॥

অবু। কি মোয়াই খাওয়ালে মাসি অবুরে তাঁহার
চারসের পাক্কি ওজন এক্কেবারে পার ॥
যেমন কপ করে মুখে দেওয়া
' তেমন টপ করে গিলে নেওয়া,
এখন পাল্কি ছাড়া একপদ নড়া ভার।
উদ্ধব বলতে পার, পিসির ওখানে আহারাদি ব্যবস্থা কি প্রকার ?

উদ্ধব। শুনেছি দেবতা-দুর্লভ কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল সেথাকার।

অবু। চলনা তুমিও সাথে আমার।

উদ্ধব। সে গুড়ে বালি, মাসিকে শুনিয়ে দিয়েছি তোমার সেই শেখানো ছড়া—
মাসি পিসি বনগাঁবাসী—

অবু। চুপ্ চুপ্ এখনি আসবে মাসি।

উদ্ধব। বসে আর হবে কি, শোনাতেই হয়ে গেছে কানমলা।

অবু। উদ্ধব তুমি একটি গর্দভ, ঘরের দ্যালে লিখে রাখলেই হত, কানের কাছে কেন পড়া ?

উদ্ধব। কে জানে দাদা, আমি কি জানি অত লেখা পড়া।

অবু। মুস্কিল এখন মাসির সঙ্গে দেখা করা—লাঠি লণ্ঠনটা নিয়ে চট্‌পট বেরিয়ে পড়া যাক—পাল্কির জন্যে মিছে অপেক্ষা করা।

[অ, কি, সঞ্চয়ন ঃ ভূতপত্রীর যাত্রা ঃ পৃ ৭৫-৭৬]

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক'রেই তাঁর ভাষা তাঁর অসামান্য শিল্পদৃষ্টির আলোকে এক নূতন আভায় মণ্ডিত হয়েছে। তেমনি তাঁর ছন্দও খুব সাধারণ উপাদান নিয়েই অসাধারণ। খাঁটি ছড়া রচনার দক্ষতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, তাঁর বিচিত্র ছড়ায় এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ছড়ার খেয়ালি কল্পনাকে তিনি খোশখেয়ালি রূপকথার মধ্য দিয়ে খামখেয়ালী উদ্ভট পালাগান পর্যন্ত চারিয়ে নিয়েছেন। ছড়ার লৌকিক ছন্দ গদ্যছন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিল্পের জগতে যে কি অলৌকিক খেলা খেলতে পারে রূপকথা ও আত্মকথাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

[বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঃ অশোক বিজয় রাহা ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শকাব্দ, পৃ ১১০]

ইংরেজি কাব্যে হপকিন্স (G. M. Hopkins) যেমন লৌকিক ছড়ার শিথিল রূপাদর্শ (Pattern) 'স্প্রাং রিদম' (sprung rhythm) সৃষ্টি করেছেন, সাম্প্রতিক কবিতায় কবি অমিয় চক্রবর্তী যেমন শিথিল 'স্প্রাং রিদম্' জাতীয় ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, অবনীন্দ্রনাথের রূপকথা বলার ছন্দোবদ্ধ বিশিষ্ট ঢঙ্‌টিকে এই জাতীয় ছন্দেরই পূর্বাভাস রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৩৬), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১৯) এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। নবকৃষ্ণ শিশুপাঠ্য কবিতা রচনায় লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের সহজ সুষ্ঠু ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলাবৃত্ত ছন্দে বিংশ শতকে পৌঁছে অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন। ১৮৮৮-তে 'প্রচার' পত্রিকা বন্ধ হবার সময় 'শেষ' নামে যে কবিতাটি প্রচারের সবশেষ সংখ্যায় (চৈত্র ১২৯৫) প্রকাশ করেছিলেন কলাবৃত্ত ছন্দের পূর্বাভাস সেখানে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। কয়েকপংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন।
(আর) গাহেনা পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব কলিকা সনে,
মধুবতর নাহি সে আব সমীর ধীর সঞ্চরণ ॥
... ...
অমিয় স্বর-লহরে মাখি স্তবধ করি পশুপাখী
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহেনা গীত সম্মোহন।
যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন নীরে,
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীলজলে সন্তরণ ॥

[সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৮ খণ্ড (৮৩) : নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, পৃ ৩৬-৩৭]

কবিতাটি পাঁচমাত্রার পর্বভাগে রচিত। প্রত্যেক পর্বে আবার ৩+২ মাত্রাভাগে উপযতি দিয়েছেন। কবিতার প্রথম দুটি পংক্তি দ্বিপদী (৫।৫।।৫।৫।), অন্যান্য পংক্তি চৌপদী (৫।৫।।৫।৫।।৫।৫।।৫।৫।)। প্রত্যেক পংক্তিরই শেষ পদে যুক্তবর্ণ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পংক্তির মাঝে যুক্তবর্ণ ব্যবহারে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সে কারণেই 'স্তব্ধ' না লিখে 'স্তবধ' লিখেছেন, 'জ্যোৎস্না' বা 'ঊর্ধ' না লিখে যথাক্রমে 'জোছনা' বা 'উরধ' লিখেছেন। পর্বভাগ সর্বত্রই নিখুঁত (৩ : ২) হয়েছে, কেবল একটি ক্ষেত্রে পাঁচ মাত্রার পরিবতে চারমাত্রার (এখানে উদ্ধৃত তৃতীয় পংক্তির 'পশুপাখী' পর্ব দ্র) সমাবেশে ছন্দ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিমধ্যেই কড়ি ও কোমলের (১৮৮৬) দু একটি কবিতায় এবং মানসীর 'ভুলভাঙা' (১৮৮৭) কবিতায় যুক্তাক্ষর সমন্বিত কলাবৃত্ত রীতির কবিতা রচনা সুরু করেছেন। তবে সে যুগে অন্য কোনও কবিই কলাবৃত্ত রীতিতে যুক্তাক্ষরের দ্বিমাত্রিক ব্যবহার-রহস্য ধরতে পারেননি,—সেদিক থেকে নবকৃষ্ণের 'শেষ' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

নবকৃষ্ণ শিশুপাঠ্য কবিতায় লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন তারও দু একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। –

(১) বর্ষা গেলো আকাশ ধুয়ে, ফর্সা হলো দিক্।
কেঁদে কেটে হেসে ধরা উঠলো যেন ঠিক ॥
সকাল বেলা চারিদিকে, শিশির ভেজা ঘাস।
শিউলি তলা ছেয়ে পড়ে শিউলি ফুলের রাশ ॥

[সা, সা, চ, ৮ম খণ্ড (৮৩) : আগমনী : পৃ ৪৩]

(২) নদীর তীরে শ্যামল তরু পাশে সবুজ মাঠ।
বসুমতীর বক্ষে যেন শোভে শোভার হাট॥
অযোধ্যা নগরী ছিল এই সরযূর তীরে।
শোভা কি তার! দেখলে পরে নয়ন নাহি ফিরে॥

[ঐ ঃ টুকটুকে রামায়ণ ঃ পৃ ৪৩]

রজনীকান্ত সেন

কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫–১৯১৯) প্রধানত সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে বাণী (১৯০২) এবং কল্যাণী (১৯০৫) সমধিক খ্যাত। কবিতা-গানে প্রধান তিনটি রীতির ছন্দ তিনি নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এখানে তাঁর কলাবৃত্ত সাতমাত্রা পর্বভাগের একটি এবং দলবৃত্ত (একটি আঞ্চলিক কথ্যভাষার নিখুঁত প্রয়োগ দৃষ্টান্ত) ছন্দে রচিত আর একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।–

(১) কলাবৃত্ত ঃ সাত মাত্রা (৩ ঃ ৪) পর্বভাগ ঃ

স্নেহ বিহবল করুণা ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগিরে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে,
অবশ কৃশতনু মলিন অনশনে;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা তাপ ভুলি,
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে। [বাণী ঃ মা]

মাঝে মাঝে কবি যুক্তদল স্বরধ্বনির দীর্ঘ দ্বিমাত্রক (যেমন 'স্নেহ বিহবল') উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য গানে এরূপ প্রয়োগ অনেকেই করেছেন। এ ছন্দে যুক্তদল ব্যবহারে কবির দ্বিধা ছিলনা তার পরিচয় প্রায় প্রতি পংক্তিতেই পাওয়া যায়। সাত মাত্রার পর্বে কবি প্রায় সর্বত্রই ৩+৪ মাত্রাভাগে উপযতি স্থাপন করেছেন; তাতেও ছন্দের ধ্বনি-সৌষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

দলবৃত্ত ছন্দে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ

(২) দলবৃত্ত ঃ আঞ্চলিক কথ্যভাষায় লিখিত ঃ

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিছি পায়;
তোমার লাগে কেম্‌নে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌ছে দায়।

আর্‌সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায় ?
বেলোয়ারী-চুরি দিচি, পাছা-পাইর‍্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর‍্যা দিবার লাগচ্ গায় ।
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা ?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি ফায় ।
বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোর্‌চ পাগল ?
যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যামতে ?
কৈয়্যা দ্যাও আমায় । [কল্যাণী : বুড়ো বাঙ্গাল

লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ আঞ্চলিক কথ্য বাচনভঙ্গির পক্ষে কত উপযুক্ত, আলোচ্য গানটি তার একটি সার্থক নিদর্শন। রজনীকান্ত এখানে চতুর্দল পর্বভাগের সুনির্দিষ্টত প্রত্যেক পূর্ণ পর্বেই রক্ষা করেছেন, সেই সঙ্গে চল্‌তি ভাষার আমেজও পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে। বাংলা দলবৃত্ত ছন্দের দিক থেকে আলোচ্য গানটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'মদনভস্মের পরে' (কল্পনা) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত রীতির পঞ্চমাত্রক পর্বে (৫।৫।৫। ৪॥৫।৫।৩।) রচনা করেছেন। অনুরূপ ছন্দোবন্ধে যতীন্দ্রমোহনও লিখেছেন,—

প্রলয় জলে | মগ্ন করি | দহিয়া মহা | খাণ্ডবে ॥
বিশ্ব নাকি | লুপ্ত করো | হেলাতে, ।
অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি' নৃত্য করো তাণ্ডবে—
তোমার সুখ—রুদ্র, সেই খেলাতে ।

[কাব্যমালঞ্চ : শিবসপ্তক

তিনমাত্রার চলন

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ তিনমাত্রার শব্দকে কলাবৃত্ত ছন্দে বিশে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধটিতে (ছন্দ পৃ ৮২-১১৫ দ্র) 'নয়- মাত্রা চাল' সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনায়, ছন্দের একটি গতিসঞ্চার পদবন্ধ হিসাবে ৩ : ৩ : ৩ মাত্রার শব্দবিন্যাসে রীতি উদাহরণ তুলেছেন। যতীন্দ্রমোহনও অনুরূপ নয়মাত্রার (৩ : ৩ : ৩ :) পদবন্ধ রচনা করেছেন।—

শ্যালের শ্যামল ছায়ায়
শীতের বাদল হাওয়ায়—

দিবস আজিকে ঘুমায়
মেঘের মৃদং শুনে।
আজ দুপুর হতেই রজনী
শ্রাবণ মেঘের গুণে। [কাব্যমালঞ্চ ঃ শ্রাবণে]

৮॥৬। মাত্রার পদবিন্যাসে কলাবৃত্তের দৃষ্টান্ত সমগ্র বাংলা কাব্যে খুব বেশী মিলবে না। দ্বিমাত্রিক অতিপর্বের স্পন্দন সহ, সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগের শব্দবিন্যাসে যতীন্দ্রমোহন সেরূপ ছন্দ রচনা করেছেন।—এখানেও রবীন্দ্রনাথের ত্রিমাত্রক ছন্দের প্রভাব লক্ষণীয়।—

আমি নষ্টক পাথর গাঁথা সিংহদুয়ার—
যেথা লোহার ফটকে রুধে পথের জুয়ার। [কাব্যমালঞ্চ ঃ খিড়কী]

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির অনুকারক বেশী নেই। যতীন্দ্রমোহন ত্রিপদীবন্ধে এই ছন্দ অল্পসল্প ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক রীতির প্রয়োগ

— ◡ — ◡ ◡◡— — — — ◡— ◡◡
গ্রামে একটা বড় বটগাছ ভৈরব নদীর ধারে ৮॥৬॥
— ◡ — — —
ছাতরা বট তার নাম ৫।
ছাতার মতন পাতায় ছাওয়া, তলায় সারে সারে
হাজার ঝুড়ির থাম।
[কাব্যমালঞ্চ ঃ মালোর মেয়ে]

এখানে কবি পদস্পন্দন অনেকাংশে বিলুপ্ত করে বাকধর্মী রচনাভঙ্গী ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তবু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনারীতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি মনে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব

সত্যেন্দ্রনাথের মতো রুদ্ধদলের ধ্বনি-অনুপ্রাস, প্রাস্বরিকতা এবং লঘু পদযতির স্পন্দন এনেছেন।—

ঝরঝর ঝরণা গিরিঘর করনা—
জলজল উজ্জল যেন কালো কজ্জল,
কভু শাদা ধব্‌ধব্‌ তুষারের উদ্ভব,
... ...
গদ্‌ গদ্‌ গদ্‌ গদ্‌ চলে ফের তদ্বৎ,
বুদ্‌ বুদ্‌ বুদ্‌ বুদ্‌ কেটে চলে বুদ্বুদ,

কল-কল তল-তল আঁখি দেখি ছল-ছল,
চোখে বুঝি আসে জল—বল্ বল্ ঠিক বল্।

[কাব্য মালঞ্চ : ঝরণা ঝারা]

আলোচ্য যুগে প্রচলিত প্রধানতম ছন্দপ্রকৃতিগুলি যতীন্দ্রমোহন নিপুণভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। কথ্যভাষার স্বাভাবিক সংলাপভঙ্গিও তিনি ছন্দের মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির একটি উদাহরণ তুলছি।—

দলবৃত্ত ছন্দে চমৎকারিত্ব

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
আস্তে একটু চলনা, ঠাকুর ঝি—
ওমা, এযে ঝরা বকুল!—নয়?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে—
আকাশ পাতাল—কতই মনে হয়!

[কাব্যমালঞ্চ : অন্ধবধূ]

কলাবৃত্ত রীতিতে সাতমাত্রা পর্বভাগে, দ্বিপদী ও চৌপদী মিশ্রিত স্তবকবন্ধে যতীন্দ্রমোহন প্রায় প্রতি পর্বের সূচনায় রুদ্ধদল ব্যবহারের দ্বারা চমৎকার ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

রুদ্ধদল স্পন্দন

ক্ষুদ্র জীবনের মুগ্ধ খেলা হেরি রুদ্রদেব বুঝি হাসে,
দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্রে রূপধারী ঊর্ধে ফুটে নীলাকাশে।
সংখ্যাতীত জীব পঙ্কে মাথা কুটে,
উপরে নাকি তারি শূন্যে ফুল ফুটে!
নামিছে লীলা হেরি ভক্ত করপুটে, চক্ষু ধারাজলে ভাসে।

[কাব্যমালঞ্চ : লীলা]

যতীন্দ্রমোহন লৌকিক দলবৃত্তে মুক্তক এবং মিশ্র কলাবৃত্তে প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন। মৌলিক কোনও ছন্দোরীতি উদ্ভাবন না করলেও তৎকালীন প্রচলিত ছন্দগুলির নিপুণ প্রয়োগে তিনি সফল হয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

আলোচিত যুগের বৈশিষ্ট্য

এবারে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে পুনর্বার উল্লেখ করে বর্তমান অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে।—

(১) এই যুগে রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রিক রীতির বিশ্লিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে বিচিত্রধর্মী প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যতিবিভাগ, ধ্বনিস্পন্দ এবং মিল-বিন্যাসে বিশ্লিষ্ট রীতির অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। বলাকার কয়েকটি এবং পলাতকার সমস্ত কবিতায় সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘপদযতি কবিতার ভাবগাম্ভীর্য পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে।

(২) মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান পয়ারবন্ধের সনেট রচনায় এইযুগে রবীন্দ্রনাথ (নৈবেদ্য, স্মরণ এবং উৎসর্গ কাব্যে) ভাব ও ছন্দোবন্ধের দিক থেকে আরও স্বাধীন এবং পরিণত রচনারীতির পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতিতে সমিল মুক্তক (বলাকা এবং পলাতকা কাব্য দ্র) রচনা করে তিনি ছন্দে ভাবমুক্তির ধারাকে আরও প্রসারিত করেছেন।

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল এই যুগে বাংলা কাব্যে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্তের একটি নতুন ছন্দোরীতি (আলেখ্য দ্র) প্রবর্তন করেছেন। দীর্ঘ পদভাগে পর্বযতি-স্পন্দ সম্পূর্ণ লুপ্ত করে তিনি এ-ছন্দে দৃঢ়, সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের নতুন প্রকাশভঙ্গি পরিস্ফুট করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছন্দোদ্ভূত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের রীতি ভিন্নতর, মহিমান্বিত গম্ভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে আরও উপযোগী।

(৫) দ্বিজেন্দ্রলাল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান দীর্ঘপদী পংক্তি-বিন্যাসে, মুক্তক রচনায়, বিচিত্র স্তবক রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

(৬) তিনি বাকধর্মী স্বাভাবিক উচ্চারণ পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে মিশ্র উচ্চারণ-রীতির ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

(৭) যুক্তাক্ষর-বহুল কলাবৃত্ত রীতিতে তিনি অনেকগুলি গান লিখেছেন। একটি কবিতায় এ-ছন্দের প্রবহমান প্রয়োগরীতির আংশিক আভাষ ফুটে উঠেছে।

(৮) দ্বিজেন্দ্রলাল রুদ্ধদলবহুল চলিতভাষা ব্যবহারের দিকেই বেশী লক্ষ রেখেছিলেন। তিনি একাধারে সংগীতকার, কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তার ফলে কাব্যের ভাষা কখনও সংগীতের সুরাশ্রয়ী হয়েছে, কখনো বা অতিরিক্ত সংলাপ-প্রধান হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দোবন্ধের শৈথিল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছন্দ ও ভাবের বিরোধ তাঁর কাব্য-পঠনে পাঠকের কাছে একটি বাধা-স্বরূপ মনে হয়।

(৯) দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রথম কয়েকটি নাটকে মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ছন্দোবন্ধ ভাষা নাট্যসংলাপে অনুপযোগী মনে করে পরে এ রীতি প্রায় ত্যাগ করেছিলেন।

(১০) বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ বিষয়ে এযুগেও অনেকেই পরীক্ষা চালিয়েছেন। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধ এবং অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছন্দোবন্ধে সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ আনতে চেয়েছেন। বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী গুরুস্বরধ্বনি প্রয়োগে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। বিজয়চন্দ্র রবীন্দ্র-রীতিতে সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

(১১) হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী দীর্ঘ স্বরধ্বনি বর্জন করে রুদ্ধ ও মুক্তদলের সাহায্যে সংস্কৃত গুরু ও লঘু উচ্চারণের ধারাবাহিকতা রাখতে চেষ্টা করেছেন। তবে শব্দপ্রান্তিক কৃত্রিম স্বরান্ত উচ্চারণ এবং পদে পদে ভাবযতি ও ছন্দযতির বিরোধ তাঁর প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি।

(১২) এই যুগের রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছেন। হরগোবিন্দের পদ্ধতি অনুসরণে রুদ্ধ-মুক্ত দল-বিন্যাসের দ্বারা বাংলায় সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের লঘুগুরু সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসরীতি তিনিও প্রয়োগ করেছেন, কৃত্রিম গুরু স্বরধ্বনির সংস্কৃতানুগ প্রয়োগ তিনিও বর্জন করেছেন। তবে হরগোবিন্দের ছন্দের দুটি প্রধান দুর্বলতা,—শব্দ প্রান্তিক রুদ্ধদলের কৃত্রিম স্বরান্ত উচ্চারণ ও ছন্দযতির বিরোধ—সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের বাংলা রূপায়ণে এতদিনের কৃত্রিম উচ্চারণ কাটিয়ে উঠেছেন সত্য, তবু সে ছন্দের পূর্ণ আমেজ বাংলায় আনতে পারেননি। কারণ, প্রথমত বাংলায় মুক্তদল-স্বরধ্বনির গুরু বা দীর্ঘ উচ্চারণ নেই; দ্বিতীয়ত, কলাবৃত্ত বা লৌকিক দলবৃত্ত যে দুটি রীতিতে তিনি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের পরীক্ষা করেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই লঘু যতি সুস্পষ্ট প্রাধান্য পায়,— সংস্কৃত দীর্ঘ তরঙ্গায়িত ছন্দোবন্ধের পক্ষে এমন লঘু যতি আদৌ অনুকূল নয়।

(১৩) সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-প্রকৃতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও রুদ্ধমুক্ত দলবিন্যাস এবং প্রাস্বরিক উচ্চারণের সাহায্যে ইংরেজি ও অন্যান্য বিজাতীয় ছন্দের আভাস বাংলায় পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন।

(১৪) তিনি রুদ্ধ-মুক্ত দলের স্পন্দমান প্রয়োগধর্মে, পর্ব-উপপর্বের যতিভাগে উচ্চারণ প্রাস্বরিকতায় এবং বিচিত্র মিলবিন্যাসে বাংলা ছন্দের অলঙ্করণ-ঐশ্বর্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেছেন।

(১৫) কবি সুকুমার রায় কিশোর পাঠ্য কবিতায় কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগধর্মে ছন্দের মিল ও ধ্বনিস্পন্দের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তুলেছেন।

(১৬) প্রমথ চৌধুরী ফরাসী রীতির সনেট, ট্রিয়োলেট এবং ইতালীয় তের্জারিমা ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনে বাংলা ছন্দের সীমান্ত আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

(১৭) শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পদ্য এবং গদ্য উভয় রচনায় ভাষাকে এক বিশেষ রীতিতে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। পদ্যে সংলাপ ফোটাতে গিয়ে উচ্চারণে শৈথিল্য রেখে প্রাকৃত ছড়াগানের আদর্শ রক্ষা করেছেন। গদ্যকবিতায় অনুপ্রাস মিলের নূতনত্ব এনেছেন। নাটকের সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে এবং মিল-অনুপ্রাসের ফুলঝুরিতে ছন্দ ও ধ্বনির সমৃদ্ধি এনেছেন।

(১৮) অপেক্ষাকৃত অপ্রধান রবীন্দ্রানুগ কবিদের মধ্যেও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কলাবৃত্ত ছন্দের প্রাথমিক প্রয়োগে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রজনীকান্ত সেন দলবৃত্ত ছন্দে আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী রবীন্দ্র-মুক্তক রচনায় এবং ছন্দে বাক্‌ধর্মী ভাষাবিন্যাসে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র যুগ : অন্ত্যপর্ব (১৯১৮-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সজনীকান্ত, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, দিলীপকুমার প্রভৃতি।

॥ ক ॥

ছন্দ বিচারে এই পর্বকে রবীন্দ্র-যুগের অন্ত্যপর্ব বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী দুটি পর্বের (রবীন্দ্র-যুগ : আদিপর্ব, রবীন্দ্র-যুগ : মধ্যপর্ব,) ক্রম অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ যুগেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে নতুন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন।[১] পূর্ববর্তী যুগে প্রবর্তিত সমিল ও অমিল দলবৃত্ত মুক্তক এ যুগে আরও পরিণতভাবে ব্যবহার করেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক অর্ধশতাব্দী কাল পরে অমিল পংক্তিবন্ধে আরও সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় পুনবার ব্যবহার করেছেন। শিশুপাঠ্য কবিতায় লঘু যতিভঙ্গে প্রস্বর এবং রুদ্ধদলের ধ্বনি-তরঙ্গ এনে সত্যেন্দ্রনাথ-, নজরুল এবং সুকুমার রায়-অনুশীলিত এই বিশিষ্ট ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সর্বোপরি, ছন্দে ভাবমুক্তির যে বিপ্লবী ধারা মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' এবং রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের মুক্তক রচনাপথে ক্রমানুয়ে এগিয়ে চলছিল, আলোচ্য যুগে নব-প্রবর্তিত গদ্য-কবিতার ছন্দে সেই ধারা পরিণতি লাভ করেছে বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্র অন্ত্যপর্বের বৈশিষ্ট্য

১। এই যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশ কাল : পলাতকা ১৯১৮, শিশু ভোলানাথ ১৯২২, লিপিকা ১৯২২, পূরবী ১৯২৫, লেখন ১৯২৭, মহুয়া ১৯২৯, বনবাণী ১৯৩১, পরিশেষ ১৯৩২, পুনশ্চ ১৯৩২, বিচিত্রিতা ১৯৩৩, শেষ সপ্তক ১৯৩৫, বীথিকা ১৯৩৫, পত্রপুট ১৯৩৬, শ্যামলী ১৯৩৬, খাপছাড়া ১৯৩৭, ছড়ার ছবি ১৯৩৭, প্রান্তিক ১৯৩৮, সেঁজুতি ১৯৩৮, প্রহাসিনী ১৯৩৯, আকাশ প্রদীপ ১৯৩৯, নব জাতক ১৯৪০, সানাই ১৯৪ , রোগশয্যায় ১৯৪০, আরোগ্য ১৯৪১, জন্মদিনে ১৯৪১ শেষলেখা ১৯৪২।

রবীন্দ্রনাথের পর আলোচ্য যুগের বাংলা পদ্য-ছন্দে একাধিক কবি বা ছন্দ-জিজ্ঞাসুর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫০), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৫০) এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৫০) 'রবীন্দ্র যুগ ঃ আদি ও মধ্যপর্বে'র ধারাকেই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৪) 'রবীন্দ্র যুগ ঃ মধ্যপর্বের কলাবৃত্ত ছন্দরীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কলাবৃত্ত রীতির দীর্ঘ পদ-পংক্তি-বিন্যাসের সাহায্যে ছন্দে ভাবমুক্তির ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৫০) এক দুর্বার ভাবোচ্ছ্বাসকে বৈচিত্র্যময় ছন্দস্পন্দে প্রকাশ করেছেন; সংস্কৃত ছন্দের কবিতায় তিনি অনেকাংশে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবর্তী হয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৫০) আঙ্গিক-সচেতন এবং দৃঢ় ছন্দোবন্ধের অনুরাগী ছিলেন। ভিন্নধর্মী দুই রীতিতে উভয়েই শব্দের সুমিত সাবধানী প্রয়োগে এবং স্তবক রচনায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১) ছন্দমুক্তির ধারায় 'স্প্রাং রিদম্' এবং বিদেশীয় অন্যান্য ছন্দরীতির পরীক্ষায় নতনত্ব দেখিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) রবীন্দ্র-ছন্দমুক্তি-ধারারই অনুসরণে দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের (১৯০৪) 'লিমেরিক', 'ক্লেরিহিউ' প্রভৃতি পাশ্চাত্য রূপাদর্শের ছড়া রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয়। ছন্দসচেতন সজনীকান্ত (১৯০০-১৯৫০) স্বরচিত উদাহরণ-সাহায্যে বাংলা ছন্দের ক্রমবিবর্তন যেভাবে ফুটিয়েছেন তারও চমৎকারিত্ব কম নয়। রবীন্দ্র-অন্ত্য পর্বের নবীন কবিগোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধদেব বসুও (১৯০৮-১৯৫০) বাকধর্মী উচ্চারণ প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা চালিয়েছেন।—এই কবিগোষ্ঠীকেই রবীন্দ্র-অন্ত্যপর্বের উত্তরসূরী বলা যেতে পারে। আরও নবীন এক কবিগোষ্ঠী আবার এঁদের অনুবর্তী হয়েছেন। অষ্টম অধ্যায়ে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রভাবিত ছন্দের পরীক্ষা এযুগেও চলেছে। কবি-সংগীতকার দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭) লঘু-গুরু সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলা পদ্যে পুনঃপ্রবর্তনে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিয়েছেন। আলোচ্য যুগের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল এবং দিলীপকুমার ছন্দরীতি-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কবি কালিদাস রায় বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে, বিশেষ করে বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন (দ্র প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য)। ছন্দ-আঙ্গিকের আলোচনায় এযুগের কবিদের প্রবণতা লক্ষ্য করবার বিষয়।

এ যুগের অন্যান্য কবিগণ

॥ খ ॥

রবীন্দ্রনাথ (অন্ত্যপর্ব)

দ্বিজেন্দ্রলাল সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক রীতির ছন্দ যতটা সংবদ্ধ ভাবে ব্যবহা: করেছেন রবীন্দ্রনাথের হাতে সে তুলনায় এ ছন্দ অনেকা শিথিলবদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, ইতিপূর্বেই সে বিষয় আলোচনা করেছি। পূর্ববর্তী যুগে 'বলাকা' কাব্যে তিনি প্র কলাবৃত্ত রীতির মুক্তক লিখতে সুরু করেন। আলোচ্য যুগের 'পলাতক কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তক ছন্দে লিখিত হয়েছে আরও পরিণত জীবনে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে (১৩৯৩) কবি সর্বপ্রথম দলবৃত্ত রীতি অমিল মুক্তক লিখেছেন। তাঁর প্রথম লেখা এই রীতির কবিতা 'ছুটি' থেকে কয়ে পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত মুক্তক (অমিল)

দাও না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন খানে।
যেখানে ওই শিরীষ বনের গন্ধ পথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ ভাসে ঐ সুদূরতা,—
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে,
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে—
শূন্য ঘরে অতীতস্মৃতি গুণগুণিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদল রাতে। [পুনশ্চ : ছুটি

'পুনশ্চে'র 'গানের বাসা' এবং 'পয়লা আশ্বিন' কবিতা দুটিও এই রীতিতে লেখা রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রিক অমিল মুক্তক বেশী লেখেন নি। —সম্ভবত তার কারণ হ মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অমিল মুক্তকের দীর্ঘ পদভাগে, ভাবমুক্তি যতটা স্বাচ্ছন্দ্য : করে, ঘন ঘন যতিপতনের ফলে দলমাত্রিকে সেই 'লম্বা নিঃশ্বাসের দীর্ঘ ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয় না। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত সংশ্লিষ্ট দলমাত্রি দীর্ঘ পদভাগই স্বাভাবিক রীতি; এবং সেখানে উচ্চারণ দ্রুততা ও ভাবের প্রবহমান:

আরও বেশী পরিস্ফুট হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দলমাত্রিকের এই বিশিষ্ট রীতিটি গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্র-আদর্শে সংশ্লিষ্ট দলমাত্রিক অমিল (বা সমিল) মুক্তক এই যুগে অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন।

মুক্তক রচনার ক্ষেত্রে বলা যায়, যদি ভাবমুক্তিই মুক্তকের প্রধান লক্ষ্য থাকে—তবে পংক্তিশেষে মিল দেবার বাধ্যবাধকতা না থাকলেই কবি আরও স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বহু সময়ে ভাবের প্রবহমানতার প্রতি কিছুটা উপেক্ষা দেখিয়ে পংক্তি-মিলের অনুরোধে মুক্তকে কৃত্রিমভাবে পংক্তি-বিন্যাস করতে হয়েছে। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দলবৃত্ত—তিন রীতিতেই মিলের অনুরোধে পংক্তিবিন্যাসের এই দুর্বলতা লক্ষ করা যায়।—এটি মুক্তকের আদর্শ-বিরোধী।

দূরান্বিত মিলের কবিতা

দূরান্বিত মিল দিয়ে, মাঝে মাঝে অমিল পংক্তিবিন্যাসে কবি এ যুগে কিছু কবিতা লিখেছেন। 'সেঁজুতি'র 'যাবার মুখে' বা 'সানাই'-এর 'উদ্‌বৃত্ত' এই শ্রেণীর কবিতা। পরবর্তী একাধিক কবি এ রীতি গ্রহণ করেছেন। এটি বোধহয় মিলের একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি-লাভের প্রয়াস।

মিশ্রবৃত্ত রীতির অমিল মুক্তক

প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পরে রবীন্দ্রনাথ এ যুগে মিশ্রবৃত্ত রীতির অমিল মুক্তক লিখেছেন। এ প্রচেষ্টা প্রথম ১২৮৭-তে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় করেছিলেন। এ যুগে এই শ্রেণীর প্রথম কবিতা 'অগোচর' (পরিশেষ—১৩৩৯)।

একই কবিতায় একাধিক ছন্দরীতির ব্যবহার

এযুগে কয়েকটি কবিতায় কবি এক কবিতার বিভিন্ন স্তবক বিভিন্ন ছন্দ-প্রকৃতি বা ছন্দের আকৃতিতে লিখেছেন। 'আশা', 'ঝড়', 'আক্রন্দ', 'চিঠি',—পূরবীর এই কবিতা চতুষ্টয়ের নাম করা যেতে পারে। বৈচিত্র্যলোভী নবীন কোনও কোনও কবি এ রীতিও অনুসরণ করেছেন।

শিশুপাঠ্য কবিতার ছন্দবৈচিত্র্য

শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি এবং ছড়া—এই যুগের চারটি শিশুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থে কবি অতিপর্ব ও রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং মিলের ফুলঝরি এনে, লঘুতর যতিভঙ্গের পদক্ষেপে ছড়া জাতীয় রচনার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুলের সমধর্মী বলা যেতে পারে।

এ যুগের বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন হল গদ্যকবিতার ছন্দ। বাংলা ছন্দে ভাবপ্রবহমানতার ক্রম-মুক্তির ধারায় গদ্যকবিতার ছন্দকে সর্বশেষ স্তর বলা চলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে বহু সমলোচকই বিভিন্ন সময়ে এ ছন্দের মূল রহস্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।—'অতিনিরূপিত' মাত্রা গণনার সুনির্দিষ্ট হিসাবে যে এ ছন্দের নিয়ম বাঁধা চলেনা সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। ছন্দের সুনির্দিষ্ট মাত্রার হিসাব না মিললেও কিছুটা আভাস, কিছুটা গতি ও যতির স্পন্দমানতা যে গদ্য কবিতার শব্দ-বিন্যাসে রক্ষিত হয় সেকথা বোঝাতে গিয়েই ছান্দসিক একে 'ছন্দগন্ধি গদ্য' (rhythmic prose) বলেছেন। গদ্যকবিতারও পদ্যের মতোই একটি গতি-বেগ রয়েছে, প্রত্যাশিত বাকপর্বের বিন্যাসে যতি রয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটি লক্ষ করেছিলেন।

গদ্য কবিতার ছন্দ

ছন্দবোধ মূলত কিসের উপর নির্ভরশীল,—এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আই. এ. রিচার্ডস বলেছেন, Rbythm depends upon repetition and expectancy (Principles of Literary Criticism. P.134)—এখানে গদ্যকবিতার ছন্দে সেই আবর্তন (repetition) এবং প্রত্যাশাবোধ (expectancy) কোথায় কি ভাবে কাজ করছে সেটি লক্ষনীয়। রিচার্ডস তার Principles of Literary Criticism গ্রন্থে Rhythm and Metre—নামক প্রবন্ধটিতে যে আলোচনা করেছেন (উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাতে পদ্য কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। গদ্য কবিতায়, (১) শব্দধ্বনির গতি ও যতির আবর্তনজনিত প্রত্যাশাবোধের তৃপ্তি রয়েছে, (২) ভাবের প্রত্যাশিত স্পন্দমানতা রয়েছে, (৩) বাক্‌পর্বের প্রত্যাশিত বিন্যাস রয়েছে।—এগুলির সমন্বয়ে গদ্যকবিতার রূপাদর্শ গড়ে উঠেছে।

গদ্য কবিতাব ছন্দবৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলায় অনুরূপ গদ্যকবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় সে কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা এবং ইংরেজি শব্দ উচ্চারণে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজি শব্দে প্রাস্বরিক ও অপ্রাস্বরিক দলবিন্যাস সুনির্দিষ্ট। বাংলা শব্দে ভাবগত গুরুত্ব আনতে হলে অনেক সময় জোর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রাস্বরিক উচ্চারণ চলেনা।—শব্দগুচ্ছকে বাংলা গদ্যকবিতায়ও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তবে ভাবগত স্বাধীনতা এখানে 'অতিনিরূপিত' মাত্রাগণনার ছন্দ থেকে অনেক বেশী। শব্দগুচ্ছকে ভাবানুযায়ী পদভাগে সাজাতে গিয়ে পাঠকমনের তৃপ্তিবোধ সম্পর্কে কবিকে অবহিত থাকতে

হয়। সুখকর তৃপ্তিবোধ ভাব এবং ধ্বনিস্পন্দের মাধ্যমে জাগে, গদ্যকবিতার বাক্‌পর্ব রচনায় এ সম্পর্কে কবিকে সচেতন হতে হয়।২ রবীন্দ্রনাথ লিপিকার গদ্যকবিতা লিখবার সময়ে ভাবগুচ্ছ অনুযায়ী পংক্তিবিন্যাস করেননি। পরে পুনশ্চের গদ্য-কবিতাগুলি রচনার সময়ে মুক্তকের মতোই ভাবানুযায়ী ছোট-বড়ো পংক্তি-বিন্যাসে বাক্‌পর্বগুলিকে সাজিয়েছেন। মধুসূদন ভাবকে পয়ার পংক্তির সীমা পেরিয়ে চলবার শক্তি দিয়েছিলেন,—মুক্তক ছন্দে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পয়ার পংক্তির দৈর্ঘ্যসীমা ভেঙে ভাবানুযায়ী ছোট-বড়ো করেছেন। অতিনিরূপিত ছন্দের পদক্ষেপ এখানে ক্রমানুয়ে ভাবের অনুগামী হতে বাধ্য হচ্ছিল। গদ্য কবিতার ছন্দে এসে ভাব আরও মুক্ত হতে পারল, ছন্দের অতিনিরূপিত মাত্রাবিভাগের বোঝা এবারে হাল্‌কা হল,—যতি ও ধ্বনিস্পন্দনের ভাবনিয়ন্ত্রিত অনুভূতিকে সহায় করে এবারে সে আরও স্বচ্ছন্দে চলবার স্বাধীনতা পেল। গদ্যকবিতার ছন্দ প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে পারে।—

আজ এই বাদলার দিন,
        এ মেঘদূতের দিন নয়।
  এ দিন অচলতায় বাঁধা।
        মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
  টিপিটিপি বৃষ্টি
        ঘোমটার মতো পড়ে আছে
          দিনের মুখের উপর।
          সময়ে যেন স্রোত নেই
    চারিদিকে অবারিত আকাশ
          অচঞ্চল অবসর। [পুনশ্চ ঃ বিচ্ছেদ]

২। অতিনিরূপিত মাত্রাগণনার নিয়মে পাঠকমনে সর্বদা ছন্দবোধ জাগে এমনটি মনে করা সঙ্গত নয়। পাঠক যে ধ্বনিস্পন্দের আবর্তন প্রত্যাশা করেন যদি সে তুলনায় দুরান্বিত যতি বা মিলের বিন্যাস ঘটে তাতে তৃপ্তি পেতে পারেননা। সংস্কৃতে এমন অনেক ছন্দ লক্ষিত হয়। –অপরপক্ষে অতিনিরূপিত মাত্রা গণনার হিসাবে রচিত না হলেও যতি বা ধ্বনিস্পন্দের আবর্তন যদি সবলভাবে অন্বিত থাকে তার ছন্দগত আবেদন পাঠক মনে অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। গদ্যকবিতায় কবি এই অনতিনিরূপিত মাত্রার প্রত্যাশিত যতিস্পন্দ ও ধ্বনিস্পন্দ রক্ষা করেন, ভাবের মুক্তিসাধন করেও এই সুখকর ধ্বনিগত প্রত্যাশাবোধকে তিনি তৃপ্ত করেন,—তারই ফলে কবির এবং পাঠকের মনে গদ্যকবিতার ছন্দস্পন্দ উদ্রিক্ত হতে পারে।

গতি এবং যতির আবর্তন-জনিত একটি সুখকর অনুভূতি এখানে সহজ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ; ভাব এখানে প্রধান, ছন্দ তার অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কিছুটা তাঁর থেকে স্বকীয়তা রেখে নবীন কবিগোষ্ঠী গদ্যকবিতার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই মৌলিকতার আলোকে এবারে আলোচ্য যুগের অন্যান্য কবিদের ছন্দ-বৈচিত্র্য বিচার করা যেতে পারে।

॥ খ ॥

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫০), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৫০) এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৫০) পদ্যরচনায় প্রধানত রবীন্দ্র আদি ও মধ্য পর্বের ছন্দরীতিকেই অনুসরণ করেছেন। তিনজন কবিই সমিল যতিপ্রান্তিক ছন্দোবন্ধ পছন্দ করতেন। অতিপর্বিক দোলা, রুদ্ধদলের স্পন্দন এবং বিচিত্র যতিভাগের পর্ব-পদ রচনা-রীতি তাঁদের ছন্দে রবীন্দ্র-(এবং আংশিকভাবে সত্যেন্দ্র-) প্রভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণানিধানের ছন্দ সম্পর্কে বলা চলে,

(১) তিনি প্রধানত কলাবৃত্ত ছন্দই বেশী পছন্দ করতেন ; এখানেও ছয়মাত্রা পর্বভাগের ছন্দোবন্ধ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দও যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তুলনামূলক ভাবে মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কম ব্যবহার করেছেন। মিশ্রবৃত্তে সমিল প্রবহমান পয়ার এবং শেক্‌সপীরীয় রীতির সনেট-কল্প কিছু লিখেছেন। এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিকতারই সাক্ষ্য মেলে।

(২) কলাবৃত্ত ছন্দে বাক্‌ধর্মী ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। এ ছন্দ অনেকাংশে স্থিরমাত্রক, তবু কবি প্রয়োজনমতো মাত্রার সংকোচন ও প্রসারণ এনে উচ্চারণে নমনীয়তা দিয়েছেন। এখানে কবি গতানুগতিকতা কাটিয়ে উঠেছেন। কবির বাক্‌ধর্মী নমনীয় উচ্চারণভঙ্গির একটি উদাহরণ তুলছি।—

> 'টু' দিতেছেন অটলচন্দ্র,
> ভুলু হয়েছেন 'বুড়ী',
> মহা হৈ চৈ, খেলা চলছে সে
> লুকোচুরি—হুড়োমুড়ি।
> চারু ভাবছেন মৌলিক আমোদ
> এবার 'নষ্টচন্দ্রে',—

তিন্‌টানো দায়, 'বার্ডসাই' এবং
সিগারেটটার গন্ধে ;
... ...
রায়েদের বাড়ী চলছে বিচার
নৈশ এবং দৈন,
শিরীষটারে একঘরে কর,
গিরীষটা কি স্ত্রৈণ।

[ঝরাফুল ঃ বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত ঃ ত্রয়ী (১ম সং), পৃ ৯৯]

এখানে 'টু দিতেছেন', 'শিরীষটা', 'গিরীষটা কি' পর্ব-তিনটিকে অন্য ছয়মাত্রা পর্বগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছয়মাত্রাতেই প্রসারিত ভাবে উচ্চারণ করতে হচ্ছে। আবার 'মৌলিক আমোদ', 'বার্ডসাই এবং' পর্বদুটির উচ্চারণ সঙ্কোচ করে ছয়মাত্রার আনতে হচ্ছে। এই প্রসারণ বা সংকোচনে বাক্‌ধর্মী উচ্চারণ আরও স্বাভাবিক হতে পেরেছে। অমিয় চক্রবর্তী এবং সাম্প্রতিক কালের আরও দু-একজন কবি এই রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

করুণানিধানের মতো কুমুদরঞ্জনেরও কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি কিছুটা বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। উভয়ের মধ্যে আরও কিছু কিছু মিল রয়েছে। দুজনেই লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ (কলাবৃত্তের পরেই) বেশী ব্যবহার করেছেন। সে কারণেই, মিশ্রবৃত্ত রীতি অবলম্বনে রঙ্গলাল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মহাপয়ার, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক এবং গদ্যছন্দের পথে যে ছন্দমুক্তির প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এই উভয় কবিই সেই ধারার কিছুটা বাইরে পড়ে রয়েছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কালিদাস রায় সেই তুলনায় আধুনিক ছন্দমুক্তি-ধারার সঙ্গে কিছুটা বেশী সম্পর্কান্বিত রয়েছেন বলা যায়। তিনি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে প্রবহমান (সমিল) পয়ার, মহাপয়ার এবং দীর্ঘ বাইশমাত্রা পংক্তির ছন্দোবদ্ধ রচনা করেছেন, তবে পংক্তি দৈর্ঘ্য আঠার বা বিশ মাত্রা অতিক্রম করলেই দ্বিপদীর মর্যাদা হারিয়ে সেটি ত্রিপদীর বা চৌপদীর আকৃতি লাভ করে। তিনি মিশ্রবৃত্ত সমিল মুক্তকও রচনা করেছেন। তবে এ সকল ছন্দোবন্ধে কবির স্বকীয় কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

কালিদাস রায়

কালিদাস রায় কলাবৃত্ত রীতিতে কিছু রচনা-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের মতো চারমাত্রা পর্বভাগে তিনিও কয়েকটি ('আহরণ'

কাব্যগ্রন্থের বঙ্গলক্ষী, গোরুর গাড়ী, জবা প্রভৃতি কবিতা দ্র) চমৎকার কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্র ছন্দোবন্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে 'গানভঙ্গ' (সোনার তরী) কবিতার আদর্শে ৭।৫।।৭।২। পবভাগে একটি কবিতা লিখেছেন। যেমন—

এখন ফুলকাপ | ঝাঁকায় ভরি ।। বেসাতি করি আমি | তার ;।
সবাই কেনে তাই আদর করি ত্বরায় নেমে যায় ভার।
আকাশে ফুল আজো তেমনি ফুটে আমার পানে চায় তারা।
দীর্ঘশ্বাস বুকে ভরি উঠে, নয়নে বয় জলধারা।

[আহরণ : আকাশ কুসুম]

কবির পববৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসাবে ৮।৫।২।৬। পর্বভাগের 'কাজরী' কবিতাটিরও [দ্র আহরণ, পৃ ২১১] উল্লেখ করা যেতে পারে। কালিদাস রায় বৈষ্ণবপদের আদর্শে রচিত তার প্রখ্যাত 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতায় (আহরণ ৬০-৬১ পৃ. রচনাকাল ১৯১০) তিন-দুই মাত্রাভাগের পঞ্চমাত্রক পর্বে মাঝে মাঝে তিনমাত্রার শব্দের প্রথমেই রুদ্ধদল ব্যবহারে চমৎকারে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার
চলেনা চল মলয়ানিল বাহিয়া ফুল গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কল কণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

[আহরণ : বৃন্দাবন অন্ধকার]

এ প্রসঙ্গে কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের (১২৯৫ চৈত্র সংখ্যা 'প্রচার' পত্রে প্রকাশিত) 'শেষ' কবিতাটির কথা পাঠকের মনে আসবে (দ্র পৃ ৩০৬)। অবশ্য সেখানে নবকৃষ্ণ যুক্তবর্ণ পরিহার করতে চেষ্টা করেছেন। কলাবৃত্ত রীতিতে তখনও যুক্তবর্ণের মাত্রা-নির্ধারণ সুনির্দিষ্ট হয়নি। কবি কালিদাস রায় বৈষ্ণব গানের আদর্শে আরও কিছু গান লিখেছেন। এখানে আর একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে,—

⏑⏑ — ⏑ ⏑⏑⏑⏑ — ⏑ ⏑⏑⏑⏑ — ⏑ ⏑⏑⏑⏑ — ⏑
নমি সি ন্ধু বে ণু ক র, হা দ্য ধা রা ধর প দ্ম রে ণু হ র ভৃ ঙ্গ,
নমি নন্দ যশোমতী মর্ম গৌরবে তুঙ্গ গিরিবর শৃঙ্গ।
তুমি গোষ্ঠ পালিকার কণ্ঠ মালিকায় শ্রেষ্ঠ নীলমণিরত্ন,
চির— তীর্থ গোকুলের মর্ত প্রেমঘন দাস্যমধুভরা যত্ন।

[আহরণ : বন্দনা]

(২) ৭ । ৭ । ৭ । ৩—যতিভাগে প্রতি পর্বের প্রথমে যুক্তবর্ণের স্পন্দন এ-ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি করেছে।

বাংলা সাহিত্যে একাধারে ছান্দসিক এবং কবির সংখ্যা অল্প। কালিদাস রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ সম্পর্কে, বিশেষ করে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন ('প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য' দ্র)।

॥ গ ॥

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২)

মোহিতলাল মজুমদার

আলোচ্য যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি মোহিতলাল মজুমদার ছন্দের আকৃতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ও সাবধানী কবি ছিলেন। সুসংবদ্ধ পদ-পংক্তি-স্তবক বিন্যাসে, মিল-বৈচিত্র্যে তিনি দেশী-বিদেশী নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। প্রবহমান পয়ার, মুক্তক এবং গদ্য কবিতার ছন্দে আকৃতি- ও প্রকৃতি- বন্ধন যে ক্রমে শিথিল হয়ে ভাবগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল,—মোহিতলাল সেই রীতির বিরোধী ছিলেন মনে হয়। সনেট এবং অন্যান্য পদ্যের স্তবকবন্ধে তিনি আকৃতি-বন্ধের দৃঢ়তাই আনতে চেয়েছেন। আধুনিক যুগের প্রধান সমস্ত ছন্দ-প্রকৃতিই তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

রুদ্ধদল-বহুল বিদেশী ছন্দস্পন্দ

মোহিতলাল যে সাবধানী শব্দপ্রয়োগে কি চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ সৃষ্টি করতেন, আরবী-পারশী রুদ্ধদল-বহুল শব্দ ব্যবহারে ভাবগত পরিবেশ কত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে জানতেন, কলাবৃত্ত রীতির একটি পদ্য থেকে তার নিদর্শন তোলা যেতে পারে।— কবিতাটির স্তবক-বিন্যাস ও পংক্তি-মিলও লক্ষণীয়।

		পংক্তিমিল
গুল্‌জার বাগে ফুল বিলকুল	...	
নাশপাতি ...	...	... —
গালে গাল দিয়ে লালে লাল হল...	...	.. —
বোস্‌তানে। ...	...	ক
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের		
আবছায়া, ...	...	—
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল ...		
খোসগানে! ...	...	ক

... ...

সে কোন সরাবে করিলি বেহোঁশ
মস্তানা— ... ... —
মাগিসাক্ষি! কি কথা আমার
কোস্ কানে ... ... ক
বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালার ভর সাকী! ... ... খ
হরদম দাও!—আজ বাদে কাল ভরসা কি?... ... খ

[সুনির্বাচিত কবিতা : গজলগান]

কবি কলাবৃত্ত রীতির চতুষ্কল পর্বে সত্যেন্দ্রনাথের মতোই অনুপ্রাসমিলে ও রুদ্ধদল ব্যবহারে মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন,—

গুগ্‌গুলে মশ্‌গুল্ বিলকুল ভর্‌ভর্
কার ছায়া জ্যোস্‌নায়? সুন্দর সুন্দর!
... ...
দিল্‌-দিল্ মঞ্জিল ভাঙ্গা ঘর সরায়ের—
করে তুলি রঙ্গিল, আয় ভাই মুসাফের।

[স্বপনপসারী : দিলদার]

স্তবক মিলের উদাহরণ

কলাবৃত্ত রীতিতে লেখা আর একটি স্তবকবন্ধের পংক্তি-মিল লক্ষণীয়।—

সেখানে যত আছে কবি ও গীতিকাব ... ক
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর, ... ক
মানব কলভাষে বেদনা মধুময় ... খ
উথলি তোলে যারা মরণে করি জয়, ... খ
চয়ন করে যারা নিজেরা নিশি জাগি' ... গ
স্বপন ফুল শোভা নিমীল আঁখি লাগি— ... গ
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালোলাগে ... ঘ
তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার। ... ক

[সুনির্বাচিত কবিতা : নমস্কার]

এই আট পংক্তি স্তবকে প্রথম ছয় পংক্তিতে দ্বিপংক্তিক মিল আছে। সপ্তম পংক্তি মিলহীন। অষ্টম পংক্তিটি কবিতার পরবর্তী প্রত্যেক স্তবকের অষ্টম পংক্তির সঙ্গে মিলবদ্ধ।

ফার্সি রুবাই এর মিলবন্ধ

কবি ফার্সী রুবাই এর আদর্শে চতুষ্পংক্তিক (ককখক) মিলের স্তবক রচনা করেছেন :

সুরায় আমার আয়ুরে ফুরাই—দুষিও না মোরে তাই, ক
করিও না ঘৃণা—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই। ক
শাদা চোখে বসি যাদের সমাজে তারা যে সবাই পর, খ
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে—বন্ধুরে মোর পাই। ক

[হেমন্ত গোধূলি : ফার্সি ফরাস]

পংক্তিমিল একেবারেই তুলে দিয়ে মোহিতলাল কলাবৃত্ত রীতির স্তবক রচনা করেছেন। যেমন—

কলাবৃত্ত রীতির মিলবিহীন পদ্য

ফুলেরা ঘুমায়, সাদা আর লাল পাপ্‌ড়িতে ঘুম ঢালা ;
প্রাসাদ কাননে তরুবীথি পরে' দুলিছে না ঝাউগুলি ;
নীল কাচে ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতি হারা ;
জোনাকীরা জাগে ; মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরী।

[হেমন্ত গোধূলি : নিশীথ রাতে]

বোদালেয়ারের আদর্শে রচিত বিনুনী মিলের উদাহরণ

এটি টেনিসনের The Princess কবিতার অনুবাদ। মূল কবিতায়ও পংক্তিমিল দেওয়া হয়নি। হেমন্ত গোধলির আর একটি কবিতায় বোদালেয়ারের অনুকরণে কবি বিভিন্ন স্তবকে বিনুনী মিল (Interlace-rhyme) কি ভাবে এনেছেন দেখা যেতে পারে।—

মিল

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়, ক
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়—যেন সে ধূপের ধূম ! খ
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে ; শীতের মূর্ছনায়— ক
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ—চরণে জড়ায় ঘুম। খ

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়—যেন সে ধূপের ধূম ! খ
বেহালার সুর শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্তনাদ ! গ
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ—চরণে জড়ায় ঘুম, খ
অস্ত গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ ! গ

বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্তনাদ— গ
মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায় ! ক

অস্ত গগন মৃত্যু সদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ, গ
রক্ত সাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি হায়। ক

[হেমন্ত গোধূলি : সন্ধ্যার সুর]

এই দ্বাদশ পংক্তিতে (চতুষ্পংক্তিক তিনটি স্তবকে) কবি যথাক্রমে ২য় এবং ৫ম, ৪র্থ এবং ৭ম, ৬ষ্ঠ এবং ৯ম, ৮ম এবং ১১শ পংক্তি অভিন্ন রেখেছেন।—এই ভাবেই পর পর পংক্তিবিন্যাসের ক্রম ঠিক রেখেছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে কবি স্তবক রচনার বৈচিত্র্য আরও বেশী দেখিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতো Terza Rima-র বিনুনী মিল দিয়েছেন। স্পেন্‌সেরীয় স্তবক রচনা করেছেন, কীট্‌স্‌, সুইনবার্ণের কবিতার স্তবকাদর্শে বাংলা স্তবক রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্তবক রচনাদর্শ সামনে রেখে সম্পূর্ণ নিজস্ব মিলেও সার্থক স্তবক রচনা করেছেন। এখানে কয়েকটি বিদেশী আদর্শ-প্রভাবিত উদাহরণ তুলছি।

(১) তের্জারিমা—[কখক, খগখ, গঘগ......]

		মিল
তের্জারিমা স্তবকবন্ধ	ভালবাসা লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়—	ক
	তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছু? ভাবিয়া না পাই,	খ
	জীবনের পথশেষে মনে আজ হতেছে উদয়—	ক
	ভাল যে বাসেনি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই	খ
	কৈশোরের আদি হতে যত কথা মনে পড়ে আজ—	গ
	দেখি, এ ধরণী ছিল মোর তরে আকুল সদাই	খ
	ভরিবারে চুপি চুপি এই মোর দুই মুঠি মাঝ	গ
	তাহারি অশেষ স্নেহ, প্রীতি. প্রেম—অমূল্য রতন।	ঘ
	আমারে ভুলাতে সে যে ধরিয়াছে বহুবিধ সাজ।	গ

[স্মর গরল : শেষ ভিক্ষা]

(২) স্পেনসেরীয় স্তবক : [বৈশিষ্ট্য : নবম পংক্তি দীর্ঘ,
মিল-কখকখখগখগগ]

		মিল
স্পেনসেরীয় স্তবকবন্ধ	তোমার চরিত, নারী, কতজনে কত যে বাখানে—	ক
	অযুতাঙ্ক নাটকের এক নটী—তুমি নিপুনিকা।	খ
	কত নিন্দা, কত স্তুতি! স্বপনের সীমান্ত সন্ধানে	ক
	ছুটিয়াছে পিছে পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা	খ

কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা — খ
চির-শান্তি মানবের—তনু তব নরকের দ্বার ! — গ
'শয়তানের মোহমন্ত্র', তুমি তার সহজ সাধিকা— — খ
আদি মাতা 'ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার — গ
রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ বহিষ্কার ! — গ

[স্মরগরল : নারী স্তোত্র]

(৩) কীট্‌সের স্তবক অনুসরণে :

মিল

কীট্‌স-এর স্তবকাদশ

সেই কথা জাগে মনে, তবু হায় পারিনা ভুলিতে— — ক
প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল ! — খ
যৌবন বসন্ত শেষে ফাগুনের সে ফুল তুলিতে — ক
হেরি সবই রঙ ছুট,—প্রেমেরও যে মিনতি বিফল ! — খ
তবু জানি মধু মাসে এই দেহ মাধবী বল্লরী-- — গ
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে ; — ঘ
শেষে রচি ঝরা ফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ — ঙ
বৃন্দাবন চির পরিহরি — গ
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদপরশে — ঘ
কালিন্দীর কূল ছাড়ি রাধিকার চলেনা চরণ ! — ঙ

[স্মরগরল : প্রেম ও জীবন][৩]

অনুরূপ সুইনবার্ণের Ave Atque Vale কবিতার স্তবকের (কখখকগঘঙ চচঙচ) অনুসরণে হেমন্ত গোধূলির 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' কবিতার স্তবক রচনা করেছেন।— এই স্তবকে সবশেষ একাদশ পংক্তিটি অন্যান্য পংক্তিগুলির তুলনায় ছোট।

৩। কীট্‌সের প্রখ্যাত Ode to a Nightingale-এর স্তবকবন্ধ অনুসরণে লিখেছেন—

Fade far away, dissolve, and quite forget — a
What thou among the leaves hast never known, — b
The weariness, the fever, and the fret — a
Here, where men sit and here each-other groan : — b
Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs, — c
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies : — d
Where but to think is to be full of srorrow — e
And leaden-eyed despairs, — c
Where beauty cannot keep her lustrous eyes, — d
Or new Love pine at them beyond tomorrow. — e

ফবাসী 'Ballade a Double Refrain' মিলের ছন্দোবন্ধ

মোহিতলাল ফরাসী 'Ballade a Double Refrain' নামক ছন্দোবন্ধে লৌকিক দলবৃত্ত রীতির একটি গীতিকবিতা লিখেছেন। এই ছন্দোবন্ধে আটাশটি পংক্তিতে (৮+৮+৮+৪-পংক্তিভাগে) চারটি স্তবকবন্ধ, মিল মাত্র তিনটি। প্রথম তিনটি স্তবক একই মিলবিন্যাসে রচিত হয়। শেষ চারপংক্তিতে দ্বিপংক্তিক মিল থাকে। যেমন—

		মিল
(৪)	গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা	ক
	কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধূলো-বালি,	খ
	শীতের ঠেলায় ঘরে যখন শাসি কপাট আঁটা,	ক
	তখন ঘেমে হাপিয়ে কেসে গদ্য লেখো খালি।	খ
	কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি,	খ
	ঝুম্‌কো লতা দুলছে দেখি, বারান্দাটির পাশে,	গ
	চিকের ফাঁকে একখানি মুখ ফুলফুলের ডালি—	খ
	তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছ্বাসে।	গ
	মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাটা।	ক
	বুদ্ধি তো নয় —যেন সমান চারকোণা এক টালি,	খ
	মনটা তখন দাড়ির মতন ছুঁচলো করে' ছাঁটা,—	ক
	তখন বসে বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।	খ
	কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন চতুরালি	খ
	বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,	গ
	কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—	খ
	তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছ্বাসে।	গ
	চাই যেখানে ভারিক্কে চাল—বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা,	ক
	'হতেই হবে', 'কখ্খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,	খ
	ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় 'কিন্তু' 'যদি'র কাঁটা,—	ক
	তখন বসে বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।	খ
	কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল কালি,	খ
	মিলন লগন ঘনিয়ে আসে কনক চাঁপার বাসে,	গ

যে কথা কেউ জানবে নাকো, সেই কথা কয় আলি,— খ
তখন, ওহো ! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছ্বাসে। গ

সংসারে যে অনেক অভাব অনেক জোড়া তালি !— খ
তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ; খ
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে, গ
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে। গ

[সুনির্বাচিত কবিতা ঃ গদ্য ও পদ্য]

এটি Austin Dobson এর কবিতার অনুবাদ। ভাবানুযায়ী মিলবিন্যাসের একটি সার্থক নিদর্শন।

সনেট

সনেট লেখক হিসাবে বাংলাকাব্যে মোহিতলাল বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারেন। সম্ভবত আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁকে সার্থক সনেট রচনার প্রেরণা দিয়েছে। তিনি মোট ৮৫টি সনেট লিখেছেন। খাঁটি পেত্রাকীয় আদর্শেরই অনুরাগী ছিলেন, শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির সনেটও লিখেছেন।—শেক্‌সপীরীয় বা আধুনিক মিলের সনেটকে তিনি 'মুক্তবন্ধ' নাম দিয়েছেন। ইংবেজি সনেটে পেত্রাকীয় আদর্শ ছাড়া যে নতুন প্রকৃতিধর্ম শেক্‌স্‌পীয়র বা অন্যান্য কবিরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, অন্যান্য বাঙ্গালী সনেটকারদের মতো মোহিতলালও কিছুটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তবে couplet বা দ্বিপংক্তিক মিলের সনেট তিনি সনেটাদর্শ-বিরোধী বলে মনে করতেন।—এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদীগুলিকে উৎকৃষ্ট কবিতা বলে স্বীকার করলেও আদর্শ সনেট বলতে রাজী হননি। এখানে তার পেত্রাকীয় ও শেক্‌স্‌পীরীয় আদর্শের দুটি সনেট উদ্ধৃত করছি।—

পেত্রাকীয় সনেট ঃ মিল

পেত্রাকীয় উদাহরণ

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর পর, ক
মেলেনি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে'— খ
শাল্মলীর রক্তভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে, খ
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব কেশর ! ক
নরত্ব দুর্লভ জানি, সুদুর্লভ কবি কলেবর— ক
সত্য সে কি ? মনে হয়, এই মরু সৈকত-সমীরে, খ
পাই যদি প্রীতিমুক্তা আবগাহি লবনাম্বু-নীরে, খ
বাণীর উদাস দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর। ক

চলেছিনু ক্লান্ত পদে সুন্দরের তীর্থ অভিলাষে,		গ
সম্মুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন পথিক		ঘ
গান গেয়ে চলে আগে ? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান !		ঙ
জিজ্ঞাসিনু কোথা যাও ? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে		গ
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্ত্যের অধিক !		ঘ
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রাশুভ, আমি পুণ্যবান্ !		ঙ

[ছন্দ চতুর্দশী : তীর্থপথিক]

শেক্‌স্‌পীরীয় সনেট : মিল

শেক্‌স্‌পীরীয় উদাহরণ

সায়াহ্নে কুটির তলে বসে একাকিনী	...	ক
গাঁথিতে বকুল মালা, আপনার মনে	...	খ
কেহ কি গাহেনা গীত—অতীত কাহিনী—	...	ক
একদা যে প্রিয় ছিল তাহারি স্মরণে ?	...	খ
সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর,	...	গ
বেদনা সুরভি ! দিন শেষে সন্ধ্যা যথা,	...	ঘ
ভোগ শেষে উপভোগ,—হৃদি ভরপুর	...	গ
রাধিকার স্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা !	...	ঘ
তবু স্মৃতি স্বপ্ন আনে ভরিয়া নয়ন,	...	ঙ
সেই সুরে বেজে ওঠে মনের মুরলী,	...	চ
করাঙ্গুলি চাহে পুনঃ করিতে চয়ন	...	ঙ
সেদিনের ফোটা ফুল—অশ্রু মুক্তাবলী।	...	চ
মনে হয় বৃন্দাবনে বাজিছে বাঁশরী,--	...	ছ
নাই শুধু অভিজ্ঞান, সে গেছে পাসরি !	...	ছ

[ছন্দচতুর্দশী : স্মরণ]

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের মতো মোহিতলালও sonnet-sequence বা সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। দ্রৌপদী, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রূপাৰ্টঙ্কক, কবিধাত্রী, এক আশা প্রভৃতি সনেট এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'রূপাৰ্টঙ্কক' চয়টি সনেটে গ্রথিত কবিতা। মোটামুটি বলা যেতে পারে, পেত্রাকীয় আদর্শে "অতি পিনদ্ধ নিচোলাবরণে একটি বিশেষ শ্রী ও সৌষ্ঠব" ফুটিয়ে তোলাই মোহিতলালের সনেট রচনার লক্ষ্য ছিল। সে সাধনায় অনেকাংশে তিনি সিদ্ধ হতে পেরেছেন। ভাবের গাম্ভীর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক সময়ই সনেটে তিনি মহাপয়ার পংক্তিবন্ধ ব্যবহার করেছেন।

॥ ঘ ॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৪) মোহিতলালের মতো ছন্দ-সচেতন না হলেও ভাবের যথাযথ প্রকাশনায় ছন্দকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কলাবৃত্ত রীতিই বেশী ব্যবহার করেছেন। এই রীতির চতুষ্কল পর্বভাগে তাঁর অভিনবত্ব লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক এবং গদ্য কবিতাও তিনি অল্পস্বল্প লিখেছেন। লৌকিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দে অভিনবত্ব না থাকলেও নির্ভুল সার্থক ব্যবহারের নিদর্শন দিয়েছেন। এখানে কলাবৃত্ত চতুষ্কল পর্বভাগের কয়েকটি বৈচিত্র্য-নিদর্শন তুলছি।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কলাবৃত্ত চতুর্মাত্র পর্বের উদাহরণ

(১) বৈশাখে চূতশাখে ডাকে পিককুল,
তরুছায়ে মধুবায়ে ফুটে কত ফুল।
দু'পরে দারুণ রোদে
মাদুরে নয়ন মোদে—
কবি সনে কবি-প্রিয়া প্রেমে মশগুল।
আমি কি করি ?
যা তা উদরে ভরি,
খুঁজিতে পথের ত্রুটি
'বাই সাইকেলে' উঠি
সাড়ে দশ ক্রোশ ছুটি ; এই চাকুরি।

[অনুপূর্বা ঃ পথের চাকরি]

এখানে স্তবক-বন্ধের পংক্তি-মিল ও পংক্তির মাত্রাবিন্যাস-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। পংক্তি-গুলির পর্বগত ধ্বনি-অনুপ্রাসের মাধুর্যও কবিতাটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে।

(২) গুড়ুগুম্ -ঘচ্চো, ঘচ ঘচ ঘচ্চো,
ওখানে কি কোচ্চো ? বাঁধা পথে গচ্ছ।
ঘচাঘচ্ ঘত্তোর লোহাবাঁধা পথ তোর,
কি সাত কি সোত্তোর ; মাঝে মাঝে- দোত্তোর-
প্রলাপ সে মন্তর। উচুনীচু গর্তর
পথ নয় পথ তোর।
লোহাবাঁধা পথ তোর,
লোহাবাঁধা পথ তোর। [অনুপূর্বা ঃ রেলঘুম]

পুল পার হবার মুখে রেলগাড়ী যে শব্দ করে, ঘু:মর আমেজ নিয়ে কবি এখানে সেই শব্দধ্বনি প্রকাশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ যে সাবধানী শব্দশিল্পী ছিলেন এখানে তার সার্থক প্রমাণ মিলছে। সমস্ত কবিতাটিই সেইরূপ শব্দের ধ্বনিসম্পদে সমৃদ্ধ।

(৩) এল গেল বসন্তে কত না আগন্তুক,
ঝলে গেল চূতকলি ঝরে গেল কিংশুক,
রাঙা পায়ে চলে গেল,
অশোক কি বলে গেল।
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো –!

[অনুপূর্বা ঃ পারুলের আহ্বান]

প্রত্যেক স্তবকেই শেষ পংক্তিটি অভিন্ন। এখানে ঘুম থেকে জাগাবার মিষ্টি আহবানকে জা—গো—দীর্ঘ উচ্চারণে চার কলামাত্রার প্রসারণে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

(৪) তিন আনা চৌকা,—
ভুখা পেলে খেটে খা,
দলে দলে লেগে যা,
কে বলে কঠিন মাটি ? না পোষায় ভেগে যা।
ঘরে বসে মড়কে
চলেছিলি নরকে,
না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে।
খাট্ তবে খাট্রে
ডোঙা পেট কোঙা ক'রে গোঙা মাটি কাট্রে।

[অনুপূর্বা ঃ ফেমিন রিলিফ]

চার মাত্রার পর্বযতি ছাড়াও আট ও সাত মাত্রার পদযতি এবং পদ-পংক্তির মিল এ কবিতাংশে লক্ষণীয়।

চার মাত্রার পর্বযতি লুপ্ত করে আট+ছয় মাত্রাভাগে পয়ার পংক্তি কলাবৃত্ত ছন্দে কবি বেশ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করেছেন। একটি দ্বিমাত্রিক মিলের অনুরূপ 'চতুর্দশপদী' কবিতার চারটি পংক্তি এখানে তুলছি,—

(৫) কে জানে কি আছে দুটি জরা ভরা দেহে,
জুড়ায় এ'কর দাহ অপরের স্নেহে।
এ উহারে দেখে যেন কভু দেখে নাই,
এই বুঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই। [অনুপূর্বা ঃ হেন প্রীতি]

কলাবৃত্ত (৮।।৬) পয়ারবন্ধ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বেশী রচনা করেননি।[৪]

পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব বিন্যাসও যতীন্দ্রনাথের কবিতায় লক্ষ করা যায়। যথাক্রমে এক একটি উদাহরণ তুলছি।—

পাঁচমাত্রা পর্বের উদাহরণ

শুনিয়াছিনু—উদিবে তুমি তিমির নিশি-শেষে,
সূর্যসম সুদূরাচলে নবীন কোন প্রাতে।
অকস্মাৎ না চলা পথে দাঁড়ালে দ্বারে এসে
শ্রাবণ ঢাকা অন্ধকার চতুর্দশী রাতে।
আধেক ঘুমে ডাকিয়া বলো—
খোলো গো দ্বার খোলো,
আজিকে এই অসময়েই সময় মোর হলো।

[অনুপূর্বা ঃ মুক্তি][৫]

স্তবকটির পংক্তিবিন্যাস ও মিল লক্ষণীয়।

ছয়মাত্রা পর্বের উদাহরণ

জ্যৈষ্ঠ দু'পরে গলদ্‌ঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কতনা ঝঞ্ঝা মুসলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে
ধরণীগর্ভে ধন;
বোকামি পড়েনা ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে
ধূলা-কাদা আভরণ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হ.জ রতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের শ্রদ্ধা করো
তারা মানুষেরি ভাই। [অনুপূর্বা ঃ মানুষ]

৪। চতুর্মাত্রক পর্বভাগে কবির 'গঙ্গাস্তোত্র', 'শাওনের রাতি' 'দুঃখের পার', 'বরনারী', 'নওজোয়ার' প্রভৃতি কবিতাগুলি কলাবৃত্ত প্রকৃতিতে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধে সার্থকভাবে লিখিত হয়েছে।

৫। এই প্রসঙ্গে কবির 'অনুপূর্বা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বৃন্দাবনে' [পৃ ২৭৭] কবিতাটির পঞ্চমাত্রক পর্বভাগের (কলাবৃত্ত) উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতাটি স্পষ্টতঃ রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতাটির ছন্দোবন্ধের আদর্শে রচিত।

প্রত্যেক পংক্তিতে ৬।৬।৫।।৬।৬।৪I—পর্ব-পদভাগ এবং পদের ও পংক্তির মিলবিন্যাস কবিতাটিতে চমৎকার ধ্বনি-আবেদন এনে দিয়েছে। প্রতি স্তবকের সর্বশেষ পংক্তিতে একই ধরণের শব্দবিন্যাসের দ্বারা সেখানেও কবি একটি ভাবগত পূর্ণতা দিয়েছেন।

সাতমাত্রা পর্বের উদাহরণ

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পাবে কি গো ফিরাতে মধুমাস ?
নাই যে ধূপছায়া
নাই সে মেঘমায়া
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার।
উসর ও-কপোলে বিফল জলাধার। [অনুপূর্বা ঃ চোখের জল]

এখানে দ্বিপদী ও চৌপদী পংক্তি মিলিয়ে চতুষ্পংক্তিক স্তবক রচিত হয়েছে। কলাবৃত্তের এই সকল পর্বভাগে যতীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন বলা যেতে পারে। কলাবৃত্তের তুলনায় যতীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্ত কম ব্যবহার করেছেন। মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে পারে।—

মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক

এসেছে ফাল্গুন,—
মৌমাছি করিছে গুন্ গুন্,
নানান মরসুমী ফুল শখের বাগানে
'পপিফ্লাক্‌স হরলিক্‌স্' 'জিনিয়া ডালিয়া'
দখিনার সোহাগ-পরশে
রঙিন শৌখিন অঙ্গ দিয়াছে ঢালিয়া,
টুনটুনিয়া মত্ত মধুপানে
'দুলে দুলে' নিতান্ত অজানা 'ফুলে ফুলে'

[অনুপর্বা ঃ আমার বসন্ত

এখানে মিল-অমিলের শিথিল বিন্যাসে পংক্তি রচিত হয়েছে। অযুক্তবর্ণে লেখা শব্দ-মধ্য-রুদ্ধদল সংবদ্ধ এককলা হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। তার ফলে মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণ-দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। 'পপিফ্লক স্ —হরলিক্‌স', 'জিনিয়া ডালিয়া' 'দুলে দুলে', 'ফুলে ফুলে' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রচ্ছন্ন অন্তমিলও লক্ষণীয়।

গদ্য কবিতার ছন্দ ব্যবহারে যতীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। ভাবময় বাকপর্বিক ছন্দযতি-বিভাগে রচিত গদ্য কবিতার মাঝে কলাবৃত্ত অথবা দলবৃত্ত রীতির পংক্তি বিন্যাসের দ্বারা মাঝে মাঝে পাঠক মনে অপ্রত্যাশিত সুখকর অনুভূতি (sense of happy variation) এনে দিয়েছেন। যেমন—

গদ্য কবিতায় পদ্য-পংক্তির মিশ্রণ।

আমি ফুল দিইনি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়েনা।
আমি বলতে এসেছিলাম,—
হৃদয়বন্ধু, শোনগো বন্ধু মোর--।
কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চলে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে।
আর সাথে সাথে
রিকসাওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার
কি বিচিত্র সাজ।
...

[অনুপূর্বা ঃ বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮]

আলোচ্য যুগে এবং পরবর্তী যুগে এই নতুন রীতির গদ্য-পদ্য সংমিশ্রিত ছন্দের কবিতা একাধিক কবি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ গদ্য কবিতার ছন্দ থেকে এ কবিতার ছন্দস্পন্দ পাঠক মনে কিছুটা পৃথক আবেদন জাগায়।

যতীন্দ্রনাথ লৌকিক দলবৃত্ত রীতির ছন্দও নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য কোনও মৌলিকতা সেখানে লক্ষিত হয় না।

॥ ৬ ॥

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭)

ছন্দের গুরুত্ব বিচারে এ-যুগে নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি রীতিতেই বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মতো শিশুপাঠ্য কবিতায় লঘুযতি এবং রুদ্ধদল-স্পন্দনের বৈচিত্র্য এনেছেন। তিনিও সংস্কৃত ও ফার্সী ছন্দে বাংলা পদ্য রচনা করেছেন।

কলাবৃত্ত রীতির ছন্দকে ছান্দসিকেরা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কোমল ছন্দরূপেই গণ্য করেন। কিন্তু উপযুক্ত কবির হাতে বীণা যে তরবারি হতে পারে, নজরুলের ষট্‌কলপর্বিক কলাবৃত্ত রীতিতে লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ কবিতায় নজরুল অবস্থা-বিশেষে মুক্তদলের উচ্চারণ-প্রসারণ ঘটিয়েছেন। যেমন,—

আমি হোমশিখা, আমি | সাগ্নিক যম|দগ্নি,
আমি 'যজ্ঞ, আমি' | পুরোহিত আমি | অগ্নি।
আমি 'সৃষ্টি, আমি' | 'ধ্বংস, আমি' | লোকালয়, আমি | শ্মশান,
আমি অবসান নিশা|বসান।
মম এক হাতে বাঁকা | বাঁশের বাঁশরী | আর হাতে রণ|তূর্য।

[অগ্নিবীণা : বিদ্রোহী]

এখানে 'যজ্ঞ, আমি', 'সৃষ্টি, আমি' এবং 'ধ্বংস, আমি' পব তিনটিতে যথাক্রমে 'যজ্ঞ', 'সৃষ্টি', এবং 'ধ্বংস' শব্দ তিনটির চতুষ্কল উচ্চারণ লক্ষণীয়।৬ অতিপর্বিক দোলা এবং ভাবযতি ও ছন্দযতির বৈচিত্র্য এ-কবিতাটিতে বিশিষ্ট গতিবেগ ও স্পন্দন এনে দিয়েছে।

আবার রবীন্দ্র-আদর্শে কলাবৃত্তে সবগুলি মুক্তদল এনে, সেই সঙ্গে প্রতি পর্বে শব্দের ও মাত্রার বিন্যাসক্রম এক রেখে উচ্চারণে কোমলতার পরীক্ষা করেছেন। যেমন,—

আদর গর-গর,
বাদর দর-দর,

৬। বাংলা পদ্যে মুক্তদলের দ্বিকল গুরু উচ্চারণ কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ বিরোধী, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য যেখানে যতি পড়ে সেখানে প্রয়োজনবোধে মুক্তদলের গুরু উচ্চারণ চলে। এখানে 'যজ্ঞ', 'সৃষ্টি' এবং 'ধ্বংস' তিনটি শব্দের পর ভাবযতি রয়েছে এবং পরবর্তী 'আমি' শব্দ অতিপর্বিক স্পন্দন সৃষ্টি করেছে,—সে কারণেই এখানে মুক্তদলের দ্বিকলামাত্রিক উচ্চারণ স্বাভাবিক হতে পেরেছে।

এ তনু ভর ভর
　　কাঁপিছে থর থর—
নয়ন ঢল ঢল
সজল ছল ছল
কাজল কালো জল
　　ঝরে লো ঝরঝর।

[ছায়ানট ঃ বাদল দিনে]

কবি এ কবিতাংশে প্রতি দল মুক্ত রেখেছেন এবং শব্দের মাত্রিক ক্রমবিন্যাস (৩+২+২) ঠিক রেখেছেন। অবশ্য এ-রীতি ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ এখানে যে মাধুর্য সৃষ্টি করেছে সেটিও লক্ষণীয়।

এবারে আর একটি সুনির্দিষ্ট রুদ্ধ-মুক্ত দল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলছি।—

অলক দুল দুল
পলক ঢুল ঢুল্
　　নোলক্ চুম খায় মুখই
সিঁদুর মুখ টুক
হিঙুল টুক টুক্
　　দোলক ঘুম যায় বুকেই।

[ছায়ানট ঃ প্রিয়ার রূপ]

সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাসের এমন ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথও যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন।

আরবী 'মোতাকারিব'[৭] ছন্দে লেখা একটি কবিতা থেকে এখানে সুনির্দিষ্ট দল-বিন্যাসের আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

দোদুল দুল্
দোদুল দুল্।

৭। আরবী মোতাকারিব' ছন্দের ছয়টি প্রকার ভেদ আছে। এ দৃষ্টান্তটি, 'ফউলুন। ফউলুন। ফউলুন। ফউলুন (প্রতি 'ফ'-এ উ দীর্ঘ উচ্চারিত)'— এই রীতির মোতাকারিব' ছন্দোবন্ধের আদর্শে রচিত হয়েছে। বাংলায় এই রীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে কবি গোলাম মোস্তাফা লিখেছিলেন—

আকাশ-তল | সুনির্মল, মেঘের দল কোথায় বল?
বিফল তোর | করুণ রব | 'ফটিক জল' | ফটিক জল।'।

[প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ. পৃ ৫৬– ৫৭ দ]

বেণীর বাঁধ
আলগ্ ছাঁদ,
খোপার ফুল্
কানের দুল্
খোপার ফুল্
দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্ ।　　　[দোলন চাঁপা : দোদুল্ দুল্]

মুক্তদলের আংশিক গুরু বিন্যাসে লিখিত কলাবৃত্তের আর একটি উদাহরণ তুলছি ।—

আল সে
নয় সে　　ওঠে রোজ　　স কা লে
রোজ তাই
চাঁদা ভাই　　টিপ দেয়　　ক পা লে
উঠ ল
ছুট ল　　ঐ খোকা খুকী সব,
উ ঠে ছে
আ গে কে　　ঐ শোনো কলরব ।

[সঞ্চিতা : প্রভাতী]

কলাবৃত্তের উচ্চারণ সঙ্কোচন

কলাবৃত্ত ছন্দে ধ্বনির কলাসঙ্কোচনের অবকাশ অত্যন্ত কম। নজরুলের কবিতায় কিন্তু এই ধরণের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার কিছু কিছু রয়েছে। যেমন,—

(১) আবুবকর উস্‌মান　　উমর আলি হায়দর
দাঁড়ী এযে তরণীর,　　নাই ওরে নাই ডর ।
[অগ্নিবীণা : খেয়াপারের তরণী]

(২) এ যে ইব্‌রাহীম আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।[৮]

[অগ্নিবীণা ঃ কোরবানী]

নজরুল কলারত্তের তুলনায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কম ব্যবহার করেছেন। তবে এ ছন্দ তাঁর পূর্ণায়ত্ত ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। সমিল ও অমিল প্রবহমান পয়ার, এবং সমিল মুক্তক তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এখানে অমিল প্রবহমান পয়ার এবং সমিল মুক্তকের এক একটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান পয়ার

(ক) যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দুহাতে
নয়ন ঢাকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না? [নতুন চাঁদ ঃ শিখা]

(২) মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ!
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে
এ নিখিলে
জানিতে না আপনার ছাড়া।
তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নিকো নাড়া!
বিপুল আরশি সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।

[সিন্ধুহিল্লোল ঃ সিন্ধু]

লৌকিক দলবৃত্তে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব

লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের স্পন্দন-মাধুর্য সৃষ্টিতে নজরুল অনেক ক্ষেত্রেই সত্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যেমন

ঐ সর্ষে ফুলে লুটানো কার
হলুদ রাঙা উত্তরী।

৮। শব্দের উপরের দিকে ⌒ চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি সংকোচন বোঝানো হল।

উত্তরী বায় গো—
আকাশ গাঙে পাল তুলে যায়
নীল সে পরীর দূর তরী ॥

[ছায়ানট : নীলপরী]

স্পষ্টতই এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'লালপরী' ও 'নীলপরী' কবিতা দুটি মনে পড়বে। শিশুপাঠ্য কবিতায় কথ্য-সংলাপের আমেজ মিশিয়ে, ছড়ার মতোই কিছুটা শিথিল ছন্দোবন্ধে লৌকিক দলবৃত্ত রীতির যে কবিতা লিখেছেন সেখানে শিথিল দলবিন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—

কাঠবেড়ালি ! | কাঠবেড়ালি ! | পেয়ারা তুমি | খাও ? I
গুড়-মুড়ি খাও ? | দুধ ভাত খাও ? | বাতাবি নেবু ? | লাউ ? ।
বেড়াল-বাচ্ছা ? | কুকুর ছানা ? | তাও ? | I

... ...

কাঠ বেড়ালি ! | তুমি আমার | ছোড়দি হবে ? | বৌদি হবে ? | হঁ I
রাঙা দিদি ? | তবে একটা | পেয়ারা দাও না ! | উঁ I
এ রাম ! তুমি | ন্যাংটা পুঁটো ? I
ফ্রকটা নেবে ? জামা দুটো ? I
আর খেয়োনা | পেয়ারা তবে, I
বাতাবি নেবুও | ছাড়তে হবে ! I
দাঁত দেখিয়ে | দিচ্ছ ছুট্ ? | অ—মা দেখে | যাও !— I
কাঠ বেড়ালি ! | তুমি মর | তুমি কচু | খাও । I

[ঝিঙেফুল : খুকী ও কাঠবেড়ালি]

এখানে মূল পর্বভাগ চতুর্দল-ছয়কলামাত্রক। ছয় কলামাত্রার উচ্চারণকাল ঠিক রেখে ছড়ার মতো পর্বে তিন, চার পাঁচ বা ছয় দল ব্যবহার করেছেন। শিশুমুখের সংলাপের স্বাভাবিকতা তাতে আরও চমৎকার ফুটে উঠেছে। শিথিল উচ্চারণের ছড়ার কথ্য সংলাপী ভঙ্গি ইতিপূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতায় এবং যাত্রার পালাগানে ব্যবহার করেছেন। এ-যুগেও একাধিক কবি এমন শিথিল দলবৃত্ত প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়।

সাতদল-পর্বের প্রথম তিন দলের পর অতিপর্বিক যতিস্পন্দন দিয়ে নজরুল ছড়ার আদর্শে পদ্য রচনা করেছেন। যেমন,—

'বাবাগো মাগো' বলে
পাঁচিলের ফোকল গ'লে
ঢুকি গ্যে বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌ল ধড়ে।
যাব ফের কান মলি ভাই
চুরিতে আর যদি যাই।[৯] [ঝিঙেফুল : লিচুচোর]

সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে নজরুলও বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

(১) শার্দূল বিক্রীড়িত[১০] — — — ⏑ ⏑ — ⏑ —, ⏑ ⏑ ⏑ —, — — ⏑ — — ⏑ — — — —

উত্রাস ভীম
⏑ ⏑ — ⏑ —
মেঘে কুচকাওয়াজ
⏑ ⏑ ⏑ —
চ লি ছে আজ,
— — ⏑ —
সোন্মাদ সাগর
— ⏑ —
খায়রে দোল।

৯। তুলনীয় :
আদেবে কলমি লতা
এতকাল ছিলি কোথা॥
এতকাল ছিলাম বনে।
বনেতে বাগ দি ম'ল
আমাবে যেতে হল॥
তুমি নেও কলসী কাঁকে,—
আমি নিই বন্দু হাতে।
চলো যাই বাজপথে।
ছেলেব মা গযনা গাঁথে,
ছেলেটি তুড়ুক নাচে॥
[ছড়া সংগ্রহ : ৩২ নং ছড়া : লোক সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ]

— — — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑ — — — ⏑ — — ⏑ —
১০। সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ 'শার্দূল বিক্রীড়িতম্‌'
[ছন্দোমঞ্জরী : ১৬৬ সূত্র দ্র]
যাহার প্রতিবাদে যথাক্রমে ম — — —, স ⏑ ⏑ —, জ ⏑ — ⏑, স ⏑ ⏑ —, ত — — ⏑, ত — — ⏑ গণ ও একটি গুরুবর্ণ বসে এবং প্রথম দ্বাদশাক্ষরে ও পবে সপ্তমাক্ষবে যতি পড়ে তাকে শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ বলে।
সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুল কেউই এ ছন্দেব প্রযোগে এত দীর্ঘ যতি বিভাগ রাখতে পারেননি, বাংলা কলাবৃত্ত রীতির আদর্শে লঘু পর্বভাগে যতি দিয়েছেন।

ইন্দ্রের রথ
'বজ্রের' কামান
টানে উজান
মেঘে ঐরাবৎ
মদ বিভোল ॥ [ছায়ানট : পূবের হাওয়া]

এখানে স্পষ্টতই নজরুল পবভাগ ও মিলবিন্যাসে সত্যেন্দ্রনাথের 'বিদ্যুৎ বিলাস' কবিতার (দ্র পৃ ৯২) অনুকরণ করেছেন, তবে সত্যেন্দ্রনাথের মতো লঘুগুরু দলবিন্যাসে সবত্র নির্ভুল হতে পারেন নি। যেমন, উদ্ধৃতাংশে 'বজ্রের' শব্দটি; -অনুরূপ আরও দু-একটি ত্রুটি কবিতাটির পরবর্তী অংশে রয়েছে।

(২) তোটক[১১] : ◡ ◡ – ◡ ◡ – ◡ ◡ – ◡ ◡ –
◡ ◡ – ◡ ◡ – ◡ ◡ – ◡ ◡ –
জ্বলে বৈশ্বা নরের ধু ধু ল ক্ষ শিখা
আজ বিষ্ণুভালে জ্বলে রক্তটিকা
... .
দেহ ক্ষান্ত রণে, ফেল রঙ্গিনী বেশ,
খোলো 'রক্তাম্বর' মাতা সম্বর কেশ। [বিষের বাঁশী : জাগৃহি]

এখানে সত্যেন্দ্রনাথের তোটক (জাফরাণের ফুল : পৃ ৯৯ দ্র) থেকে পার্থক্য রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে পবের যতিভাগ দিয়েছেন : ২।৪।৪।৪।২, আর এখানে নজরুল যতিভাগ করেছেন : ২।৬।২।৬[১২]। সত্যেন্দ্রনাথ একদল শব্দ (monosyllabic word) দিয়েছেন বেশী। নজরুল সে আদর্শ গ্রহণ করেননি। নজরুল এখানেও দল-বিন্যাসে ত্রুটি রেখেছেন। 'রক্তাম্বর' শব্দের ব্যবহারে তোটকের লঘুগুরু বিন্যাস পদ্ধতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

◡ ◡ – ◡ – ◡ ◡ – ◡ –
১১। বদ 'তোটক' মম্বুধি সকারযুতম্ [ছন্দোমঞ্জরী ২।৮০ পৃ দ্র]
যে ছন্দে ক্রমশ চারটি 'স' গণ (◡ ◡ –) থাকে, তাকে তোটক বলে।

◡ – – ◡ – – – – – ◡ – – – – ◡ – – – – – ◡ –
১২। যকারৈঃ কবীচ্ছাম্ভ বোধা নিবদ্ধৈঃ প্রসিদ্ধো বিশুদ্ধো হপবন্দশুণঃ
– ◡ – – ◡ – –
'সিংহ বিক্রীড়' নামা [ছন্দোমঞ্জরী : ২২৩ পৃ দ্র]
কবির ইচ্ছানুসারে কেবলমাত্র যকার (◡ – –) দ্বারা প্রতিপাদ রচিত হলে সিংহবিক্রীড় (দণ্ডক) ছন্দ বলে।

(৩) সিংহ বিক্রীড় ১২ : ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – –

⏑ – – ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – –

না চায় প্রাণ রণোন্মাদ বিজয় গান, গগনময় মহোৎসব।

রবির রথ অরুণ পান কিরণপথ ডুবায় মেঘ মহার্ণব॥

[ছায়ানট : পূবের হাওয়া]

(৪) অনঙ্গশেখর ১৩ : ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –

⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –

তাপস কঠিন উমার গালে চুমার পিয়াস জাগে,

বধূর বুকে মধুর আশা কোলে কুমার মাগে। [ছায়ানট : পূবের হাওয়া]

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অল্পকিছু গদ্য কবিতার ছন্দও ব্যবহার করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য বিভিন্ন রীতির স্তবকবন্ধ ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। দীর্ঘ পংক্তি ব্যবহারে তিনি ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে ব্যালাডস্তবক, পাঁচ ও ছয় পংক্তির স্তবক (Quintette and Sextain), নয় পংক্তির স্পেনসেরীয় স্তবকরূপ, তেজারিমা (Terza Rima) ত্রিপংক্তিক বন্ধের সনেট প্রভৃতি রচনায় কবির ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দু একটি উদাহরণ এখানে তোলা যেতে পারে।

জীবনানন্দ

(১) ব্যালাড স্তবক (ballad stanza : a b c b) :

ব্যালাড স্তবক

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাক' তুমি,

ব'লো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে,

ফিরে এসো সুরঞ্জনা :

নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে।

[সাতটি তারার তিমির : আকাশলীনা]

কবি এখানে মুক্তকাভাস-যুক্ত পংক্তি বিন্যাসে ব্যালাড স্তবকের 'কখগখ' মিল দিয়েছেন।

— — —

⏑ – ⏑ – ⏑ – – – ⏑ – – –

১৩ ল ঘু গু র্বা নি জে চ্ছ য দা নিবে শ্য তে

– ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – –

ত দে ব দ ণ্ড কো ভ ব 'ত্তা ন ঙ্গ শে খ রঃ [ছন্দোমঞ্জরী : ২°. সূত্র

স্বেচ্ছায় যে ছন্দে একটি লঘু ও একটি গুরু — এই ক্রমে অক্ষর সন্নিবেশ করা হয় তাকে অনঙ্গশেখর (দণ্ডক) ছন্দ বলে

(২) নয়পংক্তির স্পেনসেরীয় স্তবকরূপ ঃ

স্পেনসেরীয় স্তবক গানের সুরের মত বিকালের দিকে বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়,—সেখানে সে কারে ভালবাসে !—
পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম চোখ বুজে
অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতদিকে গিয়েছে সে ভেসে,—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু—ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে—
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁটে উঠেছিল হেসে।

[ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ অনেক আকাশ]

স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শে কবি এখানে কখকখখগখগগ—পংক্তিমিল দিয়েছেন। স্পেনসেরীয় স্তবকে প্রথম আটপংক্তি আয়াম্বিক পঞ্চপবিক, নবম পংক্তিটি আয়াম্বিক ষট্‌পবিক। জীবনানন্দ এখানে প্রথম সাত পংক্তি দ্বিপদী ৮।।১০ I মাত্রাভাগে অষ্টম পংক্তিটি দ্বিপদী ৮।।৮। মাত্রাভাগে এবং নবম দীর্ঘতর পংক্তিটি ত্রিপদী ৮।।৮।।৬। মাত্রাভাগে রচনা করেছেন। সুতরাং স্পেনসেরীয় স্তবকাদর্শই কবি গ্রহণ করেছেন বলা যেতে পারে।

(৩) তের্জারিমা (ত্রিপংক্তিক মিলবন্ধের) সনেট ঃ

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে ; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি ; নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের ; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে ; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌-হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে—প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের পর
এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু, আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে ;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন,
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই ; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়—কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে ;

যেন কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

[ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ শকুন]

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পথ হাঁটা' সনেটটিও অনুরূপ ছন্দোবন্ধে লিখিত। কবি এখানে দীর্ঘ ছাব্বিশমাত্রার প্রবহমান পংক্তিবন্ধে কখক, খগখ, গঘগ, ঘঙঘ, ঙঙ—মিলবিন্যাসে সনেট রচনা করেছেন। বাংলা পদ্যে তের্জারিমা ছন্দোবন্ধ প্রমথ চৌধুরী ইতিপূর্বেই আমদানী করেছেন, জীবনানন্দ তাকে এবারে সনেট রচনায় ব্যবহার করলেন।১৪

জীবনানন্দের 'রূপসীবাংলা' কাব্যগ্রন্থে ৫৭টি সনেট সংকলিত হয়েছে। সনেটগুলি পয়ার পংক্তি থেকে দীর্ঘতর পংক্তিবন্ধে রচিত। অষ্টক-মিল সনেট পেত্রার্কীয় (কখখক, কখখক) রীতিতে দিয়েছেন, ষট্‌ক মিলে কিন্তু স্বাধীন মিলবিন্যাস-রীতি গ্রহণ করেছেন। অষ্টক-ষট্‌ক ভাবগত স্তবকবিভাগ সবত্র রক্ষা করেননি। দীর্ঘপংক্তির ধ্বনিগাম্ভীর্য সনেটের ভাব-গাম্ভীর্যের অনুসারী হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

	মিল
বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ	ক
খুঁজিতে যাইনা আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে	খ
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে	খ
ভোরের দয়েল পাখি —চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ	ক
জাম বট কাঁঠালের —হিজলের অশথের করে আছে চুপ,	ক
ফনীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে,	খ
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে	খ
এমনই হিজল বট- তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ	ক
দেখেছিল, বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—	গ
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—	ঘ
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,	ঘ
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে	গ

—

১৪। ইংরেজ কবি শেলী তার প্রখ্যাত Ode to West Wind কবিতা অনুরূপ চতুর্দশ পংক্তিক (কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ) পাঁচটি স্তবকবন্ধে রচনা করেছেন।

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেবেছিল ইন্দ্রের সভায় ঘ
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়। গ

[রূপসী বাংলা : ১ম সং : পৃ ৯২]

মুক্তকের বাক্‌ধর্মী গাম্ভীর্য

জীবনানন্দ দীর্ঘ পংক্তি বিন্যাসে সমিল এবং মিলহীন মুক্তক ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ পদ-পংক্তি তার মুক্তকে একটি মহিমান্বিত বাক্‌ধর্মী ধ্বনি-গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। এখানে একটি উদাহরণ তুলছি, -

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আর একটি প্রভাতের ইসারায় - অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে
টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে।
রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

[জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা : আট বছর আগের একদিন]

গদ্যকবিতা

জীবনানন্দের গদ্যকবিতা রবীন্দ্র-গদ্যকবিতা থেকে পাঠক মনে পৃথক আবেদন জাগায়। রবীন্দ্র-গদ্যকবিতায় ভাবাবেগ বেশী, বাক্‌পর্বে আবেগের এক বিশেষ স্পন্দন সেখানে প্রাধান্য পায়। জীবনানন্দের গদ্য কবিতার ভাবাবেগ সে তুলনায় কম ; চিত্রময় অর্থবাহী বাক্‌পর্ব গঠনে তিনি চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। ছোট ছোট সংযত চিত্রময় শব্দবিন্যাস ধীরে ধীরে পাঠকের চোখের সামনে যেন একটি ছবি পরিস্ফুট করে তোলে। ধ্বনি-আবর্তনের ছন্দবোধ যতিবিভক্ত ছোট ছোট বাক্‌পর্বের দ্বারাই গড়ে তোলেন তিনি। উদাহরণ তুলছি।—

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল, মচকাফুলের পাপ্‌ড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এলো।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোনো শিশির ভেজা গল্প।
সিগারেটের ধোঁয়া ;

টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;

এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

[জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ শিকার]

সজনীকান্ত

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) তাঁর 'ভাব ও ছন্দ, এবং 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা ছন্দের বিচিত্র বহু উদাহরণ রচনা করেছেন। 'ভাব ও ছন্দ' কাব্যগ্রন্থের 'মাইকেলবধ কাব্য অংশে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রখ্যাত কয়েকটি পংক্তির বিষয়বস্তু প্রাচীন চর্যাপদের ছন্দ থেকে আধুনিক সমর সেনের গদ্যছন্দ পর্যন্ত প্রায় সর্বপ্রকার ছন্দোবন্ধের অনুকরণ করে অপূর্ব ছন্দকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত সংশ্লিষ্ট দলবৃত্ত রীতি ছাড়া সমস্ত প্রকৃতির ছন্দই বিচিত্র আকৃতিবন্ধে প্রয়োগ করেছেন। পরিশিষ্টে নলিনীকান্ত সরকার-কৃত আঠারটি সংস্কৃত ছন্দের বাংলা পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য দু-একটি কলাবৃত্ত রীতির উদাহরণ তুলছি।

কলাবৃত্ত (১)

। । । । । । ॥
ই হু দি নী জু লি য়া
। । ॥ । । ॥
এ ল দ্বার খু লি য়া
॥ । । ॥ ॥
চোখ মেরে বিল খান
। । । । ॥
ধ রে সু মু খে।

ধরি তার কোমরে
স্মরি কবি ওমরে
কয় মিথ "দিল জান
এক চুমুকে
ও ঠোঁটের পেয়ালা
করি শেষ।"..."কি জালা!"—
জুদীকয়, লজ্জায়
লাল হয় গাল।
পোপোকেট্টাপেটেলে
তিনতলা হোটেলে

স্মিথ বসে গর্জায়

সুর ফাঁকতাল।

[পথ চলতি ঘাসের ফুল (১)]

এখানে ভাবযতির 'পংক্তিডিঙানো' প্রবহমানতা এবং পদ বা পংক্তি শেষে মুক্তদলের দ্বিকলা-প্রসারণ লক্ষণীয়। পংক্তি মিল : (৮।।৮।।৮।।৬I) ক।।ক।।—।।খI গ।।গ।।—।।খ।

(২) দুফুট বহর

বরফের ঘর

তাহারি শহর কেল্লা—

ওরে বেটা তিমি

মরণ নিকট

তোর যতখুশি জোরে চেল্লা।

তীরেতে দাঁড়ায়ে তোর চেঁচামেচি

ওই দেখ প্রিয়া শুন্‌ছে,

আমার সে চেনে, ভাবে মিছামিছি

তিমি কেন জল ধুন্‌ছে।

[পথ চল্‌তি ঘাসের ফুল (১৩)]

এখানে পদ-পংক্তির মিল, এবং স্তবকবন্ধের গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

(৩) দরদী বিধান রায়,

দরদী হলেও ডাক্তারি করে ঘাঁটা পড়িয়াছে মনে ;

রাত দিন তার কল -

মনখানি তার জুড়িয়া রয়েছে শিলং ও পলিটিক্স।

[কেডস ও স্যাণ্ডাল : শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী]

এটি কলাবৃত্ত অমিল মুক্তকের একটি সার্থক উদাহরণ। সজনীকান্ত গদ্য কবিতা লিখেছেন (কে. স্যা : আরব্য উপন্যাসের দেশ)। তবে সেখানে নতুন বৈচিত্র্য কিছু আনেননি। বাংলা ছন্দের ক্রম-অগ্রগতি সম্পর্কে সজনীকান্তের সচেতনতা তাঁর ব্যঙ্গ ও পরিহাসমূলক কবিতাগুলিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) বাংলা কাব্যে ভাব ও ভাষার দিক থেকে একটি নতুন আদর্শ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে তিনি অতি সাবধানী শিল্পী ছিলেন। সংবর্ত (২য় সং : ১৯৫৩) কাব্যের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন,—

"মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট ঃ আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় হয়েছে; শব্দ এবং ছন্দ উভয়েই যেহেতু পরজীবি, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।"

মালার্মের শব্দ-শিল্প প্রভাব

[সংবর্ত ২য় সং ঃ পৃ ১০]

উনবিংশ শতকের প্রতীক-ধর্মী ফরাসী কবি মালার্মে কাব্যের শব্দ গ্রহণে প্রত্যেকটি শব্দকেই বিশেষ অর্থ- ও ধ্বনি-দ্যোতনার প্রতি লক্ষ রেখে সাজাতেন। শব্দের ধ্বনিঝঙ্কারকেও এতটুকু ব্যর্থ হতে দিতে চাইতেন না;—অন্যদিকে অহেতুক কোনও শব্দই নিছক মাত্রা পুরণের বা মিলের খাতিরে ব্যবহার করতেন না। সুধীন্দ্রনাথ অনেকাংশে বাংলা কাব্যে সেই রীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। শব্দচয়নে তাঁর পরিধি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দই বিশেষ ভাবদ্যোতনা জাগিয়ে তুলবে এটিই তাঁর অভিপ্রেত ছিল,—আবার ছন্দে শৈথিল্যের তিনি প্রশ্রয় দেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘপদভাগে প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারেও নিখুঁত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দ-ব্যবহারের অসংযম তাঁকে পীড়িত করেছে। 'সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ', 'নামধাতুর বাহুল্য', 'হওয়া এবং করা-ধাতুর পৌনঃপুন্য', 'সম্বোধনের অনাবশ্যকতার', 'বিভক্তি-বিপর্যয়' ইত্যাদি যথেচ্ছাচার যে পদ্য-ভাষার ভাব- ও ধ্বনি-সৌষম্য শিথিল করে দেয় 'অর্কেস্ট্রা' (২য় সং ১৯৫৩) এবং 'প্রতিধ্বনির' (১ম সং ঃ ১৯৫৪) ভূমিকায় সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রুদ্ধদল-বহুল সুমিত শব্দ-গ্রন্থনে তিনি ছন্দে যে ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং দৃঢ় সংবদ্ধতা পরিস্ফুট করেছেন এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

শব্দগ্রন্থনে সংবদ্ধতা ও গাম্ভীর্য

নিশ্চিহ্ন সে নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে—
ধমাচ্ছিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।
কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল

আমাকে আবিল করে ; এক চক্ষু ছায়া,
দীপ্ত নখ, স্ফীত নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা।

[সংবর্ত : উজ্জীবন]

শব্দ বহু-ব্যবহারে মসৃণ হয়ে পড়ে। আবার দীর্ঘদিন অব্যবহারে পুরানো শব্দের আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে ; রূপদক্ষ শিল্পী সেই শব্দে কাব্যের ধ্বনি ও ভাবোৎকর্ষ ঘটাতে পারেন। সুধীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস-বোধের সঙ্গে মধুসূদনের মিল রয়েছে। ১৫

সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি জার্মান ও ফরাসী প্রখ্যাত কবিদের কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে তিনি মূল কবিতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে সযত্ন প্রয়াসী হয়েছেন, তবে বাঙালী পাঠকের উপযোগী ভাষা, উচ্চারণ প্রকৃতি ও ছন্দের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। বাংলা অনুবাদে ইংরেজি বা জার্মান উচ্চারণের প্রস্বর আনবার তিনি আবশ্যকতা বোধ করেননি।১৬ তাঁর অনুবাদ কবিতায় এবং মৌলিক রচনায় সনেটের

১৫। স্বগত গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন :

শব্দচয়ন সম্পর্কে মন্তব্য

...দুগ্ধপোষ্য শব্দের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শব্দই বেশী কর্মঠ,...। কিন্তু মানুষের কার্যকারিতার যেমন একটি সীমা আছে, তেমনি শব্দের সক্রিয়তাও অমিত নয়। শব্দের স্বভাব টাকার মতো, বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু মিউজিয়ামভুক্তি বিলুপ্তির নামান্তর নয়, অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন কমে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে।

অতএব রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরাণো শব্দও কাব্যের বাদ সাধে না, এবং ডাউটির রচনায় অ্যাংলো স্যাক্সন্ শব্দগুলোই আমার কথার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। উপরন্তু সম্ভ্রান্ত শব্দ সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অপভাষার পক্ষেও তা মিথ্যা নয়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাষানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু অসাধু, নবীন প্রবীন, দেশী বিদেশী সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা, কেননা ভাষা রূপেরই উপাদান।

[কাব্যের মুক্তি : স্বগত ১ম সং : পৃ ২৯]

অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে কবির মন্তব্য

১৬। 'প্রতিধ্বনি' কাব্যের ভূমিকায় কবি বিদেশীয় কবিতার বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—

আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব, এবং ইংরেজির ব্যাকরণ স্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি ফরাসীর মোহ অথবা

সংখ্যা কম নয়। সনেটের পংক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আঠারো মাত্রিক (৮।।১০) দ্বিপদীবন্ধে রচনা করেছেন। মিল-বিন্যাসে, স্তবক-বিভাগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেকস্‌পীয়রের আনুগত্য দেখিয়েছেন। অনেকগুলি জার্মান কবিতার (প্রতিধ্বনি ঃ হাইনে ও গ্যেটের কবিতা দ্র) অনুবাদে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত লঘুযতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। একটি শেকস্‌পীয়রের সনেটের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

সনেট রচনা

তথাপি নিশ্চিন্ত থাকো ঃ উগ্রচণ্ড যমদূত যবে,
আসিবে আমারে নিতে, শুনিবেনা কারও উপরোধ,
তখনও এ-কবিতায় মোর স্বত্ব বিদ্যমান রবে,
এ স্মৃতি-মন্দির দিবে চিরকাল তোমারে প্রবোধ।
এদিকে তাকালে পরে, খুঁজে পাবে বাণীর নিভৃতে
আমার তন্মাত্র তুমি, করেছি যা উৎসর্গ তোমারে ;
ধূলিই ধূলির প্রাপ্য, তাই শুধু মিলিবে ধূলিতে ;
আমার একাত্ম আত্মা গচ্ছিত তোমার অধিকারে।
যাবে যা মৃত্যুর গ্রাসে, নিতান্তই সে তো মলময়,
উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল, তথা ক্রিমিদের উপজীব্য শব,
অধমের গুপ্ত অস্ত্রে অপৌরুষ তার পরাজয়,
মনে রাখিবার মতো নেই তার তিলার্ধ বৈভব।
আধার অপ্রতিগ্রাহ্য, আধেয়ই মহার্ঘ কেবল ;
বর্তমান ছন্দোবন্ধে সে-সম্পদ, জেনো, অবিচল ॥

[প্রতিধ্বনি ঃ অবিনাশ ঃ শেকস্‌পীয়র]

জার্মানের অন্বয় তথা সমাস বাহুল্য যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর বঙ্গবাণীর মধ্যে আকাশ পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান। অন্ততঃপক্ষে ভুক্তভোগীরা জানেন যে পাশ্চাত্যের কোন কোন সদর্থক বক্তব্য যেমন আমাদের বোধগম্য হয় নেতির সাহায্যে, তেমনই আমরা এমন অনেক কথা প্রত্যক্ষ ব্যবহার করি যা পশ্চিমে বাগাড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা, এবং সেই জন্যে আমি বলতে পারিনা যে পরবর্তী পদ্য রচনা বিবিধ বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা তো বটেই, এমনকি ছন্দের দিক থেকেও যথাযথ অনুকরণ। অনুরূপ চেষ্টা আসলে বিড়ম্বনা, এবং ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ সত্যে পৌঁছতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলাম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শেই বিধিনিষেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপর্বিকের একান্ত ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয়, আমাদের কানে ভালো না লাগলে তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক। [প্রতিধ্বনি ঃ ভূমিকা পৃ ৯]

রবীন্দ্র অনুসৃতি

সুধীন্দ্রনাথ 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত অনেকগুলি ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেছেন।[১৭] অন্যান্য অনেক (প্রধানত প্রাথমিক যুগের রচনায়) কবিতায়ও ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্রপ্রভাব লক্ষ করা যায়। অর্কেস্ট্রা কবিতাগুচ্ছের একটি কবিতায় সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দও প্রয়োগ করেছেন। বিদেশী ছন্দোবন্ধ ও স্তবক-মিল একাধিক কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত কবিতাটির দুটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি,—

স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে ;
মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের গাত্রে ;

[অর্কেস্ট্রা : অর্কেস্ট্রা]

সুধীন্দ্রনাথের আসল কৃতিত্ব লঘু যতিভঙ্গের কবিতায় নয়, মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘপদী ছন্দকে প্রয়োজন মতো প্রবহমান বা যতিপ্রান্তিক রেখে শব্দের নীরন্ধ্র জমাট ধ্বনিঝংকারে যে গাম্ভীর্য এনেছেন সেখানে তিনি মধুসূদন ও মোহিতলালের উত্তরসূরী। তবে শব্দ নির্বাচনে তাঁদের তুলনায় অনেক বেশী সতর্ক সাবধানী শিল্পী। একাধারে ধ্বনি-অলঙ্করণ ও অনুপ্রাস, এবং অপরদিকে পরিমিত ও সুষ্ঠু ভাব-প্রকাশের এমন সমন্বয়-বোধ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অনন্যসুলভ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে এনেছে।

অমিয় চক্রবর্তী

বাংলা ছন্দে কবি অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১) পরীক্ষাও বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের দিক থেকে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথ যেমন শব্দের মিত-প্রয়োগে একটি নতুন রীতির পরীক্ষা চালিয়েছেন, অমিয় চক্রবর্তী তেমনি প্রতীকধর্মী আপাত অসংলগ্ন শব্দের ব্যবহারে নানাবর্ণের টুকরো

১৭। তুলনীয় : (অর্কেস্ট্রা কবিতাগুচ্ছ থেকে :) (১) রাত্রি শেষের দ্বিধা দুর্বল আলো (সুধীন্দ্রনাথ) : মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে (রবীন্দ্রনাথ : গীতালি : কলিকা)

(২) অস্তাচলে চন্দ্র দিশাহারা (সুধীন্দ্রনাথ) : একদা রাতে নবীন যৌবনে (রবীন্দ্রনাথ : সোনারতরী : নিদ্রিতা)

(৩) অগাধ গগন হতে দ্বিপ্রহরে (সুধীন্দ্রনাথ) : পবনে দিগন্তের দুয়ার নাড়ে (রবীন্দ্রনাথ : মহুয়া : বরযাত্রা)

(৪) সন্ধ্যাররাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে
অঙ্গার মসি প্রেমালোকে করে পূর্ণ
(সুধীন্দ্রনাথ) : যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া (রবীন্দ্রনাথ : কল্পনা : দুঃসময়)

(৫) আজি ফাগুন বেলার পরসাদ সায় হারায়ে
অকাল বাদলে (সুধীন্দ্রনাথ) : অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ। (রবীন্দ্রনাথ : উৎসর্গ : মরণমিলন)

(৬) স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম উরুতে
নিবিড় নীল নয়ন কোণে সজলস্মৃতি
অঙ্কিত (সুধীন্দ্রনাথ) : বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত নয়ন কার নীরব নীল গগনে (রবীন্দ্রনাথ : কল্পনা : মদনভস্মের পর)

ছবির সাহায্যে এক একটি সামগ্রিক চিত্রের আদল (impression) ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ভাবনাগুলি মসৃণভাবে ক্রমবিন্যস্ত না করে টুকরো টুকরো কল্পনা-উদ্রেককারী শব্দের বিন্যাসে তাঁর যে কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়,- ছন্দগ্রন্থনাতেও সেই একই মনের প্রতিফলন প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিগোষ্ঠীর মতো তিনিও পয়ার (বা পয়ারাঙ্গের কবিতা), মুক্তক বা গদ্যকবিতা লিখেছেন। দেশী, বিদেশী, তৎসম, এমনকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দবিন্যাসে ভাষায় বাকধর্মী স্বাভাবিকতা এনেছেন। অনেক সময় মিশ্র উচ্চারণ-রীতিতে বিশুদ্ধ মাত্রাভাগের পদ্যের সঙ্গে গদ্য কবিতার বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং লৌকিক উচ্চারণের দলবৃত্ত—প্রধান তিনটি ছন্দরীতিতেই নূতনত্ব এনেছেন। তবে প্রয়োজন মতো এই রীতিগত উচ্চারণের বাঁধাবাঁধি শিথিল করেছেন। তাঁর কাব্যের ভাব ও ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন,—

শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্য

> ..."প্রজ্ঞা নিয়ন্ত্রিত মিস্টিক চেতনা জেরার্ড ম্যানলি হপ্‌কিন্সেরও ছিল। বলতে কি, অমিয় চক্রবর্তীর মেজাজের সঙ্গে হপ্‌কিন্সের মেজাজের বহু মিল আছে।[১৮]···প্রচলিত ছন্দোশাস্ত্রে উভয় কবিই আস্থাহীন। সুটনবর্ণী অতিকথন দোষ থেকে কাব্যের উদ্ধারের জন্য হপ্‌কিন্স যেমন ছন্দের নব নব শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন ও ব্যাকরণ বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রানুকরণ থেকে বাংলা কাব্যের মুক্তির জন্য অমিয় চক্রবর্তীও তেমনি করেছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত শব্দার্থ-বিপর্যয় আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ সে কথা পূর্বেই বলেছি।
>
> উভয় কবির এই ব্যাকরণ-বিভ্রাট প্রকৃতপক্ষে ইমপ্রেশনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিজড়িত। ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন বিশুদ্ধ রঙের ছোপ আপাত বিশৃঙ্খলার সঙ্গে লাগিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণাঢ্যতার জীবন্ত ছন্দটি ধরতেন, হপ্‌কিন্স ও অমিয় চক্রবর্তী তেমনি ব্যাকরণকে ভেঙেচুরে ভাষার আদিমরূপে পরিবর্তিত করে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছেন।"
>
> [আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (২য় সং), পৃ ৩৩০]

হপ্‌কিন্সের পর ইংরেজি কাব্যে যাঁরাই vers libre বা free-verse লিখেছেন তাঁরাই কমবেশী 'sprung rhythm'-এর শিথিল বিন্যাসভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

হপকিন্সের স্প্রাংরিদম

১৮। Gerard Manley Hopkins (1844-1889)-এর Sprung Rhythm এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Herbert Read বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। –

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কয়েকজন কবি ছন্দমুক্তি-প্রয়াসী হয়ে শিথিল-বিন্যস্ত মিশ্র উচ্চারণরীতির এই 'sprung rhythm' এর অনুরূপ বাংলা উচ্চারণরীতির উপযোগী একটি ছন্দরূপ উদ্ভাবন করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী এই রীতির প্রবর্তকদের পুরোবর্তী হয়েছেন। হার্বার্ট রীড হপ্‌কিন্স-এর কাব্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন, অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় তার অধিকাংশই লক্ষিত হয়। কবি যুদ্ধের খবর শোনাতে গিয়ে লিখেছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং। তাতে গোয়েরিং, ফরাসী পল্টন,
গঙ্গাফড়িং বড়োবাজার,
হাতীর পা, ধর্মযাজক, উত্যক্ত বৃদ্ধ, ওয়ারশ, বর্ণডশ,
বর্মার হাজার
চুরোট, খুন, প্রহ্লাদ, জহ্লাদ, চাকরির দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম,
নির্বিকল্প সমাধি, ব্যাধি
ইত্যাদি হরেক প্রকার। এক মোড়কে। মা গৃধঃ
অবশ্যই লোভ করব না
—বলা বাহুল্য—বেছে নেব,
এম্পায়ার বৃত্তি প্রভৃতি পকেটে ভরব না।

[একমুঠো : যুদ্ধের খবর]

Common English rhythm (Running Rhythm) in use from the 16th to 19th century is measured by feet of either two or three syllables and never more or less.

In an underlying standard measure, if there is a foot reversed in nearly every line, this rhythm point counter to the proper flow. There the result is probably what Hopkins called Sprung Rhythm.

By this he meant rhythm measured by feet of from one to four syllables. In exceptional cases, for particular effects you may have feet of any number of weak or slack syllables—or on the one syllable—if there is only one. The result is a rhythm of incomparable freedom : any two stresses may either follow one-another running, or may be devided by one, two or three slack syllables. The feet are assumed to be equally long or strong, and their seeming inequality is made-up by pause or stressing...The scanning runs on without break from the beginning of stanza to the end, and all the stanza is one long stain,—though written on lines asunder.

Further, Hopkins claims that two licences are natural to sprung rhythm, The one is rests, as in music, the other is hangers or outrides, that is one, two or three slack-syllables added to a foot and not counted in the normal scanning.

Hopkins himself observed about such rhythm that is the most natural of things. It is the rhythm of common speech and of written prose , when rhythm is perceived in them. It is found in nursery rhymes, weather saws, and so on. ... ...

আপাত অসংলগ্ন টুকরো টুকরো শব্দ বসাতে গিয়ে কবি আকস্মিক যতি বাড়িয়েছেন,—আবার চিত্ররূপের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একের উপর অন্যছবি ভীড় করে পর পর এসে পড়েছে। প্রচ্ছন্ন মিলও কম দেননি। গোয়েরিঙ আর গঙ্গাফড়িং, ওয়ারস আর বর্ণ ডশ, প্রহলাদ আর জহলাদ সমাধি, ব্যাধি এবং ইত্যাদি, বলা বাহুল্য—বেছে নেব,—এমন বহু ব্যাক্যাংশের প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাস পাঠকের কানকে প্রসন্ন করে তোলে।

শিথিল দলবৃত্তের ব্যবহার

আবার এখানে লিখেছেন,—

গেল,

গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,

হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)

দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত্ হ্যায়

গৌর বসাকের প'ড়ে রইলো তরন্ত খেত খামার।

রাম নাম সত্ হ্যায়॥ [পারাপার ঃ সাবেকি]

এখানে দলমাত্রিক ছন্দোবন্ধের মাঝে অতিরিক্ত শব্দসমষ্টি (hangers অথবা out riders) 'রাম নাম সত্ হ্যায়' বৈষ্ণবগীতি-আখরের মতোই মাঝে মাঝে ফিরে এসে কাব্যের মূল সুরটি যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কবিতার সুরুতেই 'গেল' শব্দটির প্রয়োগ এবং দীর্ঘযতি (rests), অর্থ ও ছন্দের দিক থেকে গভীর ভাবোদ্যোতক হয়েছে।

ছড়ার-ছন্দের অনুরূপ চতুর্দল পর্বযতির মাঝে শিথিল ত্রিদল বা পঞ্চদল পর্ব ব্যবহার-দৃষ্টান্ত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যথেষ্ট দেখা যায়। এই শৈথিল্য sprung rhythm-এরই অঙ্গবিশেষ। যেমন—

প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,—

বেরিয়ে এলেই নেই।

In short we might say that Hopkins is eager to use device the language can hold to increase the force of his rhythm and the richness of the phrasing. Point, counter point, rests, running over, rhythm, hangers or outrides, slurs, end-rhymes, internal rhymes, assonance and alliterations—all are used to make the verse sparkle like rich, irregular crystals in the gleaming flow of the poets limpid thought. [English Critical Essays (20th Cen) : The Poems of Gerard Manley Hopkins :
Herbert Read : P. 369 370 : 1056 impression]

'ভিতরে কত' লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায়
সবুজ অন্ধকার ;
জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ বটের ঝুরি,
'ভিতরে কত' 'আরো গভীরে' জন্তু চলে, হলদে পথ,
তীব্র ঝরে 'জ্যোৎস্না হিম' বুক চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড 'মেঘের ঝড়' 'বৃষ্টি সেই' আরণ্যক—
বেরিয়ে এলেই নেই। [পারাপার ঃ বৈদান্তিক]

এখানে 'ভিতরে কতো', 'আরো গভীরে' পর্বগুলিতে পঞ্চদল রয়েছে, আবার পংক্তির মাঝে 'জ্যোৎস্না হিম', 'মেঘের ঝড়', 'বৃষ্টি সেই' ত্রিদল-পূর্ণপর্ব ব্যবহার করেছেন। ভাবমুক্তির একটি উপায় হিসেবেই এই শিথিল ছড়ার ছন্দোরূপের পুনঃপ্রবর্তন সাম্প্রতিক কালে হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ যেমন ভিক্টর হুগোর আদর্শে চতুষ্কোণাকৃতি কবিতা রচনা করেছেন, অনুরূপ অমিয় চক্রবর্তীও কামিংস-এর অনুসরণে ছন্দের আলপনা তৈরী করেছেন (অভিজ্ঞান বসন্ত ঃ অভিজ্ঞান দ্র)। ছন্দের ধ্বনিগত বিচারে এর বিশেষ মূল্য রয়েছে মনে হয় না।

অমিয় চক্রবর্তী ছন্দের সুবিন্যস্ত ধরাবাঁধা রবীন্দ্র পদ্যবন্ধ-রচনারীতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসুকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমায় নিজের দিক থেকে বলব ঢের বেশী তৃপ্তি পাই অন্তর্লীন ঝঙ্কৃত এবং সংহত Verse Libre এর রাজ্যে।"[১৯] দীপ্তি ত্রিপাঠিও উল্লেখ করেছেন, 'গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে পদ্যের চমক খেলানোও অমিয় চক্রবর্তীর বৈশিষ্ট্য।'[২০] ভাবমুক্তির এক নতুন পথিকৃৎরূপে কবি অমিয় চক্রবর্তী সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) অমিয় চক্রবর্তী বা বিষ্ণু দে-র তুলনায় প্রচলিত বাংলা ছন্দের আনুগত্য অনেক বেশী মেনে চলেছেন। লৌকিক দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত—বাংলা ছন্দের প্রধান তিনটি রীতিই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্তের ব্যবহারে তাঁর কিছু স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায়ও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বাক্‌ধর্মী বাক্য গঠন প্রবণতা, অমিল ও সমিল মিশ্র পংক্তিবন্ধ ব্যবহার, অপ্রাত বি-সম শব্দের

১৯। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (২য় সং) পৃ ৮৬
২০। ঐ

আকস্মিক চমক ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথের মতো ছন্দের দৃঢ়বদ্ধতা প্রেমেন্দ্র মিত্র পছন্দ করেননি,—আবার অমিয় চক্রবর্তীর মতো 'Verse Libre' এর শিথিল রাজ্যে বিচরণও তাঁর মেজাজের অনুকূল নয়। নজরুলের দীপ্ত বলিষ্ঠ প্রকাশাবেগ তাঁর ছন্দে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-মুক্তক ও গদ্য কবিতার প্রভাবও তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়।

দলবৃত্ত মুক্তক

লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দকে প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন ভাবের পরিবেশনায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ-ছন্দের মুক্তক রচনায় তিনি অমিয় চক্রবর্তীর মতো পর্বের দলবিন্যাসে শৈথিল্য রাখতে চাননি। যেমন—

চিনি তো জল, আকাশ মাটি
মরণ ভীরু রৌদ্র-পায়ী জানি প্রাণের লীলা ;
হটাৎ যেন এসব চেনার অতীত
গিরির গহন হৃদয় থেকে
উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে
পেলাম আরেক দিশা। [সুড়ঙ্গ ঃ ফেরারী ফৌজ]

প্রতি পর্বেই সুনিদিষ্ট চতুর্দল বিন্যাস করেছেন কবি (তু. পারাপার পৃ ১১০)।

কলাবৃত্ত রীতির সুষ্ঠু প্রয়োগেও প্রেমেন্দ্র মিত্র সফল হয়েছেন। নজরুলের মতো কয়েকটি কবিতায় এই ছন্দরীতির উদাত্ত বলিষ্ঠ ভাবময় প্রকাশভঙ্গি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কবির 'প্রথমা' কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত বেনামী বন্দর, আমি কবি যত কামারের, সুদূরের আহবান, বা পথভ্রান্ত কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কলাবৃত্তের চতুষ্কল পর্ববিন্যাসে কবি বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন—

সবল কলাবৃত্ত

নীল। নীল।
সবুজের ছোঁয়া কিনা, তা বুঝিনা
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশী নীল।
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙচিল।
ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,
সাদা ফেনা থেকে যেন

শাঁখ-মাজা ডানা মেলে
আকাশের তল্লাস নিচ্ছে।
মিথ্যেই
মিল খোঁজা মন চায় উপমা।
নেই, নেই।
হৃদয় দুচোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,
সেই। সেই।

[সাগর থেকে ফেরা : সাগর থেকে ফেরা]

এখানে 'নীল। নীল।' 'নেই। নেই।' 'সেই। সেই।' পংক্তি-ধৃত শব্দসমষ্টির উচ্চারণে যে যতি ও প্রসারণ আসছে তাতে প্রতি শব্দই একটি পূর্ণ চতুর্মাত্রক পর্বের মর্যাদা পাচ্ছে। যতি-বৈচিত্র্য, উচ্চারণ-প্রসারণ ও মিলবিন্যাসে কবি সাগরের যে ছবি এঁকেছেন তার আবেদন চতুষ্কল অন্যান্য কলাবৃত্ত রীতির কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পাশাপাশি কবির আর একটি চতুষ্কল পদ্য-নিদর্শন তুলছি,—

হাওয়া বয় সন্‌সন
তারারা কাঁপে।
জেনে কিবা প্রয়োজন
অনেক দূরের বন
রাঙা হ'ল কুসুমে, না
বহ্নি তাপে?
হৃদয় মরচে ধরা
পুরোনো খাপে! [সাগর থেকে ফেরা : জং]

উভয় কবিতার গঠনভঙ্গি এবং উচ্চারণ ভিন্নতর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কলাবৃত্ত রীতির মিশ্র মিল-অমিল পংক্তি-বিন্যস্ত মুক্তক রচনাতেও বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। যেমন—

বিনুনী তোমার নামাও র‍্যাপুঞ্জেল!
ঢেলে দাও সব সোনা।
বুনবো কামিজ
শীতার্ত যত মানুষের বুক ঢাকতে
যৌবন বার্ধক্য
চিরন্তন অসখ্য।

কুন্তলে হাত দিও না মা।
দৃঢ় বিশ্বাসে বাধা জয়ী যৌবন
এই উজ্জ্বল রজ্জু উঠুক বেয়ে।
স্বপ্নের চুমা পাড়তে মানুষ অনেক উর্ধে চড়ে।
জরা আর যৌবন
সত্যেরে দেখে দুই দিকে দুই জন।

[প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ সোনালি চুলের গান]

ছয় কলার পর্বভাগে, অমিল চতুষ্পঙ্ক্তিক স্তবকের মাঝে মাঝে সমিল দুটি করে পংক্তি এনে ছন্দের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বাড়িয়েছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও বিচিত্র পংক্তিবন্ধের পদ্য রচনা করেছেন। মুক্তক রচনায় হ্রস্ব-দীর্ঘ পংক্তিবিন্যাসে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। গদ্যকবিতাও কিছু কিছু রচনা করেছেন। এ-যুগের ছন্দে যে উচ্চারণ-শৈথিল্যের পরীক্ষা চলেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার প্রশ্রয় দেননি। বাক্য রচনায়, মিল ও চিত্রকল্প ব্যবহারে তিনি সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তীর মতো অতটা সাবধানী ছিলেন না। ছন্দের উপকরণ সংগ্রহে তিনি প্রধানত রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী কবিদেরই বেশী অনুসরণ করেছেন। দু-একটি কাব্যের ছন্দোবন্ধে রবীন্দ্রনাথের (যেমন 'প্রথমা' কাব্যে 'বলাকা'র) সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রেমেন্দ্র পাশ্চাত্য কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন;—তবে আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যন্ত কম।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪) ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দোবন্ধে, বিশেষত কয়েকটি বিদেশী ছন্দোবন্ধ রচনায় চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ক্লেরিহিউ (Clerihew) এবং লিমেরিক (Limerick) ছড়া-গুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ক্লেরিহিউ

ক্লেরিহিউ চার পংক্তির (দ্বিপদী মিলের) এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ছড়াজাতীয় কবিতা। কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম দিয়ে সুরু হয় এবং চার পংক্তি পরিসরেই তার জীবন-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়। ইংরেজী কাব্যে ই. ক্লেরিহিউ (বেণ্টলী) এই কবিতার প্রবর্তক। ১৯০৫-এ প্রকাশিত Biography for Beginners বইতে প্রথম তিনি এই জাতীয় ছড়া লিখেছেন।[২১]

২১। একটি ইংরেজি ক্লেরিহিউ কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি।

ALFRED DE MUSSET
Used to call his cat 'Pusset'
(his accent was affected
That was to be expected)

[The poet's Tongue : Ed by : W H. Auden and John Garret]

অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' কাব্যগ্রন্থে এই জাতীয় কয়েকটি ছড়া লিখেছেন। যেমন—

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিম্বা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা।

[উড়কি ধানের মুড়কি]

একটু শিথিল উচ্চারণের লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও শিথিল ছড়ার উপযোগী ছন্দও কবি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(২) পণ্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

[উড়কি ধানের মুড়কি]

লিমেরিক

লিমেরিক হল, অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত পাঁচ পংক্তি-বন্ধের (মিল : ককখকক) অর্থহীন ছড়া। এডোয়ার্ড লীয়র তাঁর Book of Nonsense (১৮৪৬) গ্রন্থে এই ছড়া লিখে নতুন করে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছেন। ইংরেজি অধিকাংশ লিমেরিক ছড়ার বিষয়বস্তু হল বিরোধাভাস (epigram)-যুক্ত হালকা শ্লেষ-বিদ্রূপ। অনেক সময় শেষ পংক্তিতে এই শ্লেষ সার্থক বিরোধাভাসের রূপ নেয়।[২২] অন্নদাশঙ্কর কয়েকটি চমৎকার লিমেরিক লিখেছেন। এখানে একটি উদ্ধৃত করছি,—

এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুস।

২২। এডোয়ার্ড লীয়র রচিত একটি লিমেরিক ছড়া এখানে উদ্ধৃত করছি।—

There was an old man of Khartoom
Who kept two tame sheep in his room.
"For" he said, "they remind me
of one left behind me.
But I cannot remember of whom."

[Encyclopaedia Britanica : Vol 14]

অবশেষে একদিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন—
ফানুস ওড়ায় মানুষ ।।

[রাঙা ধানের খৈ ঃ লিমেরিক]

অন্যান্য ছড়া রচনা

অন্নদাশঙ্কর ছড়া জাতীয় কবিতায় ছন্দের পর্ব-পদবন্ধ শিথিল করে শিশুমনের আমেজটুকু চমৎকার ফুটিয়েছেন। তার 'রাঙা ধানের খৈ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কলাবৃত্ত রীতিতে লেখা 'আর্তনাদ' বা লৌকিক দলবৃত্ত লেখা 'কঁদুনি' ও 'খুকু ও খোকা' কবিতা দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একাধিক কবিতায় ছড়ার শিথিলবন্ধ ছন্দে নাট্য-সংলাপ দিয়েছেন ('দুই বেড়াল এক বাঁদর', 'জনরব'—রাঙা ধানের খৈ দ্রষ্টব্য) ; — সেখানেও শিশু কাকলির ছন্দ ধরা পড়েছে ;—মূলত কবি লৌকিক দলবৃত্ত রীতি এই কাব্যনাট্য গুলিতে ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু

আলোচ্য যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ছন্দে ভাবমুক্তির পরীক্ষায় অনেকাংশে সফল হয়েছেন বলা চলে। অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তাঁর লক্ষ্য হল, ছন্দকে যথাসম্ভব কৃত্রিম উচ্চারণ-মুক্ত করে চলতি ভাষার বাক্‌ধর্মী স্বাভাবিকতা দান। সে কারণেই প্রয়োজনবোধে তিনি বিভিন্ন ছন্দরীতির উচ্চারণকে অনেক সময় শিথিল করেছেন।

মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক

কলাবৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দ কবি বৈচিত্র্যময় নানাভঙ্গিতে ব্যবহার করলেও মিশ্রবৃত্ত (কবির ভাষায় 'পয়ার জাতীয় ছন্দ) ছন্দেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন মনে হয়।[২৩] জীবনানন্দের মতো এ-ছন্দে তিনি দীর্ঘ পদভাগের মুক্তক লিখেছেন। যেমন—

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর তলে ;
ভঙ্গুর হৃদয় মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘপথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষা-গানে
আজ তার নাহিকো আভাস।
আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে পড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্ত মুখে
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধ স্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।

[বন্দীর বন্দনা ঃ শাপভ্রষ্ট]

২৩। কবি মন্তব্য করেছেন: "বাকরীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। বস্তুত বাঙালির কথা বলার স্বাভাবিক ছন্দও পয়ার ছন্দ।" [সাহিত্যচর্চা পৃ ১০৬-১০]

চলিত ভাষার স্বাভাবিকতা

কবি চলিত ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে লিখেছেন,—

এরা তো বাঙালি নয় ॥ 'কী' ক রে জান্‌বে
'মা' বাবা ভাই বোন ॥ স্বামী 'স্ত্রী'
এ সব কথার মানে 'কী' [দময়ন্তী ঃ বিদেশিনী]

এখানে বুদ্ধদেব বসু 'কী' (১ম ও ৩য় ছত্রে), 'মা' এবং 'স্ত্রী' শব্দগুলি প্রসারিত দ্বিমাত্রক উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন, আবার 'জান্‌বে' শব্দটি সংশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রিক রূপে গণ্য করেছেন। কবি নিজেই এ-সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,—

"যদি লিখতুম

মাতা, পিতা, ভাই বোন ॥ পত্নী, স্বামী
এসব কথার কী যে ॥ মানে

তাহলে যা হ'তো এও তাই, কিন্তু ঠিক তাও নয়। যেটা লিখেছি, সেটা শব্দচয়নে ও বাক্‌বিন্যাসে হুবহু মুখের কথার মতো ব'লে সহজ ও জোরালো লাগছে।"

[আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (২য় সং) ঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী ঃ পৃ ১৪২-৪৩ দ্র]

সনেট রচনা

বুদ্ধদেব বিভিন্ন রীতিতে অনেকগুলি সনেট লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে দীর্ঘ ছাব্বিশ মাত্রার পংক্তি থেকে হ্রস্ব দশমাত্রা পংক্তিবিন্যাসের সনেট লিখেছেন তিনি। মিল ও স্তবক বিন্যাসে পেত্রার্কার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রথম দিকের রচনায় বেশী প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী রচনায় শেকস্‌পীয়রের প্রভাব লক্ষিত হয়। ছোট বড়ো মুক্তক পংক্তিতেও তিনি সনেট রচনা করেছেন।[২৪] এখানে তাঁর দশমাত্রা পংক্তির এবং মুক্তক পংক্তি-বিন্যাসের দুটি সনেট উদ্ধৃত করছি।—

২৪। বুদ্ধদেবের সনেট সম্পর্কে দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখছেন ঃ

"সনেট সম্বন্ধে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এ দেখা যায়। দশ মাত্রার সনেট 'স্মৃতির প্রতি : ৩,' 'আটচল্লিশের জন্য : ৩' যেমন ছান্দসিকের পক্ষে কৌতূহলকর তেমনি ১৬ চরণের সনেট 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়', 'নবম প্রণয়', 'মুক্তির মুহূর্ত', বা 'সবেশ্বরা'। বোদলেয়ার-সুলভ সম্বোধনের ভঙ্গিতে রচিত অথচ উচ্চকিত নয় এমন ধরণের সনেট বাংলা সাহিত্যে নতুন।"

[আধুনিক বাংলা কাব্য পং-চ ২য় সং) ঃ পৃ ঃ ১৪৬]

(১) দশমাত্রা পংক্তির সনেট ঃ দলবৃত্ত ঃ **মিল**

পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি রেখো কড়া — ক
ছাঁটা চুলে যত্নে এঁকো টেরি ; — খ
লোকে দেখে ভাবুক, 'আমাদেরই !' — খ
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া । — ক

সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া — গ
আক্রমণ, কাফে-র করতালি, — ঘ
অবসাদের মলিন জোড়াতালি ।— — ঘ
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া । — গ

ঢাল-তলোয়ার আর কি তোমার আছে, — ঙ
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে — চ
ভ্রূণের মতো, অকথ্য সেই আগুন ? — ছ

আর তাছাড়া, সত্যি যদি উনুন — ছ
রাঙিয়ে তোলে নিঃশ্বাসের হাওয়া— — জ
আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া ! — জ

[বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ এক তরুণ কবিকে]

(২) মুক্তক পংক্তিবিন্যাসের সনেট ঃ মিশ্র কলাবৃত্ত ঃ শিথিল উচ্চারণ ভঙ্গি ঃ

মিল

শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত । গভীর সন্ধ্যায় — ক
নরম, আচ্ছন্ন আলো ; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার — খ
লুকানো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার ; — খ
অথবা অত্বর চিঠি ; মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায় — ক

দূরের বন্ধুকে লেখা । যীশু কি পরোপকারী — গ
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির — ঘ
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী অশীতির — ঘ
মোহগ্রস্ত সভাপতি ? উদ্ধারের সত্বাধিকারী — গ

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা — ঙ
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া । — ঙ
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে ; — চ

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির। ছ
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর, ছ
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশী পাবে। চ

[বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ রাত তিনটের সনেট ঃ ১]

এখানে ভাষায় গদ্যের উপযোগী বাক্‌ধর্মী স্বাভাবিক উচ্চারণ রাখতে গিয়ে কবি মাত্রা প্রসারিত করেছেন। তবে উভয় কবিতাতেই স্তবকবিন্যাসে ভাবগত গুরুত্ব সর্বত্র রক্ষিত হয়নি।

কলাবৃত্ত ছন্দ

কলাবৃত্ত রীতির পদ্যরচনায় বুদ্ধদেব কিছু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর মিলহীন স্তবকের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বৃথাই জপিয়েছি | তোমারে, মন, ॥
থামাও অস্থির | চ্যাঁচামেচি। I
কোথায় অর্জুন। কোথায় কামরূপ।
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

[বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ অসম্ভবের গান]

কবি এখানে ৭।৫॥৭।৫I ৭।৭॥৭।৫I-মাত্রাভাগে দ্বিপংক্তিক স্তবক রচনা করেছেন। সাত মাত্রার পর্ব কবি 'কালো চুল' ('দ্রৌপদীর শাড়ী' কাব্যগ্রন্থ দ্র) কবিতাতেও ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধদেব কালিদাসের মেঘদূত অনুবাদে সাতমাত্রার তিনটি পর্বের পর তিন, চার বা পাঁচ মাত্রার একটি পর্ব দিয়ে যতিপ্রান্তিক অমিল চতুষ্পংক্তিক শ্লোক রচনা করেছেন। যেমন—

কামের উদ্রেক | যে করে, সেই মেঘে | সহসা দেখে তার | সম্মুখে
যক্ষ কোনোমতে | চোখের জল চেপে | ভাবলে মনে মনে | বহুক্ষণ ঃ
নবীন মেঘ দেখে | মিলিত সুখীজন | তারাও হয়ে যায় | অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, | যদি সে দূরে থাকে | সে চায় কণ্ঠের | আলিঙ্গন।

[কালিদাসের মেঘদূত ঃ পূর্বমেঘ ঃ ৩য় শ্লোক ঃ পৃ ৭৯]

কালিদাসের মেঘদূত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'যক্ষের নিবেদন' কবিতায় (পৃ ৯০ দ্র) লঘুগুরু দলবিন্যাসরীতি ঠিক রেখে যথাক্রমে আট-সাত-সাত-পাঁচ-মাত্রাভাগে কলাবৃত্ত রীতিতে বাংলা মন্দাক্রান্তা রচনা করেছেন। এমন

...নির্দিষ্ট দলবিন্যাসে সমগ্র মেঘদূতের অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বিকল্পরীতি হিসাবে ইতিপূর্বেই কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 'মেঘদূত' অনুবাদে ৭।৭।৭।৫-মাত্রাভাগে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় 'মেঘদূত পরিচয়' অংশে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দকেই সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার বিকল্প' বাংলা ছন্দ রূপে গণ্য করেছেন।[২৫] সুতরাং বুদ্ধদেব মূলত প্যারীমোহনের রীতিকেই গ্রহণ করে সমিল পংক্তির পরিবর্তে অমিল পংক্তি রচনা করেছেন এবং পংক্তির চতুর্থ (পঞ্চমাত্রিক) পর্বটিকে মাঝে মাঝে ত্রিমাত্রক ও চতুর্মাত্রক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।· অনুবাদের ছন্দে প্যারীমোহন সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে তাঁর তুলনায় আরও বেশী স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানে তুলনাত্মক বিচারের সুবিধার্থে প্যারীমোহনের উক্ত শ্লোকের (ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠ) অনুবাদ অংশও উদ্ধৃত করছি,

২৫। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্যটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

> ...যৌগিক অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিরূপকে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নয়, ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং গতিমন্থরতাই মন্দাক্রান্তার মর্মস্বরূপ। অথচ সাধারণ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিগাম্ভীর্য ও গতিমন্থরতা তো নাইই বরং ধ্বনির লঘুতা ও গতির নৃত্যপর চপলতাই ওই ছন্দের বিশেষত্ব। অতএব মন্দাক্রান্তার ধ্বনিগত স্বরূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া মেঘদূতের অনুবাদ করিতে হইলে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। মন্দাক্রান্তা মতের অক্ষরের ছন্দ এবং সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রমতে যথাক্রমে চার, ছয় ও সাত অক্ষরের (syllable) তিনটি পর্বে প্রত্যেক পংক্তি বা চরণ বিভক্ত, প্রত্যেক পর্বের পরই যতি। কিন্তু বাঙালীর কানে সাত অক্ষরের তৃতীয় পর্বটি অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় এবং সুযোগ পাইলেই তৃতীয় পর্বের চতুর্থ অক্ষরের পর আর একটি যতির জন্য বাঙালীর কান ব্যগ্র হইয়া উঠে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে বাংলা মন্দাক্রান্তা ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন তাতে তিনিও তৃতীয় পর্বের চতুর্থ অক্ষরের পরে বাঙালী কানের অপরিহার্য এই নূতন যতিটিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।
>
> অতএব মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলা মাত্রাবৃত্তে রূপান্তরিত করিতে গেলে তার প্রত্যেক পংক্তির চারটি পর্বে যথাক্রমে আট, সাত, সাত এবং পাঁচটি করিয়া মাত্রা দরকার হয়, তাহা হইলেই অন্তত পর্বচ্ছেদ বিষয়ে মন্দাক্রান্তার অনুরূপ ছন্দ হইবে। কিন্তু মাত্রাবৃত্তে একপর্বে আট মাত্রা ও তারপরেই দুইটি সাত সাত মাত্রার পর্ব রচনা করার বিপদ আছে, কারণ তাতে ছন্দের মধ্যে অশোভন রকম ধ্বনিবৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং প্রথম পর্বটি হইতে একটি মাত্রা কমাইয়া দিয়া প্রথম তিনটি পর্বকেই সপ্তমাত্রিক করাই সবচেয়ে নিরাপদ, তাতে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলার মাত্র একমাত্রার পার্থক্য হইবে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনটি সপ্তমাত্রিক ও একটি পঞ্চমাত্রিক পর্বের সাহায্যে বাংলা ছন্দ যথাসম্ভব সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার সারূপ্য লাভ করিবে। প্যারাবাবু মেঘদূতের অনুবাদকালে এই ত্রিসপ্ত পঞ্চমাত্রিক ছন্দের আশ্রয় লইয়া ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই মনে করি। [মেঘদূত । 'মেঘদূত পরিচয়' ঃ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ঃ ২য় সং (১৩৪৬) পৃ ২২-২৮ দ্র]

যে মেঘ দরশনে | ফুটিয়া উঠি' সদা | কেতকী ফুল-কুল | সুখে দোদুল
যক্ষ তারি আগে | নীরবে ভাবে কত, | হৃদয় হয়ে উঠে | বাষ্পাকুল।
হেরিয়া জলধর | সুখীরো অন্তর | রহিতে চাহে না যে | অচঞ্চল ;
কণ্ঠনীল প্রিয়|জনেরে ছেড়ে দূরে | রহে যে তার দশা | কিবা তা বল্ ?

[ঐ ঃ পৃ ৪-(

কলাবৃত্ত ছয় মাত্রার পর্বে কবি তার প্রখ্যাত 'কঙ্কাবতী' বিষয়ক কয়েক কবিতা রচনা করেছেন (দ্র সেরিনাড,[২৬] কঙ্কাবতী, আরশি ...কঙ্কাবতী)। এক কবিতায় পূর্ণপংক্তিশেষে বার বার 'কঙ্কাবতী' নামটির পুনরাবৃত্তি টেনিসনের 'T] Ballad of Oriana'[২৭] কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন —,

মাঝরাতে আজ বাতাস জেগেছে, শুনতে পাও ?
কঙ্কাবতী।
এলো এলোমেলো ব্যাকুল বাউল উতল বাও,
কঙ্কাবতী।

[কঙ্কাবতী ঃ সেরিনাড

কলাবৃত্ত মুক্তক ব্যবহার সম্পর্কে কবির মতবাদ

কলাবৃত্ত রীতির মুক্তক রচনা তেমন সফল হতে পা না পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধদেব এ সম্প মন্তব্য করেছেন,—

পয়ারের মতো স্বাধীনতা না থাকলেও মাত্রাবৃত্ত তার বাঁধনকে অনেকখা আলগা করে দিতে পারে বই কি এবং মুক্তকের উঁচু নিচু রাজ্যে তা তিনমাত্রার নাচ দেখতে শুনতে ভালোই হয়।

[সাহিত্যচর্চা ঃ পৃ ১০৭

২৬। সেরিনাদ ঃ
"Music played by a lover under his lady's window at night."
French : se're'nade, Lat' : sere'nus, Italian , Serenata.
(Chambers' Dictiona

২৭। তুলনীয়।

My heart is wasted with my woe
Oriana
There is no rest for me below
Oriana
When the long dun worlds are ribb'd
with snow
And loud the Norland whirlwinds blow,
Oriana
Alone I wonder to and fro
Oriana

(The Ballad of Oriana : Tennyson

'কঙ্কাবতী' কাব্যের একাধিক কবিতায় কবি এ রীতির পরীক্ষা করেছেন।

দলবৃত্ত রীতি

দলমাত্রিক ছড়ার ছন্দ বুদ্ধদেব ব্যবহার করেছেন বটে তবু 'গাম্ভীর্য এ ছন্দের প্রকৃতিগত নয়' এবং 'অনেক ভাব এ ছন্দ বহন করতে পারে না' তা উপলব্ধি করেছিলেন। সে কারণেই এ ছন্দের বহুল প্রয়োগ করেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মন্তব্য করেছেন 'পয়ারের পরেই ছড়ার ছন্দ। এই ছন্দই আমাদের মৌখিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি।' (দ্র দময়ন্তী ঃ পৃ ৭৪)। এ ছন্দেও চলিত ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশে কবি কতটা সফল হয়েছেন তার একটি উদাহরণ তুলছি।—

কবি মশাই, অনেক তো ধান ভানলেন ;
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক'রে,
ব্যাপারটা কী ? আপনি হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে পড়ে ?
ঠিক না ? তা বলুন না সে কেমনতর ?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ;
লোকেরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন ?

[শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর ঃ কবি মশাই]

ছড়ার লঘু যতিস্পন্দ

বুদ্ধদেব বসু 'বারোমাসের ছড়া'র কয়েকটি কবিতায় লঘুযতিস্পন্দ ও মিলের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। কোথাও কোথাও শিশু-কাকলির ফুলঝুরি সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন—

এ কী
জোনাকি
তুই কখন
এলি বল তো।
একলা
এই বাদলায়
কেন কলকা-
তায় এলি তুই ?
(এই সারারাতজ্বলা চির দীপমালা দেয়ালি আলোয়)

[বারোমাসের ছড়া ঃ জোনাকি]

গদ্য কবিতা

গদ্য কবিতা রচনাতেও বুদ্ধদেবের স্বকীয়তা রয়েছে। তাঁর 'তুমি যখন চুল খুলে দাও', 'এই শীতে', 'স্পর্শের প্রজ্বলন', প্রভৃতি কবিতায় [নতুন পাতা] ছোট ছোট বাক্পর্বে আবেগস্পন্দিত পদক্ষেপ চমৎকার ফুটে উঠেছে। বাক্যাংশের পুনরুক্তি ধ্বনি ও ভাবের আবর্তন সৃষ্টি করেছে। যেমন—

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভেসে আসে তোমার চুলের গন্ধ,
গুন্‌গুন্‌ করে গান করো তুমি
ভয়ে আমার বুকে কাঁপে।

গুন্‌গুন্‌ করে গান করো
আমার পাশে বসে ঃ
তোমার মুখ দেখা যায় না,
বুকে এসে লাগে চুলের গন্ধ
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

[নতুন পাতা ঃ তুমি যখন চুল খুলে দাও]

অন্তর্লীন মিল

এ যুগের অন্যান্য কবিদের মতো বুদ্ধদেবও গদ্য কবিতায় অন্তর্লীন অনুপ্রাস এনেছেন। দু একটি কবিতায় এই মিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন—

"তোমাকে বু'কে ক'রে তোমাকে বুকে ভরে কাটে আমার রাত্রি।
সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার মন্থিত মুহূর্তে
থমকে দাঁড়ায়—যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরাসু মহাশূন্যের যাত্রী—
কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়ছে।

[নতুন পাতা ঃ জন্ম]

সমগ্র কবিতাটিতেই এমন মিলের সচেতন পরীক্ষা করেছেন কবি।

বুদ্ধদেব বসু ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। ছন্দে বাক্‌ধর্মী উচ্চারণ কতটা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করা চলে তার যেমন পরীক্ষা করেছেন, প্রাসঙ্গিক ভাবে

একাধিক প্রবন্ধে ছন্দের রীতি ও বন্ধ সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন।[২৮] এই সকল আলোচনা সর্বাংশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, নতুন কাব্য রচনায় বা আধুনিক কবিদের সমালোচনায় তিনি যে রবীন্দ্রোত্তর বাকধর্মী নব ছন্দরীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

ছন্দ সচেতনতা

সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্য বিচার

আলোচ্য যুগের সঙ্গীতজ্ঞ-ছান্দসিক কবি দিলীপকুমার রায়ের (১৮৯৭) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা পদ্যে 'লঘু-গুরু' নাম দিয়ে সংস্কৃত ছন্দ যে বিশিষ্ট রীতিতে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। একটি পত্রে 'লঘু-গুরু' ছন্দ সম্পর্কে লিখেছেন,—

"এ হচ্ছে সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ। অর্থাৎ এতে শুধু যুগ্মধ্বনিই দুমাত্রার মর্যাদা পাবে তাই নয়, এতে গুরু বর্ণও—(আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ) টেনে দুমাত্রাকাল স্থায়ী হবে সর্বত্র। অ ই উ- অর্থাৎ লঘু স্বরবর্ণ - অবশ্যই এতেও একমাত্রা।"

[পত্রগুচ্ছ ঃ কল্পনাকুমারকে লেখা পত্র ঃ অনামী (১ম সং) পৃ ৪০২]

অবশ্য 'লঘু-গুরু' ছন্দে কবিতা রচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কবিতার ভূমিকায় আবার বলেছেন,—

...এ কয়টি কবিতা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত—কিন্তু হুবহু সংস্কৃত ছন্দ নয়। তাই এ ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দ না বলে লঘু-গুরু ছন্দ বলাই ভালো।. সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে এর মিল এইখানে যে এ ছন্দের দীর্ঘ স্বরবর্ণ আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ—সংস্কৃত ছন্দের মতোই দুমাত্রা। অমিল এইখানে যে যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ সংস্কৃতে সর্বত্রই গুরু দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে আর বাংলা (লঘু-গুরু) ছন্দে হয় বিকল্পে।...এক্ষেত্রে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে বাংলায় লঘু-গুরুতে এযাবৎ যত কবিতা রচিত হয়েছে তাতে এ রকম বৈকল্পিকতার চল আছে।..আমি সংস্কৃত ছন্দের হুবহু প্রবর্তন বাংলায় চাইনা। এমন কি স্থান বিশেষে দীর্ঘস্বর প্রচলিত প্রথামত হ্রস্ব উচ্চারিত হলেও আমার খুব আপত্তি নেই যেমন বৈষ্ণবপদাবলীতে বহুস্থলে হয়।..আমি শুধু বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের গুরুস্বরের উদাত্ত

২৮। 'সাহিত্য চর্চা', 'ছন্দসঙ্গ', (ভূমিকা), 'দোলের পুষ্প', 'মেঘদূত' (ভূমিকা) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কল্লোলটুকু চাই মাত্র। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে করে বাংলা ছন্দে এক নতুন ধরণের গাম্ভীর্য ও ঔদার্য আনবে।

['অনামী' গ্রন্থের ভূমিকা দ্র]

সংস্কৃত গুরু স্বরবর্ণের সর্বক্ষেত্রে গুরু উচ্চারণ একান্তই কৃত্রিম। সর্বত্র এরূপ উচ্চারণ বাংলা ছন্দকে পঙ্গু করে দেয়। ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, হরগোবিন্দ প্রভৃতির প্রয়াস এই কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। দিলীপকুমার সে কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় 'লঘু-গুরু' কবিতা লিখতে গিয়ে সর্বত্র সংস্কৃত গুরুস্বরের বাংলায় গুরু উচ্চারণ আর চাননি। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে গুরু উচ্চারণ চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও সর্বত্র সফল হয়েছেন বলা চলে না। যেমন পঞ্চচামর ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন।—

⌣ – ⌣ – ⌣ – ⌣ –
সু দূ র দীপ্তি—বি হ্বল া

⌣ – ⌣ – ⌣ – ⌣ –
হি র ণ্য-গ র্ভ- ব ন্দিতা।

⌣ – ⌣ – ⌣ – ⌣ –
অ মা ত টে স মু চ্ছ লা।

⌣ – ⌣ – ⌣ – ⌣ –
অ দৃ শ্য র শ্মি-র ঞ্জি তা।

[রূপান্তর ঃ গৌরী]

এখানে 'সুদূর' ও 'অমাতটে' শব্দ দুটির উচ্চারণ ছন্দকে একান্তভাবে পঙ্গু করে তুলেছে। অনুরূপ তার 'রুচিরা', 'মদিরা' প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ রচনায়ও দুর্বলতা লক্ষিত হয়। বহু কবিতাতেই 'লঘু-গুরু' যে উচ্চারণ-নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন তেমনটি পাঠ করতে গেলে ছন্দ একান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের প্রথমে বা শেষে,—পর্বযতি বা পদযতির অবকাশে মুক্তদলের দীর্ঘ দ্বিকলা উচ্চারণ চলতে পারে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নজরুল ইসলাম তেমন কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। স্বয়ং দিলীপকুমারও যে তেমন ব্যবহার করেননি। তা নয়। যেমন—

⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ –
যশ) তৃপ্ত যেজন গেহে কৃ ষ্ণ চ র ণ ডা কে ॥ হয়নি ক ল ঙ্কি নী | স র্ব না শী I

⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ –
যেন) শেজ ফু লে নি তি ॥ স র্প স হে I

⏑⏑ –⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑ –⏑⏑⏑– ⏑⏑ –⏑⏑– ⏑⏑
মোর) পু ঞ-বে দ ন তা রে ॥ ব ল্‌তো কেমন ক'রে ॥ ব লি লো সই –যেনা ॥

–⏑⏑–
শুনল বাঁশি—I

–⏑⏑ –⏑⏑ –⏑⏑..
ই ঙ্গি ত আ য়তি ॥ ব্য র্থ ব হে ? I

এখানে (২) ৮৷৷৮৷৷৮৷৷৬I ৮৷৷৫I/৮৷৷৬I মাত্রাভাগে ছন্দোবদ্ধ রচনা করেছেন।

'সেজফুলে নিতি', 'ইঙ্গিত আয়তি' প্রভৃতি পদগুলির মুক্তদল-কলাপ্রসারণ অনেকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে। তবে তার ফলেই এ-ছন্দে আবৃত্তিধর্মী পঠনভঙ্গির তুলনায় গীতিসুরধর্ম বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

দিলীপকুমার রায় যে উক্তি করেছেন "যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ সংস্কৃতে সবত্রই গুরু দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে আর বাংলা (লঘু-গুরু) ছন্দে হয় বিকল্প" এটি সমর্থনীয় নহে। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের মাঝে বা প্রথমে একমাত্রারূপে উচ্চরিত হয়। কিন্তু 'লঘু-গুরু' ছন্দ মূলত প্রাচীন বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ-প্রভাবিত কলাবৃত্ত রীতিরই ছন্দ। সেখানে রুদ্ধদল (দিলীপবাবুর ভাষায় যুক্তবর্ণের আগের স্বরবর্ণ) সর্বত্রই দীর্ঘ দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চরিত হয়। তিনি নিজেও 'লঘু-গুরু' উচ্চারণরীতিতে লিখিত প্রত্যেকটি কবিতায় রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক রূপেই ব্যবহার করেছেন, কোথাও বিকল্প একমাত্রক উচ্চারণ রাখেননি। সংস্কৃত 'গুরুস্বরধ্বনি' বলে নয়, যে কোনও মুক্তদল কলাবৃত্ত রীতিতে পর্ব, পদ বা পংক্তির যতিপ্রান্তে বা পর্বের একেবারে প্রথমে দীর্ঘ দ্বিমাত্রকরূপে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। তবে সে রীতি গানেই অধিকতর সুপ্রযুক্ত হতে পারে। মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণে ধ্বনি সুরাশ্রয়ী হয়, বিশুদ্ধ কবিতায় এই সুরের প্রাধান্য কৃত্রিম বলেই গণ্য হবে।

দিলীপকুমারের মন্তব্য বিচার

রুদ্ধদল-স্পন্দন বৈচিত্র্যের দিক থেকে কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১) 'নূতন খাতা' (১৯২৩) কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। এখানে তার একটি ছন্দ-নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।—

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

বেলফুল চাইনা জুঁইফুল দাও!
ও গানটা গেয়োনা এই গান গাও!
কেন ভালবাসলে বল বল না;
হাসলে কেন তুমি? কথা কব না!

কালকের গল্প আজ কর শেষ ;
আজকের রাতটা লাগছে না বেশ ?
সারাটা বেলা ধরে বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা এমনিই ভুল।
... ...
জুই বেল চামেলি যা খুসী তা দাও,
ও গালেতে চুমা খেলে এ গালেতে খাও ॥

[নূতন খাতা : আব্দারের আধঘণ্টা]

কবিতাটিতে একদিকে যেমন রুদ্ধদল-বহুল চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ৪।৪॥৪।২। পর্ব-পদবিন্যাসে, প্রয়োজন মতো শব্দশেষে মুক্তদলের প্রসারণ ঘটেছে। কিন্তু কবির কৃতিত্ব এখানে যে, এই মাত্রাপ্রসারণ ভাবগত উচ্চারণের খাতিরেই তিনি এনেছেন। ছন্দকে নমনীয় করে ভাবের অনুগামী করেছেন।

কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) মৃদঙ্গ, কল্পলেখা, চিত্রপট এবং রূপছন্দা নামে চারিটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনায় তিনি বেশ মুন্সীআনার পরিচয় দিয়েছেন। রুদ্ধদলবহুল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সমিল মুক্তক বা বিচিত্র স্তবক-মিলের কলাবৃত্ত রচনায় তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে তাঁর চতুষ্কলপর্বিক কলাবৃত্তে রচিত দ্বিপদী-চৌপদী মিশ্রিত একটি স্তবকের দৃষ্টান্ত তুলছি।—

গম্ভীর গর্জনে গগনের অঙ্গনে
হুঙ্কারে মেঘদল, অন্ধ এ রাত্রি—
কে গো তুমি কোথা যাও কোন্ দূরযাত্রী !
বিদ্যুৎ মেঘ ছিঁড়ি অন্ধ তামস চিরি
উঁকি দেয় দুর্যোগ-বিবাহের পাত্রী।
কে গো তুমি কোথা যাও কোন দূর-যাত্রী।

[কল্পলেখা : অভিসার]

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) একজন ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন প্রচলিত কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনি আবার আরবী ও ফারসী ছন্দ বাংলায় রূপান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এখানে প্রথমে তাঁর

গোলাম মোস্তাফা

একটি কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত সনেট এবং তারপর কয়েকটি আরবী ছন্দের বাংলারূপ উদ্ধৃত করা গেল।

কলাবৃত্ত : ছয়কলা পর্বের সনেট

আকাশ ভুবনে বসেছে যাদুর মেলা,
নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর ;
রবি শশী তারা ঝঞ্ঝা অশনি-খেলা,
লুকোচুরি কত চলেছে নিরন্তর ;
আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারাবেলা,
কিছু বুঝিনাকো—বিস্মিত অন্তর !
হাসা-কাঁদা আর ভাঙা গড়া হেলা ফেলা
সকলেরি মাঝে ভরা যাদু-মন্তর !

কবি ! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
পিতার ঘরের অনেক খবর জানো ;
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে,
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো !

দর্শক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই,
যাহা বলো, শুনি অবাক হইয়া তাই !

[রক্তরাগ, রবীন্দ্রনাথ]

কবি সর্বপ্রথম মূল আরবী ছন্দ-নির্দেশ এবং তার নীচে বাংলা অনুবাদ কবিতা দিয়েছেন। চিহ্ন সংকেত ঃ বর্ণের মাথায় ' চিহ্ন দীর্ঘ-উচ্চারণ জ্ঞাপক ; পাশে | চিহ্ন পর্বযতিসূচক ; পাশে — চিহ্ন টানা উচ্চারণ বোধক। অনুবাদ কবিতাগুলি সর্বপ্রথম ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'আরবী ছন্দের বাংলা তর্জমা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি ১৯'টি মূল ছন্দ এবং তার ৯১টি বৈচিত্র্যের বাংলা দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন। এখানে সাতটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

আরবী ছন্দের বাংলা তর্জমা

তবীল

ফউলুন | মফাঈলুন | ফউলুন | মফাঈলুন
কানের দুল | চুড়ির শিঞ্জিন | কি সুন্দর | মনে রিন্‌ঝিন্
কি সুন্দর | তোমার কেশপাশ | হৃদয় মোর | অধীর দিন দিন।

মদাদ্

ফাএলাতুন | ফাএলুন | ফাএলাতুন | ফাএলুন
নাইক তুল মোর | প্রাণ-বঁধুর | চোখ জুড়ায় তার | অঙ্গ নূর ;
স্বর্গ কোন ঠাঁই | কোন সুদূর ? | এই ত মোর ভাই | স্বর্গপুর।

বসীত্   মস্‌তাফ্ আলুন | ফাএলুনং | মস্‌তাফ্ | ফাএলুন

মন্থর পবন | বয় ধীরে | সন্ধ্যার আঁধার | দুই তীরে,

তর্ তর্ তরীর | শির চলে | থম্‌থম্ নদীর | বুক চিরে।

ওয়াফের্   মফাআলাতুন | মফাআলাতুন | মফাআলাতুন | মফাআলাতুন

গভীর বেদনায় | হৃদয় ভেঙে যায় | পরাণ কাঁদে হায় | আকুল পিপাসায়

সফল আশা মোর | বিফল হল ভাই | জীবন রাখি আর | এখন কী আশায়।

মদীদ্-২   ফা'লাতুন | ফা'লাতুন | মফাআলুন

কোন্ বেদ্‌নায় | কাঁদ্‌ছিস বল | শয়ন লুটি--

উচ্ছল জল্— | ছল্-ছল্-ছল্ | নয়ন দুটি

মোতাদারেক্-২   ফা'লুন | ফা'লুন | ফা'লুন | ফা'লুন

জয় হোক | দেশবীর | নির্ভীক | গান্ধীর

জেল-ঘর | হোক তার | মুক্তির | মন্দির!

মোতাকারিব্-৪   ফ'লুন | ফউলুন | ফ'লুন | ফউলুন

মুখখান | গোলাপ ফুল | কেশ-পাশ | দোদুল-দুল,

টুক্ টুক্ | অধর কোণ | চুম্বন | দে বুল্‌বুল্!

'মোতাকারিব'-এর ছয় প্রকারভেদ আছে। ইতিপূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের (পৃ ৯৭) এবং নজরুলের (পৃ ১৫১-৫২) ছন্দ আলোচনা কালে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃত এবং বিদেশী একাধিক ছন্দের রূপাদর্শ সত্যেন্দ্রনাথ রুদ্ধ-মুক্ত দল-বিন্যাসের সাহায্যে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন সে বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। নজরুল এবং গোলাম মোস্তাফা এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

কবি জসিম উদ্‌দীন (১৯০২-১৯৭৭) স্বকীয় রীতির পল্লী কবিতায় লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। রুদ্ধদল-সমন্বিত নতুন গ্রাম্যশব্দ এবং পল্লীর কথ্যভাষা ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে দলবৃত্ত ও কলাবৃত্তের দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

জসীম উদ্‌দীন

দলবৃত্ত

কালো মেঘা নামো নামো ফুলতোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা ; তুলট মেঘা ; তোমরা সবে ঘামো !
কানা মেঘা টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই !

কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ্ আঁকিব মোদের হ'লে বিয়া !
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কোটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায় !
[নক্সী কঁথার মাঠ ঃ চার]

ষট্‌কল-পর্বিক কলাবৃত্ত

"কি কহিলা তুমি ? গোরাচাঁদ রায়, বংশী রামের নাতি
—কঠিন হাতের থাপড়ে যাহার ভূমিতে লোটাত হাতি ;
তার পোলা আমি কালাচাঁদ রায় বেঁচে আছি যতক্ষণ - -
আমার তিরিরে ছিনায়ে লইবে কোথা রয় হেন জন ?
কল্লাডা তার টান দিয়ে আমি ছিঁড়িতে পারিনে হাতে,—
হাড্ডি তাহার ভাঙিতে পারিনে আছড়াতে আছড়াতে ?"
[সোজনবাদিয়ার ঘাট ঃ ১ম সং ঃ পৃ ১৪১]

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২) ছন্দপ্রকৃতির কোনও নতুন পরীক্ষা না করলেও মিলবন্ধের দিক থেকে কিছু কিছু পাশ্চাত্য পদ্ধতির পরীক্ষা করেছেন। 'মনজুয়ান' কবিতাগুচ্ছে ('শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত) বায়রণের Don Juan এর স্তবক মিল (কখকখকখগগ) দিয়েছেন। স্পেনসেরীয় স্তবক-মিলেও কবিতা লিখেছেন। সনেট রচনায় সুনির্দিষ্ট পেত্রার্কীয় বা শেকস্পীরিয় রীতির অনুসরণ করে দূরান্বিত মিশ্র মিলবিন্যাসের পরীক্ষা করেছেন। এখানে তাঁর দূরান্বিত মিলের (প্রবহমান) একটি সনেট তুলছি।—

প্রমথনাথ বিশী

	মিল
পশ্চিম দিগন্ত আমি জ্বলন্ত রবির ...	ক
বাসনার চিতাশয্যা ; তুমি সখী দূর ...	খ
পর্ব বনান্তের রেখা — অতুল গভীর ...	ক

রহস্যের অধিনেত্রী। মোরে দগ্ধ করি ... গ
জ্বালাই বহ্নির শিখা—তারি দৃপ্ত রাগে ... ঘ
হেরিতেছি কান্তি তব মূর্ছায় বিধুর। ... খ
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবস শর্বরী; ... গ
দেখনা দেখার প্রান্তে তব স্মৃতি জাগে। ... ঘ
কোথা তুমি, কোথা আমি শূন্যতা অগাধ, ... ঙ
বুকে বুকে পরশন ঘটিলনা কভু! ... চ
কেবল চুলের গন্ধ, শয্যা ক্ষুধাতুর, ... খ
শুধু সৌন্দর্যের কণা—কষায় মধুর। ... খ
উঠিল গভীর রাত্রে দ্বাদশীর চাঁদ— ... ঙ
অখণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দোঁহে তবু। ... চ

[আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাচীন আসামী হইতে]

এযুগের কয়েকজন কবির মতো প্রমথনাথ কিছু সার্থক মুক্তক এবং গদ্য কবিতাও রচনা করেছেন। রবীন্দ্র-আদর্শে আবেগপ্রধান বাক্পর্বে তাঁর গদ্য কবিতা সফল হতে পেরেছে বলা চলে।

আবদুল কাদির

মোহিতলালের মতো আব্দুল কাদির ও (১৯০৬) একজন বিশিষ্ট কবি-ছান্দসিক। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল ; দিলরুবা এবং উত্তর বসন্ত। কবিতায় তিনি মুখ্যতঃ কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। সনেটের গঠনভঙ্গি ও মিলবিন্যাস নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা করেছেন। মোহিতলালের মতো আঠারো কলামাত্রক পংক্তির সনেট রচনায় তাঁর প্রবণতা লক্ষিত হয়। ইংরেজ সনেটকার রসেটির আদর্শে রচিত তাঁর একটি ষোল-পংক্তিক 'প্রলম্বিত সনেট' (?) এখানে উদ্ধৃত করছি।—

প্রলম্বিত সনেট (?)

আনন্দ কুহকে ভুলি' আজো পথে ফিরি উদাসীন,
তন্বীর তনুর গন্ধ আজো মোরে করিছে উন্মনা ;
তপ্ত জীবনের তীরে কাঁদে কত অতৃপ্ত কামনা—
বাসনা-বুদ্বুদ্ নিত্য হৃদয়ের সমুদ্রে নিলীন।
কমকান্তি কামিনীর কঙ্কণের ক্ষীণ রিনিঠিন
সহসা শোণিতে মোর সঞ্চারিয়া দেয় অগ্নিকণা,

প্রিয়ার ললিত হাস্যে বিগলিত বীণার মূর্চ্ছনা—
কোমল নয়নে তাঁর হেরি কভু ভ্রূকুটি কঠিন ॥

রমণী-রভস লাগি' জাগি দীর্ঘ বিরহ রজনী,
প্রথম চুম্বন-রাগ আঁকি তা'র স্ফুরিত অধরে,—
স্বর্গ করি' সৃজি আমি স্বপ্ন দিয়া আমার ভুবন।
রতি-আরাধনা করি' এ-জীবন ধন্য ব'লে গণি,
সুন্দরের শয্যা রচি প্রেয়সীর পীন পয়োধরে,
দেহের আধারে করি অমর্ত্যের সুধা আস্বাদন ॥

বাসনার বহ্নি-রসে ভরিয়াছি প্রাণের ভৃঙ্গার ;
দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়েছি সে সৌভাগ্য আমার ॥

[উত্তর বসন্ত ঃ রতি আরাধনা]

এই ষোল পংক্তির কবিতাকে সনেট বলতে হলে, প্রশ্ন উঠবে, বারো, আঠারো বা ত্রিশ পংক্তিক ভাব-সংহত কবিতাকেও এক এক ধরণের সনেট আখ্যা দিতে বাধা কোথায় ? সনেটকে চতুর্দশ পংক্তিমাপের বাইরে টেনে আনা বোধহয় সঙ্গত বা নিরাপদ নয়।

আবদুল কাদির সুদীর্ঘকাল ধরে ছন্দচর্চা করেছেন। বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকায় (ঢাকা, বাংলাদেশ) প্রকাশিত তার গবেষণাধর্মী দুটি রচনা 'ছন্দ বিবর্তনের ধারা' এবং 'বাংলা ছন্দের বিবর্তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

অজিত দত্ত

কবি অজিত দত্ত (১৯০৭) প্রধান তিনটি ছন্দ-প্রকৃতিতেই আকৃতিগত কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। লঘু যতি ও মিলের সাহায্যে কিছু কিছু ছড়াজাতীয় কবিতায় চমৎকার ধ্বনিস্পন্দ রচনা করেছেন। এখানে কলাবৃত্ত চতুর্মাত্রা পর্বিক একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি।—

কলাবৃত্তঃ চতুর্মাত্রা পর্ব

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

[আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ নইলে]

এখানে 'সব বেশ' এবং 'অভ্যেস্' শব্দমিলেও কবি নূতনত্ব দেখিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বহু কবির রচনায়ও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্র-আদর্শে মুক্তক এবং গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে এ-যুগে কবিদের পদ-রচনায় যেমন বিপুল বৈচিত্র্যধর্মী প্রয়াস দেখা দিয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শ গ্রহণে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু (এবং বিষ্ণু দে) প্রভৃতি কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণের দৃষ্টান্তও কম নয়। বাহুল্যবোধে আর উদাহরণ বাড়াবার লোভ সংবরণ করছি। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রভৃতি তরুণতর প্রতিভাবান কবিদের কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য অনেকাংশে এই যুগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে, 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ' পরিচয়ে তাঁদের আলোচনা করা হল। ভাবগত দিকে এবং ছন্দের আঙ্গিকের দিকে দুই যুগের মধ্যে স্পষ্টতর সীমারেখা টানা কষ্টকর—কিছুটা কৃত্রিমও বটে। এই যুগের অধিকাংশ কবিই পরবর্তী যুগে পৌঁছে আরও নতুন নতুন রীতিতে কবিতা রচনা করে চলেছেন। জীবিত, পূর্ণ সৃজনশীল কবিদের ক্ষেত্রে এমনতর সীমারেখা টানা সঙ্গত কিনা সে বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই যাঁরা তাঁদের প্রতিভার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, আলোচনার সুবিধার জন্যে তাঁদের এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

সাম্প্রতিক কবিদের ক্ষেত্রে যুগ-ভাগের যৌক্তিকতা

এবারে আলোচিত এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে।—

(১) অন্ত্যপর্বে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ মুক্তক রচনায় আরও পরিণত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লৌকিক দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পংক্তি-মিলহীন মুক্তক লিখেছেন। সর্বোপরি, এ-যুগেই গদ্যকবিতার ছন্দ প্রবর্তন করেছেন। 'অতিনিরূপিত' যতি ও মাত্রার বন্ধন-মোচনে গদ্যকবিতাকেই ছন্দোমুক্তির পরিণত পর্যায় বলা চলে।

এই যুগে কবি লঘু যতিস্পন্দে এবং মিল-অনুপ্রাসের ধ্বনি সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ রুদ্ধদল-বহুল কিছু শিশুপাঠ্য ছড়া রচনা করেছেন।

(২) প্রত্যেক যুগে কিছু সংখ্যক শক্তিমান কবির মধ্যেও রীতি ও ভাবগত পিছুটান লক্ষ করা যায়। এই যুগে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়ের কাব্যছন্দে সাম্প্রতিক যুগের তুলনায় পূর্বযুগের (রবীন্দ্র যুগ ঃ আদি ও মধ্য পর্ব) প্রভাব বেশী লক্ষিত হয়। করুণানিধান কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি বেশী আনুগত্য দেখিয়েছেন।-- এ ছন্দের বাক্‌ধর্মী প্রকাশে নূতনত্বও দেখিয়েছেন।

কুমুদরঞ্জন লৌকিক দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতি বেশী প্রয়োগ করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও তাঁর ছন্দে মৌলিকত্ব বিশেষ লক্ষিত হয় না।

করুণানিধান বা কুমুদরঞ্জনের তুলনায় কবি কালিদাস রায় আধুনিক ছন্দমুক্তি-ধারার সঙ্গে বেশী সংযোগ রেখেছেন। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহা-পয়ার এবং মুক্তক ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছন্দ-প্রভাব তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবপদের ছন্দও তিনি ধ্বনি-অনুপ্রাসের চমৎকারিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কালিদাস রায় প্রাচীন বাংলা ছন্দের আলোচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) মোহিতলাল মজুমদার ছন্দের ক্ষেত্রে ক্লাসিক রীতির দৃঢ়বদ্ধতাই পছন্দ করতেন। সনেটে এবং অন্যান্য স্তবকবন্ধে তিনি ইউরোপীয় রীতির মিলবিন্যাস বাংলায় আমদানী করেছেন। তের্জারিমা, স্পেনসেরীয় স্তবক, ব্যালাদে-এ ডাবল রিফ্রেন (Ballade a Dauble Refrain) প্রভৃতি স্তবক-মিলে নূতনত্ব দেখিয়েছেন। সনেটে তিনি পেত্রার্কীয় রীতির অনুরাগী ছিলেন। মোহিতলাল নিজে ছান্দসিক ছিলেন। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে ছন্দের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন।

(৪) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রধান তিনটি রীতির ছন্দ ব্যবহার করলেও ছয় ও চার মাত্রক পর্বের কলাবৃত্ত ছন্দের প্রতি প্রবণতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্র-আদর্শে মুক্তক এবং গদ্যকবিতার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্যকবিতায় মাঝে মাঝে সুপরিচিত রবীন্দ্র-পদ্যপংক্তি এনে নতুন পরীক্ষা করেছেন।

(৫) নজরুল ইসলাম মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের ধারা পুরোপুরি অনুসরণ না করলেও বাংলা ছন্দে ভাবমুক্তির প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায়তা করেছেন। কলাবৃত্ত ছন্দ তাঁর কাব্যে বাক্‌ধর্মী উচ্চারণের এক নতুন শক্তি লাভ করেছে (দ্র অগ্নিবীণা)। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং সুকুমার রায়ের অনুসরণে শিশুপাঠ্য কবিতায় নজরুল মিল, যতি ও রুদ্ধদলের লঘু-তরঙ্গিত স্পন্দন-মাধুর্য এনে দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করেছেন।

(৬) জীবনানন্দ দাশ প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য বিভিন্ন মিলের স্তবক রচনায় (ব্যালাড, স্পেনসেরীয় স্তবক, তের্জারিমা ইত্যাদি) এবং নতুন রীতির সনেট রচনায় বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। মুক্তক ও গদ্যকবিতা রচনায় রবীন্দ্র-আদর্শের অনুসরণ করেছেন।

(৭) সজনীকান্ত দাস ছন্দের মৌলিক পরীক্ষা না করলেও চর্যাপদ থেকে সমর সেনের গদ্য কবিতা পর্যন্ত ছন্দের সমগ্র বিবর্তন ধারাটি সযত্নে নিজস্ব ভঙ্গিতে উদাহরণ সাহায্যে ('ভাব ও ছন্দ' দ্র) দেখিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৮) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রুদ্ধদল-বহুল সুমিত শব্দ ব্যবহারে কাব্যে ভাব ও ছন্দের সামঞ্জস্য সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ছন্দোবন্ধে তিনি পূর্ব ঐতিহ্যের পূজারী ছিলেন। নিপুণ এবং মিত শব্দশিল্পী হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। শব্দচয়ন ও ভাবগাম্ভীর্যে তিনি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী বলা যেতে পারে। সচেতন রবীন্দ্র-অনুকৃতি তাঁর ছন্দে লক্ষণীয়।

(৯) কবি অমিয় চক্রবর্তী বাংলা পদ্যে ছন্দমুক্তির নানা পরীক্ষা করেছেন। ইংরেজ কবি জেরার্ড ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্সের 'স্প্রাং রিদ্‌ম্' (Sprung rhythm)-এর আদর্শ নিয়ে তিনি বাংলা ছন্দে নতুনতর পরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছেন।

(১০) প্রেমেন্দ্র মিত্র দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত ছন্দে স্বচ্ছন্দ চলতি ভাষা ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। মিলবিহীন দলবৃত্ত মুক্তক রচনায় তিনি বিশেষভাবে সফল হয়েছেন। কলাবৃত্তের যতিভাগ, মাত্রাপ্রসারণ এবং মিলবিন্যাসে তিনি নূতনত্ব দেখিয়েছেন। এ ছন্দে নজরুলের মত বলিষ্ঠ ও উদাত্ত প্রকাশভঙ্গি তিনিও আয়ত্ত করেছেন।

(১১) অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দোবন্ধে, বিশেষ ক'রে কয়েকটি বিদেশী ছন্দোবন্ধে (যেমন ক্লেরিহিউ, লিমেরিক) চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।

(১২) বুদ্ধদেব বসু ছন্দে বাক্‌রীতির প্রয়োগে সফল হয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত— তিন রীতির ছন্দেই প্রয়োজনমত শিথিল উচ্চারণ এনে স্বাভাবিক চলতি ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিদেশী ছন্দ-মিলের প্রয়োগ, ছড়াজাতীয় কবিতার লঘু যতিভাগ ও ধ্বনিস্পন্দে, গদ্য কবিতার ভাববাহী বাকপর্ব বিন্যাসে, প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস ব্যবহারে তিনি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

(১৩) দিলীপকুমার রায় বাংলা পদ্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের নতুন পরীক্ষা করেছেন। মুক্তদলের গুরু উচ্চারণে তিনি সংস্কৃত ছন্দের 'কল্লোল' বাংলা পদ্যে আনবার পরীক্ষা করেছেন। ছান্দসিক-সংগীতকার দিলীপকুমার বাংলা ছন্দ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও (ছান্দসিকী) রচনা করেছেন।

(১৪) কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ভাবগত প্রয়োজনে কলাবৃত্তে মাত্রাপ্রসারণ ঘটিয়ে ছন্দকে নমনীয়তা দিয়েছেন।

(১৫) শাহাদাৎ হোসেন কলাবৃত্তে যুগপৎ পর্ব- ও পদ-যতি রেখে যুক্তবর্ণবহুল রুদ্ধদলের সার্থক ব্যবহারে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।

(১৬) গোলাম মোস্তাফা ষট্‌কলপর্বিক কলাবৃত্তে সনেট এবং আরবী ছন্দের রূপাদর্শে রুদ্ধমুক্ত দলবিন্যাসের কলাবৃত্ত রচনায় ছন্দ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

(১৭) জসীমউদ্‌দীন পল্লী কবিতায় লৌকিক দলবৃত্ত ও ষট্‌কল পর্বিক কলাবৃত্তের ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।

(১৮) প্রমথনাথ বিশী স্তবক রচনায় মিলবন্ধে এবং সনেট রচনায় পাশ্চাত্য কবিদের কিছুটা অনুসরণ করেছেন।

(১৯) কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। রসেটির আদর্শে ষোল-পংক্তিক সনেট (?) লিখেছেন।

(২০) এযুগে কবিরা বৈদেশিক নানা ছন্দোবন্ধ ও মিলবিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।—এযুগের শেষ দিকে ছন্দে ভাবমুক্তির প্রয়াস, বিশেষ করে বাকধর্মী উচ্চারণের শৈথিল্য, বাংলা কাব্যে নব আঙ্গিকের সূচনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর যুগ : ১৯৪১-১৯৫৮

রবীন্দ্র-তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলেও বাংলা কাব্যে বিশেষত ছন্দে৹ ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও প্রতিভাবান কবির এখনো আবির্ভাব ঘটেনি। কাব্যের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে। সেখানে ভাব ও ছন্দের ক্ষেত্রে নবীন সম্ভাবনার সূচনা আজও নানাদিকেই লক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রোত্তর পূর্ণাঙ্গ কোনও নতুন রীতি গড়ে উঠতে পারেনি।

এ-যুগেও একদল কবি পূর্ববর্তী যুগের অনুসরণে গতানুগতিক ধারায় ছন্দ-আঙ্গিক মেনে চলেছেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ, নবীন এক কবিগোষ্ঠী ছন্দে ভাবমুক্তি। শতাব্দীকাল-ব্যাপী প্রয়াসকেই আরও নতুন পথে চালনার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রচনায় প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল : (১) সুনির্দিষ্ট পদবন্ধের আঙ্গিকে সুমিত ধ্বনি-সমৃদ্ধ শব্দ-গ্রন্থন, (২) চলিত ভাষার ব্যবহার এবং প্রয়োজনে বাকধর্মী স্বাভাবিক উচ্চারণের উদ্দেশ্যে ছন্দরীতির শিথিল প্রয়োগ, (৩) পংক্তিবিন্যাসে মিল ও অমিলের মিশ্রণ, এবং ধ্বনি-সমৃদ্ধির জন্য অন্তমিল ব্যবহার (৪) আকৃতিবন্ধে প্রয়োজনানুগ শৈথিল্য এনে চলতি বাক্‌রীতির পরিস্ফুটন, (৫) মিশ্রবৃত্ত রীতিতে (শব্দ-মধ্য অযুক্তবর্ণে লিখিত) রুদ্ধদলের একমাত্রক সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক উচ্চারণ, (৬) বিদেশী বিচিত্র মিলবিন্যাসে স্তবক গঠন, (৭) কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত রীতির (সমিল বা অমিল পংক্তিবন্ধ) ছন্দে প্রবহমানতা আনবার প্রচেষ্টা, (৮) গদ্য কবিতায় ছন্দের দিক থেকে বেশী গদ্যধর্ম প্রয়োগ, সুপরিচিত পদ্য-পংক্তি ব্যবহারের চমক সৃষ্টি। —এই সব রীতিগত নতুন পরীক্ষায় সম্মোহক রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের সচেতন প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু নতুন সুস্থ ও সুস্পষ্ট প্রত্যয়বোধের অভাবও সেখানে পরিস্ফুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হতে গিয়ে কবিরা বৈদেশিক প্রভাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ফলকথা, কাব্য-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, বিশেষত ছন্দের ক্ষেত্রে নতুনের আভাস সূচিত হলেও তার বলিষ্ঠ প্রত্যয়িত পদক্ষেপ এখনও ঘটেনি।

পূর্ববর্তী যুগের জীবিত অধিকাংশ কবিই আলোচ্য যুগেও তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাব্য চর্চা করে চলেছেন। নতুন কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে বিষ্ণু দে (১৯০৯),

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) এবং সমর সেনের (১৯১৬) নামোল্লেখ করতে হয়। নিশিকান্ত (১৯০৯), অশোক বিজয় রাহা (১৯১০), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭), সুনীল চট্টোপাধ্যায় (১৯১৯), নীরেন্দ্র চক্রবর্তী (১৯২৪), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) প্রভৃতি কবিদেরও ছন্দ সচেতনতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁরা প্রায় সকলেই পূর্ববর্তী যুগ থেকেই পদ্য রচনা সুরু করেছেন, তবে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্যধর্মী রচনা এযুগেই বেশী মেলে।—সেদিক থেকে বিচারে এঁদের আলোচ্য যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তেমনি সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি আলোচ্য যুগেও ছন্দের দিক থেকে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ পদ্য রচনা করে চলেছেন ; তবে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ পূর্ববর্তী যুগেই হয়েছে বলে তাঁদের আলোচনা পূর্ববর্তী যুগের (রবীন্দ্র যুগ ঃ অন্ত্যপর্ব) অন্তর্ভুক্ত করেছি। আসলে, আলোচ্য যুগকে অনেকাংশে পূর্ববর্তী যুগেরই পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে।

ছন্দের দিক থেকে বিচারে কবি বিষ্ণু দে এই যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারেন। তিনি প্রধানত কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত রীতিই ব্যবহার করেছেন। বিদেশী কবিদের বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ তিনি বাংলায় প্রয়োগ করেছেন। ছন্দে বাক্‌ধর্মী চলিত ভাষার আমেজ রক্ষায় সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন। সনেটে কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগে এবং মিলবিন্যাসে স্বকীয়তা এনেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে (শব্দ-মধ্য ও যুক্তবর্ণে লেখা) রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে দৃঢ়বদ্ধতা এনেছেন। গদ্য-কবিতার বাক্-পর্বিক বিন্যাসে মাঝে মাঝে পরিচিত পদ্যপংক্তি ব্যবহারে ভাব ও ছন্দের ক্ষেত্রে আকস্মিক চমক সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এবং বিদেশী কবিদের আদর্শে একই কবিতায় বিভিন্ন স্তবকে বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ, বিভিন্ন পর্বভাগ এমনকি ছন্দ-প্রকৃতিরও ব্যবহার করেছেন।

বিদেশী স্তবক-বন্ধের মধ্যে কবি ভিলানেল, ব্যালাদ (Ballade), সেস্টিনা (Sestina) এবং ট্রিয়োলেট (Triolet) রচনার পরীক্ষা করেছেন।

ভিলানেল রচনা প্রথম সুরু হয় ফ্রান্সে, ১৮৯০-তে। এ ছন্দের স্তবকবন্ধে পংক্তিমিল বিন্যাস হল। কখক, কখক, ..এই পর্যায়ে কেবল শেষ স্তবকে চারটি পংক্তি থাকে কখকক মিল-বিন্যাসে। কবি এখানে কখক মিলে পাঁচটি ত্রিপংক্তিক স্তবক শেষে কখকক মিলের একটি চতুষ্পংক্তিক স্তবক ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি কলাবৃত্ত রীতির সাতমাত্রার পর্বে (৩, ৪।৩, ৪।) রচিত। কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করছি ঃ

দিনের পাপ্‌ড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কূলে।

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপ্‌ড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে উষায় থামায় যাওয়া আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কূলে।
... ...
সে তরু এ হৃদয়, তুমি যে তরুমূলে
বসেছো ফুল সাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপ্‌ড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
জোগায় কথা তাই সোনালী নদী কূলে।

[বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা : ভিলানেল]

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব রয়েছে। এ ছন্দোবন্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম ও শেষ স্তবকে ব্যবহৃত দুটি পংক্তির একটি করে অন্যান্য প্রত্যেক স্তবকেই ফিরে ফিরে এসেছে। মিলের প্রসন্নতা এবং সেইসঙ্গে একটি বিশেষ ভাবের আবর্তন এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

ফরাসী ব্যালাদ (Ballade) কবিতার স্তবক-মিল আদর্শে বিষ্ণু দে 'বালাদা—লুই আরাগঁর জন্য' কবিতাটি (দ্র বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা) লিখেছেন। এর প্রথম আট পংক্তিক স্তবকগুলির মিল হল : কখকখখগখগ ; শেষ স্তবকে দশ পংক্তি বিন্যস্ত হয়, মিলঃ কখকখখগখগখগ ; ষট্‌পংক্তিক ছয়টি স্তবকে 'সেস্‌টিনা' (sestina) রচিত হয়। ছয়টি স্তবকের পংক্তি-মিলক্রম হল :

ক খ গ ঘ ঙ চ	...	১ম স্তবক
চ ক ঙ খ ঘ গ	...	২য় ,,
গ চ ঘ ক খ ঙ	...	৩য় ,,
ঙ গ খ চ ক ঘ	...	৪র্থ ,,
ঘ ঙ ক গ চ খ	...	৫ম ,,
খ ঘ চ ঙ গ ক	...	৬ষ্ঠ ,,

কবির 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বারোমাস্যার' দ্বাদশ সংখ্যক কবিতাটি এই ছন্দে লিখিত।

ট্রিয়োলেট (পংক্তিমিল ঃ কখককককখকখ) বাংলায় প্রমথ চৌধুরী প্রথম লিখেছিলেন। বিষ্ণু দে একাধিক কবিতায় এই ছন্দমিল প্রয়োগ করেছেন। যেমন, ফ্রান্চেস্কা (হে বিদেশী ফুল), ট্রিয়োলেট গুচ্ছ (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)।

বিষ্ণু দে অনেকগুলি অনুবাদ সনেট-সহ বেশ কিছু বাংলা সনেট লিখেছেন। পেত্রাকীয়, শেকস্পীরীয় এবং স্বাধীন মিলের সনেট রচনায় তার কিছু অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। কলাবৃত্ত রীতিতে সনেট লিখতে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ এমন কি মোহিতলালও প্রয়াসী হননি।—বিষ্ণু দে সে প্রচেষ্টা করেছেন। যেমন,—

প্রণয় পালালো প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতাল ফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড় ধামাচাপা গীতাভাষ্য।
খেপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি?
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচার আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু মিত্র।

[বি. শ্রে, ক. ঃ ১৯৬৭]

এখানে মিলবিন্যাসেও বিষ্ণু দে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন; অন্ত্য স্বরধ্বনির মিলের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিতে মাত্র মিল রেখেছেন। তাতেও ধ্বনিঅনুপ্রাস চমৎকার ফুটে উঠেছে। শেকস্পীরীয় রীতিতে ৪, ৪, ৪, ২—পংক্তিভাগে চারটি স্তবক রেখেছেন, তবে মিলবিন্যাসে আরও স্বাধীন রীতি গ্রহণ করেছেন।— সনেট হিসাবে কবিতাটির ভাবসৌন্দর্যও কম নয়।

মিল-বৈচিত্র্যে বিষ্ণু দে'র কবিতা ঐশ্বর্যময়। কলাবৃত্তে রচিত আটমাত্রা পংক্তিবন্ধের একটি কবিতা থেকে বিচিত্র মিলের দুটি স্তবক উদ্ধৃত করছি।—

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যত।
নেভানো তন্দ্রাহত
শহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশও মৃত্যুনীল,
ছিড়ে গেছে সব মিল,
তবুও খুঁজি তোমায়
যদিও আয়ু ঝিমায়
স্বপ্ন সত্য যদি
হয়ে ওঠে সাবলীল। [বি. শ্রে. ক. : সোনালী ঈগল]

এবারে কলাবৃত্তের ছয়মাত্রা পর্বে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করছি।—

১

কি করে ভাঙলে
সোনার কলসী খানি
বল তো কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন?

২

হিরণ পায়ে রূপালি চাকনা পাতা
এই আসা এই যাওয়া
তবুও তোমার যাওয়ার আসার পথেই
অন্ততঃ এক আধটা স্বপ্ন দিয়ো।

১৬

দারোগা সাহেব
একি সুখবর বদ্‌লি হলেন!

এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম,
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা
এক পয়সায় বাজারে কিনতো কাপড় ?

[বি. শ্রে. ক. ঃ ছত্রিশগড়ী গান]

রবীন্দ্রনাথ ছয়মাত্রা-পর্বে কলাবৃত্ত অমিল মুক্তকের পরীক্ষা করেছিলেন মাত্র।[১] এ-যুগে নবীন কবিরা সে রীতি আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। পূর্বেই বলেছি, দীর্ঘ পদ-বিন্যাসের মিশ্রবৃত্ত রীতিতে মুক্তকের ভাবমুক্তি-প্রয়াস যতটা স্বাভাবিক হয়, কলাবৃত্ত অথবা লৌকিক দলবৃত্তের লঘু সুনির্দিষ্ট পর্বভাগে ভাবের সেই প্রবহমানতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। নবীন কবিরাও সে বাধা অতিক্রম করতে পারেননি। কলাবৃত্ত মুক্তকাভাসিত ছন্দের দিক থেকে কবির 'ক্রেসিডা' (সমিল) এবং 'ঘোড়সওয়ার' (সমিল) কবিতা দুটি [দ্র বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা] উল্লেখযোগ্য।

অন্ত্যপর্বের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছন্দ-প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন।[২] বিষ্ণু দে অনুরূপ রীতির কবিতা লিখেছেন। যেমন, একটি কবিতার রচনা করেছেন মিশ্রবৃত্ত রীতিতে,—

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

আবার পরবর্তী অংশে কলাবৃত্ত রীতিতে লিখেছেন।

বলো ভাব্‌বেনা পাগল সং? আচ্ছা না হয় হেসো।
কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়।
অলকা, আমার দিন রজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন। [বি. শ্রে. ক. ঃ জন্মাষ্টমী]

মিশ্রবৃত্ত প্রকৃতিতে শব্দের মাঝে, অযুক্ত বর্ণে লেখা রুদ্ধদল রবীন্দ্রনাথ বহু সময়ে দ্বিমাত্রক গণ্য করলেও, সংশ্লিষ্ট একমাত্রক উচ্চারণ যে চলতে পারে শেষ জীবনের কিছু কবিতায় তার সার্থক পরীক্ষা করেছেন। আমাদের মতে, শব্দের মাঝে অযুক্ত

১। কলাবৃত্ত রীতিতে ছয়মাত্রা পর্বের অমিল মুক্তক রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ একটিই মাত্র লিখেছেন (দ্র বাশিতা : সানাই রচনার তারিখ . জানুয়ারী ১৯৪)। অবশ্য ইতিপূর্বে তিনি দুটি মিলে অনুরূপ কলাবৃত্ত রীতির ষটমাত্রক আর একটি কবিতা (দ্র উদ্বৃত্ত : সানাই, রচনার তারিখ : ৩০।৯।৩৯) লিখেছিলেন।

২। পূরবী কাব্যের অন্তর্গত আশা, ঝড়, আকন্দ, চিঠি প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

বর্ণে লেখা রুদ্ধদলের একমাত্রক প্রয়োগই অভিপ্রেত ;—তাতেই এ ছন্দের উচ্চারণ-দৃঢ়তা পরিস্ফুট হতে পারে। আলোচ্য যুগে বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা অনেকাংশে এই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের প্রয়োগ করেছেন। এখানে বিষ্ণু দে'র কবিতা থেকে দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি,—

(১) বয়স হয়েছে ঢের, 'পেন্সনই' তো পঁচিশ বছর।

(২) 'কর্ম সবই' পণ্ডশ্রম, 'চাকরী' সে তো পেটের চাহিদা,

(৩) করিনি 'তছনছ' কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর।

[সন্দীপের চর ঃ আইসারের খেদ

বিষ্ণু দে বেশ কিছু গদ্য কবিতা রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের '২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮' কবিতাটির মতো বিষ্ণু দে'র 'টপ্পা ঠুংরি' কবিতাটির ছন্দেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গদ্যকবিতার মাঝে মাঝে পদ্যের সুনির্দিষ্ট মাত্রাভাগের পংক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উদাত্ত
ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়।
ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়েব হাওড়া
তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর
ট্যাক্সির হৃদস্পন্দে, ট্রাফিকের এটাক্সিয়ায়।
এলো ট্রেন
মন্থিত করে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত ক'রে,
দেখলুম তোমার ক্লোস-অপ্ মুখ জানলায়,
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

[আ. বা. ক. ঃ টপ্পা-ঠুংরি

যতীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে'র গদ্য কবিতার বাকপর্ব-বিন্যাসে ভাবগত কিছু পার্থক্য আছে। তবে এক জায়গায় উভয়েরই মিল রয়েছে, সুপরিচিত রবীন্দ্র-কবিতা-পংক্তি উভয়েই এই নতুন গদ্য কবিতার মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। পাঠকেরা তাঁদে অতি পরিচিত রবীন্দ্র-কাব্য-পংক্তি অপরিচিত কবিতার মধ্যে আবিষ্কার করে তা

ছন্দস্পন্দ সহজেই ধরতে পারবেন—এই প্রত্যাশা বোধহয় উভয় কবিকে একই আঙ্গিকে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) এ-যুগে অন্যতম শক্তিমান ছন্দকুশলী কবিরূপে সমাদর লাভ করেছেন। প্রচলিত মুখ্য তিনটি ছন্দপ্রকৃতির ব্যবহারেই তাঁর কুশলতা লক্ষ করা যায়।

সর্বপ্রথম তাঁর একটি যতিপ্রান্তিক পংক্তি-মিলবিহীন কলাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ তুলছি।—

গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরোনো সুর ফেরিওয়ালার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের-আলো-জ্বালা এ-দিন শেষে।

[সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : বধ]

পাঁচমাত্রা পর্বভাগে কবি এখানে চমৎকার মিলহীন স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন।

'লাইন ডিঙানো' ভাবের প্রবহমানতা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে যত স্বাভাবিক হতে পারে, কলাবৃত্তে অথবা লৌকিক দলবৃত্তে তেমনটি হওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ পদভাগে বিন্যস্ত মিশ্রবৃত্ত ছন্দে ভাবযতি অনুসারে ছন্দযতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লঘুযতিভাগের কলাবৃত্ত বা লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দে এই ভাবমুক্তি-প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যাহত হয়। তবু আধুনিক কবিরা কলাবৃত্ত ছন্দে 'লাইন ডিঙানো' ভাবের প্রবহমানতা আনবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—

শ্রীমতী আমার অরণ্য স্বাদ
মেটে এখানেই। লোকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ, তাইতো
ওঁ তৎসৎ,—প্রলাপ মানেই।
ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিয়ার দিন। পেশোয়ারীদের
করকমলেই ভবলীলা শেষ। [সু. ক. : পদাতিক]

ছন্দ এখানে প্রবহমান রাখলেও ভাবের পূর্ণযতি কবিকে ছয়মাত্রার পূর্ণপর্বেই সর্বদা

দিতে হয়েছে। —তার ফলে মিশ্রবৃত্ত প্রবহমান ছন্দের তুলনায় এ ছন্দে প্রবহমানতা অনেক কমে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিপূর্বেই প্রমাণ দিয়েছেন কলাবৃত্ত রীতির ছন্দেও উদাত্ত ভাবস্পন্দ সার্থকভাবে পরিস্ফুট করা যায়। কলাবৃত্ত অমিল মুক্তক রচনায় উদাত্ত ভাবস্পন্দ কবি সুভাষও চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।—

অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কান্নাপাণি
খুন হয়ে যায় শাদা শাদা ফেনা
ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের
ক্ষুরধার তলোয়ার। [সু ক. ঃ অগ্নিকোণ]

বাক্‌ধর্মী চল্‌তি ভাষার পদগঠনে কলাবৃত্ত ছন্দকে কবি কত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তারও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,—

এক কবি।
তিনি পরতেন চুপি চুপি
লম্বা মেঘের পাজামা।
ঝড় ঝঞ্ঝার ফুঁ দিয়ে
যখন ইচ্ছে বাজে
বাজাতেন তিনি
প্রকাণ্ড এক দামামা—
পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই
মাটিতেই তাঁর
ছিল পা।
এক কবি।
ছিল আকাশটা তাঁর টুপি
সমুদ্রে তিনি শুতেন।
আলো রাখতেন লুকিয়ে
অন্ধকারের গর্তে।
ভবিষ্যৎকে
হাত বাড়িয়েই ছুঁতেন—
পৃথিবীও তাকে ভালোবেসেছিল খুবই—
মাটি দিল তাঁকে
শিরোপা। [সু. ক. ঃ ছিটমহল]

উদ্ধৃত দুটি স্তবকে একই পর্যায়ের মিল এবং যতি রেখেছেন। পড়তে পড়তে ছন্দ সচেতন পাঠককেও ভাবতে হয়, সত্যিই কবিতাটি ছয়মাত্রা পর্বের কলাবৃত্তে রচিত কি না।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, মিশ্রবৃত্তে শব্দের মাঝে অযুক্তবর্ণে লেখা রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট এককলা উচ্চারণ সাম্প্রতিক কালের কবিতায় কিছু কিছু দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ (অন্ত্যপর্ব), অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায় এই সংশ্লিষ্ট রীতির উচ্চারণ কিছু পরিমাণে লক্ষিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই রীতির দ্বিধাহীন দৃঢ় উচ্চারণ লক্ষণীয়। পয়ার পংক্তি রচনায় বেশ স্বচ্ছন্দেই তিনি লিখেছেন,

(ক) পদায় সর্দার 'হাওয়া' 'কসরৎ' দেখায়।

(খ) 'গোলদীঘির' গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।

(গ) বসন্ত সত্যিই 'আসবে'? কি 'দরকার' এসে?

(ঘ) 'অনেক দিন' 'খিদিরপুর' ডকের অঞ্চলে [সু ক ঃ আলাপ]

এই রীতি আরও বেশী পরিমাণে প্রচলিত হওয়াই অভিপ্রেত। নবীন কবিরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই রীতির প্রচলন করলে এ-ছন্দ উচ্চারণ-দৃঢ়তার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই নবীন সম্ভাবনার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করছেন বলা চলে।

ছোটদের জন্যে শুধু নয়, বড়োদের জন্যেও যে ছড়া রচিত হতে পারে অন্নদাশঙ্কর 'উড়কি ধানের মুড়কি' কাব্যগ্রন্থে তার নিদর্শন দিয়েছেন। লৌকিক দলবৃত্ত রীতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বড়োদের চমৎকার ছড়া লিখেছেন। ছড়ায় পর্বিক দলবিন্যাসে যেমন কিছুটা শৈথিল্য থাকে,- এখানেও কবি সেই রীতি গ্রহণ করেছেন। একটি উদাহরণ তোলা যাক,—

পুব দখিনে
আগুন বোনা
সাত সাগরের ঝি।
আকাশ কেন
নীলবরণ
সাপে কাটল কি?

সাপে কাটুক খোপে কাটুক
আছে আমার
মন্ত্র-পড়া ফুঁ,—

মারে—
সাপের বিষ
দিয়েন বিয়েন
ফুঃ ॥ [সু. ক. দিয়েন বিয়েন ফুঃ]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিছুটা তির্যক শ্লেষ মেশানো, একান্ত আটপৌরে কথ্য ভাষায় চমৎকার কিছু গদ্যকবিতা লিখেছেন। পাথরের ফুল, পায়ে পায়ে, ফুল ফুটুক না ফুটুক, কেন এল না প্রভৃতি কবিতার নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই যুগের পরিমিত আত্মবোধের একজন শক্তিমান কবি হলেন সমর সেন (১৯১৬)। রবীন্দ্র-গদ্যকবিতার তুলনায় তাঁর গদ্যকবিতা ভাব এবং ভাষা উভয় দিকেই বেশী গদ্যধর্মী হয়ে উঠেছে। বাক্‌পবগুলি এখানে প্রায় গদ্য বাক্যাংশেরই রূপ নিয়েছে। একটি উদাহরণ তুলছি,—

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হল ঃ
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের ভীরু দুর্বল অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

[স. সে. ক, ঃ একটি মেয়ে]

এত ঋজু, বলিষ্ঠ শব্দপ্রয়োগে, এমন স্পষ্ট অর্থবোধক বাকপর্বে আধুনিক গদ্য-কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল বলা যেতে পারে।

এ-যুগের অন্যান্য নবীন কবিদের ছন্দেও মাঝে মাঝে রচনাগত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১০-১৯৭৭) সংখ্যায় বেশী কবিতা না লিখলেও সচেতন-ভাবে ছন্দের কিছু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। একই কবিতার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের ব্যবহার তাঁর মধুবংশীর গলি, পিতৃলোক প্রভৃতি কবিতায় লক্ষিত হয়। তাছাড়া, একই কবিতাংশে মিশ্রবৃত্তের সঙ্গে কলাবৃত্তের শিথিল মিশ্রণ ঘটিয়ে ধ্বনি-বৈচিত্র্য এনেছেন। অনেক সময় মিল-অমিলেরও একটা শিথিল সীমা তৈরী করেছেন। যেমন,—

তোমারি প্রেরণা পেয়েছি
বারে বারে আনন্দে গেয়েছি
'নিরঙ্কুশ এ' জীবনের কলনাদে ভরেছে অম্বর।
'হে পঁচিশ নম্বর'
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি। [রাজধানী ও মধুবংশীর গলি: মধুবংশীর গলি]

সমিল মিশ্রবৃত্তে রচিত এ কবিতাংশে চিহ্নিত পদগুলিতে কলাবৃত্তের বিশিষ্ট উচ্চারণ এনেছেন কবি। এই কবিতার আর একটি অংশে লিখেছেন,—

ছারপোকার দৈনিক খাদ্য হিসাবে তাই
খাটিয়ার উপর বসি, বিড়ি ধরাই
আর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা রোজ করি—
দোহাই পতিতপাবন হরি,
এার নয়, আমার লম্পট প্রবৃত্তিগুলিকে
দস্যু লোভগুলিকে,
চালান করো আন্দামানে। [ঐ]

এখানে পংক্তিমিল থাকলেও, ছন্দে গদ্য কবিতার আমেজ ফুটে উঠেছে। একই কবিতায় অন্যত্র লিখেছেন,—

শোনো
তুমি কোনো,
বরযাত্রার মিছিলে কখনো
বাঁশী-পতাকায় আলোতে মাখানো
নব যাত্রার মিছিলে দেখেছ রূঢ় বিধাতার হাসি। [ঐ]

স্পষ্টতই কবি এখানে ছয়কলাপর্বিক কলাবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। এর পরই আবার দলবৃত্তে লিখেছেন,—

উড়িয়ে দেবে দিগ্বিদিকে
শুকনো ধুলো
শুকনো পাতা
ঝরিয়ে দেবে। [ঐ]

সনেট সাধারণত মিশ্রবৃত্তে, পয়ার বা মহাপয়ার বন্ধে রচিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র ষট্‌কলপবিক কলাবৃত্তে দ্বিপংক্তিক মিলে একটি সনেট লিখেছেন।—

স্বপ্ন-প্রলাপ মেদুর করেছে গতি।
স্বদেশ আমার বিদেশ আমার, নতি
জানাই তোমাকে। আরক্ত ঋতু-রঙে
হিংস্র-কোমল কঠোর করুণ ঢঙে
বিচিত্র দিন, তবু তোমাকেই নতি—
বিদেশী স্বদেশ, স্বদেশী বিদেশ প্রতি।
জীবনধারণে চক্রঘষার জ্বালা —
আশ্বিন দিনে তবু প্রেয়সীর মালা—।
তোমার আমার পয়ারে পয়ারে মিলে
জ্বলে ওঠে গান, ছন্দের এ নিখিলে।
কতনা দেশের প্রভাতে সন্ধ্যা এসে
আকাশে আকাশে নীল বাহু এসে মেশে।
ধ্বংসের পাশে তোমারই কোমল যতি।
সারা মানুষের স্বদেশ তোমায় নতি॥

[রাজধানী ও মধুবংশীর গলি, একটি সনেট]

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০) কলাবৃত্তের প্রতিই বেশী পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর সুবিখ্যাত 'এক ঝাঁক পায়রা' চতুষ্কল পবিক কলাবৃত্তে রচিত। এখানে পঞ্চকল-পবিক একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

অঙ্গে তার নেই চাঁপার স্বর্ণাভা,
উষ্ণসুখ রেশমী লাল ওষ্ঠেতে;
রুদ্ধমন কাব্যে আর ছন্দ নেই
শান্তি নেই ব্যর্থ এই জন্মেতে।

[একালের কবিতা, মেঘনগর, বিষ্ণু দে সম্পাদিত]

এখানে প্রতি পর্বসূচনায় রুদ্ধদলে তরঙ্গাঘাত পাঠক অনুভব করবেন।

অবিভক্ত বাংলার কবি সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮) বিভাগের পর 'বাংলা-দেশে'র কবিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর কাব্যেও মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্তের নিখুঁত প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এখানে একটি চতুষ্কলপবিক কলাবৃত্ত রীতির কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।—

মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা তো অহরহ শুনছি

আঁধার গোরের খেতে তবু তো ভোরের বীজ বুনছি।

আমাদের বিক্ষত চিত্তে

জীবনে জীবনে অস্তিত্বে

কালনাগ ফণা উৎক্ষিপ্ত

বার বার হলাহল মাখছি। [কবিতা, সংগ্রাম চলবেই]

হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭) মিলবিন্যাসে বৈচিত্র্য প্রয়াসী কবি। কলাবৃত্ত রীতির একটি কবিতায় সংলাপ-প্রশ্নোত্তর কিভাবে বিন্যাস করেছেন লক্ষণীয়।

'ভালো কি বাসতে ?'

— 'বাসতুম্'

'স্বপ্ন দেখেছো ?'

— 'দেখতুম্।'

'ঈশ্বর কোথা ?'

হিম ঋতু এলে জবাব মিলবে যদিচ,

এখন কিন্তু ওষুধ-পথ্য আসন্ন স্বর্ণঘটিত।'

[তিমিরাভিসার : নকল সূর্য]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০) প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন ১৯৪২-এ। তারপর থেকেই দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্তে কবিতা ও ছড়া রচনায় এখনো তাঁর ছেদ পড়েনি। কিছু ভালো গদ্য কবিতাও লিখেছেন। এখানে তাঁর একটি লোকনৃত্য-সংগীতের ছন্দের নিদর্শন তুলছি।

কোথা থেকে উঠছে এ কালো মেঘেরা ;

বৃষ্টির ঝরঝরানি......

টুপ্ টুপ্ চুপ চুপ কোনখানে পড়ছে এরা ?

পূবদিকে দেখ ভীড় করে মেয়েরা,

বৃষ্টির ঝরঝরানি......

টুপ্ টুপ্ চুপ চুপ পশ্চিমে পড়ছে এরা।

এ লাল পাগড়ি কার, দিলো ভিজিয়ে ?

বৃষ্টির ঝরঝরানি......

কার এ দীঘল চুল, বৃষ্টিতে উঠল নেয়ে ?

[তিন পাহাড়ের স্বপ্ন : ওঁরাও নৃত্যসংগীত অনুসরণে]

কবি এখানে চতুষ্কলপর্বিক কলাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। তবে লঘু পর্বযতি লোপ করে দীর্ঘ আটমাত্রার পদযতিকে প্রাধান্য দেবার কিছু নিদর্শন রয়েছে ; refrain বা 'ধুয়া' জাতীয় পুনরাবৃত্ত পংক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

নীরেন্দ্র চক্রবর্তী (১৯২৪) বিষ্ণু দে'র অনুসরণে কলাবৃত্ত পয়ার লিখেছেন।—তাতে পর্ববিভাগ থেকে পৃথক ভাবযতি দেবারও পরীক্ষা করেছেন। পংক্তিমিলেও বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন,— মিল

এখানে কেউ | আসেনা, ভালো | বাসেনা, কেউ, | প্রাণে ... ক
কী ব্যথা জ্বলে | রাত্রিদিন, | মরু-কঠিন | হাওয়া ... খ
কী ব্যথা হানে জানেনা কেউ, জানেনা, কাছে পাওয়া ... খ
ঘটেনা। এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো ... গ
পোষাক মুখ লুকিয়ে, দ্যাখো কত না সাবধানে ... ক
আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনেনা কেউ সোনা ; ... ঘ
এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো ... গ
ঝরেনা, ভেঙে পড়েনা ঢেউ—এখানে থাকবো না। ... ঘ

যে মাঠে সোনা ফলানো যায় আগাছা জমে উঠে ... ঙ
সেখানে, একা জানেনা কেউ কি রঙে ঝিলিমিল ... চ
জীবন,—তাই বা চেনা কেউ ; দুয়ারে এটে খিল ... চ
নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায়। সেই সোনা ... ঘ
ঝরেনা, ভেঙে পড়েনা ঢেউ—দুয়ারে মাথা কোটে, ... ঙ
এখানে মন বড়ো কৃপণ—এখানে থাকবোনা। ... ঘ

[নীলনির্জন : ঢেউ]

৫।৫।৫।২। কলাবৃত্তের পর্বভাগ, মিলে দূরান্বয়, ভাবযতি ও ছন্দযতিতে মাঝে মাঝে সুখকর অমসৃণতা। -সবদিক থেকে বিচারে কবি এখানে নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন। উভয় যতির স্পন্দন-বৈচিত্র্য, শব্দগত (ও ভাবগত) ধ্বনির অনুপ্রাস-মিলে কবিতাটিতে নতুনতর ছন্দ রচনা-প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নীরেন্দ্রের মিশ্রবৃত্তে শব্দমধ্য অযুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

নিতান্তই ক্লান্ত 'লোকটা'। শুধু
ছোট্ট 'একটা' ঘরের কাঙাল।
দক্ষিণের 'জানলা' দিয়ে ধূধূ

অফুরন্ত মাঠ 'দেখবে'। আর
পশ্চিমের 'জানলা' দিয়ে লাল
সূর্যডোবা সন্ধ্যার বাহার।
নিতাগুই ক্লান্ত 'লোকটা'। শুধু
ছোট্ট, 'একটা' ঘরের কাঙাল।

[নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা : নিতান্ত কাঙাল]

এখানে 'লোকটা', 'একটা', 'জানলা', 'দেখবে', --শব্দগুলি সবই সংশ্লিষ্ট দ্বিকল উচ্চারণে কবি ব্যবহার করেছেন। অমিয়, বিষ্ণু, বুদ্ধদেব, সুভাষের ধারাই অনুসরণ করেছেন।

নীরেন্দ্রও সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমারের মতো ছান্দসিক-কবি। তবে কবিতায় কোথাও ছন্দের অতি-সচেতনতার পরিচয় দেননি।

নবীনতর কবিদের আরও দু-একটি বিচিত্র ছন্দের নিদর্শন তোলা যাক। মরা গাছ 'টুপ্‌টাপ্' শব্দে পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। ঝরা পাতার সেই শব্দ কবিমনে অর্থ বহন করে আনে। লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের রুদ্ধদল-ধ্বনিস্পন্দে তারই চমৎকার প্রতিধ্বনি ফুটিয়েছেন প্রফুল্ল সরকার।—

মরা গাছের ঝরা পাতা
পায়ের তলায়—
পথে চলায়
কথা বলে--দাঁড়াও
সাড়া দাও।
চুপ্--চুপ —চুপ্-
টুপ—টাপ্— টুপ -
ফুল ঝরে কি পাতা ঝরে
পথের পরে ?
পাতা—পাতা
শুক্‌নো ঝরা পাতা।

[দেশ, শ্রাবণ ১৪৮৫ মরা গাছ]

সাতমাত্রার কলাবৃত্তে প্রবহমানতা এবং অমিল মুক্তকের আমেজ ফোটাতে চেয়েছেন শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়।—

ঝিমায় কলকাতা | ক্লান্ত কলকাতা | ধূসর উপকূলে
চিমনি, ছোট বড় কল ও কলকাতা।
সুদূরে বাঁশি বাজে......
বলয় রেখা ছিঁড়ে ভিড়বে জাহাজেরা 'হাওয়ার অনুকূলে'।
সকাল দুপুরের জেটিতে বন্দরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে
দেখবে চুপ্‌চাপ্‌ মাঝি ও মাল্লারা
উজানী জাহাজীরা
'নগরোপনিবেশে' ছড়াবে মুঠি মুঠি কথার কণিকাকে।

[দেশ ২৬ ভাদ্র, ১২৬০, দ্বীপ]

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের একটি বড়ো অংশ অধিকার করে আছে সনেট কবিতা। গদ্যকবিতায় সমিল পংক্তিবিন্যাসের উদাহরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি।—এই ছন্দে সনেট রচনার প্রচেষ্টা আরও অভিনব নয় কি? বিশ্বজিত গুপ্ত গদ্যকবিতার ছন্দে সনেট কবিতা লিখেছেন। যেমন,—

		মিল
আমাদের শহরতলীর ফ্ল্যাটে আসুন	...	ক
একবার। এই গলিতে আপনার গাড়ি	...	খ
(ছোট রাস্তা, পরিষ্কার দুদিকেই বাড়ি)	...	খ
ঢুকবে। সিড়ির মাথায় দরজা, কাগুন,	...	ক
না টোকা দিন। দরজা খুললে বসুন	...	গ
বসার ঘরে। দেয়ালে মণিকার আঁকা	...	ঘ
ছবি, কোণে বুদ্ধমূর্তি, কার্নিতে বাঁকা	...	ঘ
আখরে মেজেতে—সমীরণ ও প্রসূন।	...	গ
মণিকা, ছেলেরা, বুদ্ধমূর্তি, আমি	...	ঙ
এই ফ্ল্যাটে, এই গলি, ধীরে অগ্রগামী	...	ঙ
সাধারণ মানুষের সভ্যতাধারার	...	চ
এই শান্ত ছবি—একে বিনাশ করার	...	চ
কে আপনাকে ক্ষমতা দিল অকারণে—	...	ছ
অকস্মাৎ—গামা—রে ও বিবিধ মারণে।	...	ছ

[দেশ ১৩৮৫, শারদীয়া সংখ্যা : জনৈক বিশ্বনেতার প্রতি]

বাক্‌পর্বে স্বাভাবিক কথ্যভাষার আমেজ সুস্পষ্ট। কিন্তু এমন একান্ত কৃত্রিম চোখ-ভোলানো সনেট-আঙ্গিক রচনার প্রয়োজন ছিল কি? প্রকৃতিগুণে এটি যে সনেট আদৌ

হয়ে উঠতে পারেনি, পড়তে গেলেই তা ধরা পড়ে; পংক্তিমিলও নিতান্ত কৃত্রিম। অকারণে কবিকে সে সম্পর্কে সজাগ হতে হয়েছে,—অথচ পাঠকের কানে এই মিল ধরা পড়ে না।

তরুণতর কবিদের কাব্য থেকে মিল-বৈচিত্র্যের বহু উদাহরণ তোলা যেতে পারে। কিন্তু তার আর আবশ্যকতা নেই। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রভৃতি কবিরা কাব্যে যে নবীন ভাবগত ও আঙ্গিকগত পরীক্ষা বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে সুরু করেছেন, সাম্প্রতিক কালের অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরাও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেকাংশে সেই ধারাই অনুসরণ করে চলেছেন। ছন্দে ভাবমুক্তির যে সূচনা রঙ্গলাল-মধুসূদনের হাতে হয়েছিল, পর পর বহু স্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রোত্তর কালে তারই প্রবাহ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হয়, ছন্দের অলঙ্করণের দিকে এ-যুগে কবিরা অনেকটা মনোযোগী হলেও উচ্চারণ-রীতির দিক থেকে নবীন কোনও সম্ভাবনার বলিষ্ঠ সূচনা দেখা দেয়নি। রবীন্দ্র-ছন্দের সম্মোহক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গিয়ে কবিরা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে উদ্যোগী হয়েছেন। সুনির্দিষ্ট ছন্দরীতির শৈথিল্য এনে, যতিভাগে এবং মাত্রা-উচ্চারণে নানা রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা নতুন পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই কিছুটা দ্বিধার ভাব, অনিশ্চয়তার আভাস পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পর পর (আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্বে) ছন্দের নবীনতর পরীক্ষায় যে সুনিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছেন রবীন্দ্রযুগের অন্ত্যপর্বের বা পরবর্তী রবীন্দ্রোত্তর যুগের নবপথের সন্ধানীরা তেমন কোনও সাফল্যের দাবী করতে পারেন না। আলোচ্য যুগ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে এ-যুগের প্রকৃত ফসল এখনও অনারব্ধ রয়ে গেছে।

এই যুগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে আর একবার এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

(১) আলোচিত 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ' পূর্ববর্তী যুগেরই (রবীন্দ্র-যুগ ঃ অন্ত্যপর্ব) পরিশিষ্ট। কারণ পূর্ববর্তী যুগের জীবিত অধিকাংশ কবিই এ-যুগেও কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। একদল যেমন রবীন্দ্র আদি- ও মধ্য-পর্বের বা আরও পূর্ববর্তী যুগের আদর্শেই ছন্দরীতির প্রয়োগ করেছেন, তেমনি নবীন একদল কবি রবীন্দ্র-ছন্দ-রীতি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন।

(২) এই যুগের নবীন রীতির কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। তিনি কলাবৃত্ত ছন্দে প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিদেশী কবিদের

ছন্দোবন্ধ প্রবর্তনে, ছন্দে চলতি ভাষার বাক্‌ধর্মী প্রয়োগ-স্বাভাবিকতায়, কলাবৃত্ত রীতির সনেটবন্ধ রচনায়, মিশ্রবৃত্ত রীতির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে, গদ্য কবিতার মাঝে পদ্য-পংক্তি ব্যবহারে, ধ্বনিগত অনুপ্রাস-অলঙ্করণে তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায় শক্তিমান ছন্দকুশলী কবিরূপে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছেন। তিনিও কলাবৃত্ত রীতির বিচিত্র প্রয়োগে, বিশেষত বাক্‌ধর্মী ভাষার গদ্যোপম প্রয়োগ-নৈপুণ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে (শব্দমধ্য অযুক্তবর্ণে লেখা) রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট একমাত্রক উচ্চারণে এ-যুগে তিনিই সবচেয়ে বেশী সাহস দেখিয়েছেন। ছড়ার লঘু ও লঘুতর যতি-স্পন্দিত ছন্দ ব্যবহারেও তার প্রতিভার পরিচয় মেলে।

(৪) সমর সেন অনেকগুলি নতুন ভঙ্গির গদ্য কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর গদ্য কবিতা গদ্যের বেশী কাছে এসেছে,-- সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়।

(৫) সাম্প্রতিক তরুণতর কবিরা কম-বেশী পূর্বোক্ত কবিদেরই অনুসরণ করেছেন। যে সকল কবি বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই রবীন্দ্র-ধারা থেকে মুক্ত হবার জন্যে সচেতন প্রয়াস করেছেন, নবীন কবিরা অনেকাংশে তাঁদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ-যুগের ছন্দোবন্ধ রচনায় বিদেশী কবিদের প্রভাব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা অংশত রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হলেও, বলিষ্ঠ নতুন কোনও রীতি এখনও, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বলা চলে না।

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্প্রতিক যুগ : (১৯৫৮-১৯৭৮)

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ১৯৫৮ পর্যন্ত আলোচনার সীমারেখা টানা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাংলা কাব্যে আরও দুটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বভাবতই ছন্দজিজ্ঞাসুদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই দুই দশকে বাংলা কাব্যছন্দে আর কতটা অগ্রগতি ঘটেছে। সংযোজিত এই নতুন অধ্যায়ে সংক্ষেপে সেই পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেল। পূর্ব অধ্যায়ে যে কথা বলেছি আলোচ্য পর্ব সম্পর্কেও সেই কথাই বলতে হয়। তরুণতর শক্তিমান কবিরা ছন্দ-সচেতনতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেও, বাংলা কাব্যছন্দে মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এ-যুগের সম্ভাবনাময়, শক্তিমান কবিদের মধ্যে রয়েছেন, জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪), রাজলক্ষ্মী দেবী (১৯২৬), শামসুর রাহমান (১৯২৯), কবিতা সিংহ (১৯৩১), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২), অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪), বিজয়া মুখোপাধ্যায় (দাশগুপ্ত), স্বদেশরঞ্জন দত্ত (১৯৩৩), আনন্দ বাগচী (১৯৩৩), কবিরুল ইসলাম (১৯৩৪) নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন, মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫), তারাপদ রায় (১৯৩৬), রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬), সেবাব্রত চৌধুরী, আল মাহমুদ (১৯৩৬), মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত (১৯৩৭), আশিস সান্যাল (১৯৩৮), ওমর আলী (১৯৩৯) প্রমুখ কবিবৃন্দ। তাছাড়া পূর্ব যুগের অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, মনীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কবিরা এ-যুগেও নিয়মিত লেখক ছিলেন, বা রয়েছেন। ছন্দ-আঙ্গিকে অবশ্য তাঁরা বিশেষ পরিবর্তন আনেননি।—পুরোনো অভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

বাংলা দেশের শক্তিমান তরুণ কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯) মুখ্য তিন ছন্দরীতিতেই বেশ কিছু সার্থক কবিতা লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতির অমিল মুক্তক রচনায় তাঁর সহজাত আকর্ষণ লক্ষিত হয়। এখানে ষট্‌কলাপর্বিক কলাবৃত্তে রচিত তাঁর একটি কবিতাংশ থেকে শব্দের পুনরাবৃত্তির সার্থক দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। -

> স্বাধীনতা তুমি
> রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
> স্বাধীনতা তুমি

কাজী নজরুল, ঝাক্ড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহাপুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদমিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা।

[বন্দীশিবির থেকে, স্বাধীনতা তুমি]

কবিতাটিতে মোট ৪৪ টি পংক্তি, তার মধ্যে ১৯ বার 'স্বাধীনতা তুমি' শব্দগুচ্ছটি পুনরাবৃত্ত হ'য়ে বক্তব্যে একটি শ্লোগানের শক্তি যুগিয়েছে।

কবি-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২) মিশ্রবৃত্ত রীতির আখ্যানধর্মী দীর্ঘ মুক্তক রচনায় এবং লৌকিক দলবৃত্তের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের গঠনভঙ্গিতেও কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। এখানে মিশ্রবৃত্তে স্তবক-বৈচিত্র্যের নমুনাস্বরূপ তাঁর একটি ছোট কবিতা উদ্ধৃত করছি।—

আজ আর কেউ নেই, ঘুমন্ত ঘরের নীল জল,
ঠাণ্ডা বারান্দার গায়ে মধ্যরাতে দেবতার দীপে- -
হাতে খেলে যায় হাওয়া।

আজ চুপ করে ভাবো, এই রাত মৃদু জলঢেউ,
বড়ো একাকিনী গাছ, মাঝে মাঝে কার কাছে যাব,
ঘুমায় ঘরের গায়ে ছায়াময় বাহিত প্রপাত,
বুকে খেলে যায় হাওয়া।

দুইজনে পাশাপাশি, মাঝে কি পথিক নেই কোনো,
এখন বসন খোলো দেবতা দেখুক দু-নয়নে,
শিশিরে পায়ের ধ্বনি সুদূরতা অধীর জলধি
শুধু বহে যায় হাওয়া।

আজ আর কেউ নেই মাঝে মাঝে কার কাছে যাব।

[শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, মধ্যরাত্রে]

কবিতাটিতে চারটি স্তবক; ত্রিপংক্তিক প্রথমটি, চতুষ্পংক্তিক দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি, শেষ স্তবকটি মাত্র একটি পংক্তিতে গঠিত। প্রথম তিন স্তবকের শেষে একই ধরণের প্রায় একই শব্দগুচ্ছের পংক্তি-বিন্যাস। শেষ স্তবক-পংক্তিটি পূর্ববর্তী দুটি পংক্তির শব্দগুচ্ছ জুড়ে তৈরী হয়েছে। এই গঠন-পারিপাট্যে কবির মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) শব্দ প্রয়োগে এবং পংক্তিবিন্যাসে সচেতন ছন্দশিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে উচ্চারণ-সংশ্লিষ্টতার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শব্দমধ্য অযুক্তবর্ণ রুদ্ধদলের সংহত উচ্চারণে অলোকরঞ্জনও কতটা দক্ষ ছিলেন এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

'বাগ্‌নানে' যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেবো
সারা রাস্তা কথা 'বলবে'।
'বাগ্‌নানে' যাবার পথে কাঁদা 'ছুড়বে' যে কেউ আমাকে
তপ্পিতপ্পা থেকে 'অমনি' তিনটে বাচাল 'কলকলাবে',
কথার কথায় তারা লোফালুফি 'করবে' 'কলকাতাকে',
তাদের বাদিত্র জানি বড়োজোড় 'আম আটির ভেঁপু'।

[রক্তাক্ত ঝরোখা, তিনসঙ্গী]

বাগ্‌নানে, বলবে, ছুঁড়বে, অমনি, কলকলাবে, করবে, কলকাতাকে, আম আঁটির ভেঁপু—শব্দগুলির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের পাশাপাশি 'তিনটে' শব্দটির দুবার করে বিশ্লিষ্ট (তিনকলা) উচ্চারণ লক্ষণীয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩) যেমন ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখেছেন, তেমনি ভালো কিছু গদ্যকবিতাও লিখেছেন। তবু লৌকিক দলবৃত্তের প্রতি তাঁর কিছুটা আকর্ষণ লক্ষিত হয়। সংলাপী ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী এই কবির ছন্দ ও ছন্দহীনতার মাঝামাঝি পর্যায়ে রচিত একটি কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত তুলছি।—

সব শেখালে, তুমি আমার বললে, মিছে
অষ্টপ্রহর, এই যে পায়ের শব্দ পিছে
উঠে চলেছে, তারতো আছেই অর্থ নানা-
সমস্ত সম্মুখে যাবে, ফিরে তাকাতে করলে মানা
বালককালের ও দোলমঞ্চ, তুমি আমায় সব শেখালে

[সোনার মাছি খুন করেছি, বালককালের ও দোলমঞ্চ]

চতুর্দলপর্বিক দলবৃত্তে ছন্দযতি ও ভাবযতির কিছুটা বিরোধ ঘটিয়ে, কোথাও বা পঞ্চমুক্তদল পর্ব এনে কবি ইচ্ছে করেই ছন্দের নিয়মিত তরঙ্গ মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়েছেন ; পড়তে গেলেই পাঠক সেটা অনুভব করবেন।

আল মাহ্‌মুদ (১৯৩৬) বাংলা দেশের অন্যতম অরুণ প্রতিষ্ঠাবান কবি। ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রতিই তাঁর অনুরাগ। বাংলা তিন রীতির কবিতাতেই দক্ষতা দেখিয়েছেন।

এখানে পঞ্চকলপর্বিক কলাবৃত্তের একটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

ধৈর্য ধরে থেকেছি বহুকাল
খ্যাতির ধাপে উঠল বুঝি পা,
ভিতর থেকে বিমুখ মহাকাল
বললো নাবে, এখনো নয়, না

ধৈর্য ধরে থেকেছি বহু দিন
ভেবেছি এই বাজারে হাততালি ঃ
ধৈর্য শুধু বাজলো রিণরিণ
ভুরুর নীচে জমালো ঝুলকালি। [আল মাহমুদের কবিতা, ধৈর্য

চতুষ্পংক্তিক পাঁচটি স্তবকে কবিতাটি রচিত। প্রত্যেক স্তবকে একই ধরণের শব্দগুচ্ছ দিয়ে, আরম্ভ করেছেন। প্রথম স্তবকে পা, না—একদল শব্দের প্রত্যাশিত দ্বিকলা প্রসারণও লক্ষনীয়। আল মাহমুদের ছড়া লেখার হাতও ভালো, একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,—

চাক্‌মা মেয়ে রাকামা
ফুল গুঁজে না কেশে
কাপ্তাইয়ের ঝিলের জলে
জুম গিয়েছে ভেসে। [আল মাহ্‌মুদ কবিতা, ছড়া

৪।৪।।৪।২—দলমাত্রাভাগে ছড়াটি রচিত ; 'রাকমা' পর্বে দ্বিদলে ষটকল প্রসারণ ছড়ার আমেজ স্পষ্টতর করে তুলেছে।

জাপানী ক্ষুদ্রায়তন কবিতার প্রতি এক সময় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। একালে কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত কয়েকটি জাপানী 'হাইকু' রচনার পরীক্ষা করেছেন। দুটি উদাহরণ তুলছি, –

(i) অস্ত-গোধূলিতে ও কার চিতা জ্বলে!
গৌরী মেঘ এক চলেছে পশ্চিমে
সতীর মতো সহমরণে চিতানলে!

(ii) নম্র মায়াবিনী হাওয়ার কন্যারা
দীঘির কালোজলে শীতল পাটি বোনে,
দিও না জলে ঢেউ, জলের বুকে সাড়া।

[এ-কালের কবিতা, হাইকু, পৃ ২৭৬--বিষ্ণু দে সম্পাদিত

১। 'হাইকু' ১৭ দলে বিনাস্ত, বিসম মাত্রাপর্বিক, ক্ষুদ্রাকার (ত্রিপংক্তিক), ভাবদ্যোতক (epigramatic) কবিতা। বস্তুবোধ তীক্ষ্ণতা এ-কবিতার বৈশিষ্ট্য।

কবি এখানে বিষম সাতমাত্রার পর্ব (কলাবৃত্ত) এবং ক্ষুদ্রায়তন ত্রিপংক্তিক পরিসর রখেছেন। কিন্তু সপ্তদশ দল বা তির্যক, তীক্ষ্ণ ভাবদ্যোতনা রক্ষা করেননি।

এ যুগেও কয়েকজন মহিলা কবি পদ্য ও গদ্য কবিতা রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজলক্ষ্মী দেবী (১৯২৭), বিজয়া দাশগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন এবং কবিতা সিংহের (১৯৩৫) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বিজয়া এবং কবিতার এক একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

বরং প্রেমকে ছাড়া যায়
লোকমান্যি ছাড়া অসম্ভব
শিষ্য যারা আছে চারপাশে
'অত্যাজ্য' তাহাদের স্তব
...   .
অনুভবে কাজ নেই মোটে
'আড্ডাটা' রোজ যদি জোটে।

[আমার প্রভুর জন্য, পুরুষার্থ, বিজয়া দশগুপ্ত]

মিশ্রবৃত্তেও পংক্তি বা পদ-সূচনায় কলাবৃত্তের বিশ্লিষ্টতা কানে বেসুরো লাগেনা এটা মধ্যযুগের কবিরাও জানতেন। বিজয়া সেই ধ্বনিসঙ্গতি কাজে লাগিয়ে 'অত্যাজ্য' এবং 'আড্ডাটা' শব্দ দুটিকে চারকলা হিসেবে গণ্য করেছেন।

চোখে যদি মন ফোটালে
মনেতে চোখ দিলে না
    বদলে তার বদলে
    লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে।

লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে
তবু কেন ছেয়ে দিলেনা।
    বদলে তার বদলে
    দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

দুনিয়ার বেঁধে ঘোরালে
কালামুখ ঢেকে দিলে না
    বদলে তার বদলে
    রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে।

[স্বনির্বাচিত, সহজসুন্দরী-২, কবিতা সিংহ]

অতিপর্বিক দোলা এবং কলাপ্রসারণ-সহ কবি এখানে পূর্ণপর্বে ছয় কলার উচ্চারণ রেখেছেন। পংক্তি- বা পদ-শেষে এককলার প্রসারণ, কোথাও অতিপর্বেও এককলার প্রসারণ এ-কবিতায় নতুন ধ্বনিগুণ সৃষ্টি করেছে। গঠনে ও মিলবিন্যাসেও কবি কিছু স্বকীয়তা দেখিয়েছেন।

আঞ্চলিক লোকভাষার ব্যবহার লোকগীতে মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। রজনীকান্ত সেন আধুনিক কালেও তার ব্যবহার করছেনা। তবে দলবৃত্তে বা কলাবৃত্তেই এতদিন এসব লোকগীতি বা ছড়াগুলি রচিত হত। বাংলাদেশের তরুণ কবি ওমর আলি (১৯৩৯) এবারে মিশ্রবৃত্তেও আঞ্চলিক লোকভাষা ব্যবহারের পরীক্ষায় নেমেছেন দেখা গেল। যেমন,—

আমি কিন্তু যামুগা, আমারে যদি বেশী ঠাট্টা করো।
হুঁ, আমারে চেতাইলে তোমার লগে আমি থাক্‌মুনা।
আমারে যতই কও, তোতাপাখি, চান, মনি, সোনা।
আমারে খারাপ কথা কও ক্যান, চুল টেনে ধরো।

আমারে ভ্যাংচাও ক্যান, আমি বুঝি কথা জানি নেকো।
আমার একটি কথা নিয়ে তুমি অনেক বানাও।
তুমি বড়ো দুষ্টু, তুমি আমারে চেতায়ে সুখ পাও।
অভিমানে কাঁদি, তুমি তখন আনন্দে হাসতে থাকো।

[এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি, আমি কিন্তু যামুগা]

আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে কবি পুরোপুরি সফল না হলেও, ১৮ মাত্রা পংক্তির মিশ্রবৃত্তে এ-ভাষাকে বাঁধবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গদ্য কবিতা এ-যুগের প্রায় সমস্ত কবিই লিখেছেন। সমর সেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এখানে কবিরা রবীন্দ্র-ভাবাবেগ-প্রধান গদ্যকবিতার প্রভাব যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। এ-কাজে জগন্নাথ চক্রবর্তী, শামসুর রাহমান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সেবাব্রত চৌধুরী, কবিরুল ইসলাম, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ কবিদের কৃতিত্ব চোখে পড়ে। গ্রন্থ-পরিসরের প্রতি লক্ষ্য রেখে আর দৃষ্টান্ত বাড়াচ্ছিনা।

সব শেষে, এ-যুগের কবিদের একটি বিশেষ প্রবণতার উল্লেখ করে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় যতি টানা যেতে পারে। এ-যুগের বেশ কিছু সংখ্যক কবি লৌকিক দলবৃত্তে চতুর্দল (ষট্‌কল) পর্বের সঙ্গে পঞ্চকল (মুক্ত পঞ্চকল) পর্বিক

কলাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। শিথিলবন্ধ ছড়ার আদর্শে এ-কাজ অল্পস্বল্প রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন অন্যান্য কবিরা না করেছেন এমন নয়। যেমন,—

আদর করে মেয়ের নাম

'রেখেছে ক্যালি'ফর্ণিয়া।

গরম হল বিয়ের হাট

'ঐ মেয়েরই' দর নিয়া।

[খাপছাড়া ৪৩নং কবিতা, রবীন্দ্রনাথ]

ছড়াটি লৌকিক দলবৃত্তে লেখা ধরলে 'রেখেছে ক্যালি' পঞ্চ-মুক্তদল পর্বটি বেমানান, আবার পঞ্চকলপর্বিক কলাবৃত্ত ধরলে 'ঐ মেয়েরই' ওজনে ভারী হয়ে পড়ে। তবু ছড়ায় সেটা চলতে পারে।

এ-কাজ রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরাও কিছু করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত তুলি,—

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,

মেলায় বাজি'করের খেলায়' একটা মুখ মুখোশ পরে হাসায়।

খেয়ার নায়ে 'ওপারে যেতে' কবে যে কোন ভীড়ে

একটা মুখ এক নিমেষে আকুল স্রোতে ভাসায়।

কার সে মুখ কার ?

'জানে কি তারা'—'ছিঁটোন অন্ধ'কার।

[অথবা কিন্নর, মুখ, প্রেমেন্দ্র মিত্র]

পঞ্চকল পর্বিক কলাবৃত্তের উচ্চারণে পড়তে গেলে এখানে বাজি'করের খেলায়' বা 'ছিঁটোন অন্ধ'কার—অংশগুলিতে ছয়কলা-পর্বের আদল ফুটে ওঠে; আবার চতুর্দল-পর্বিক দলবৃত্তের গঠনভঙ্গি আনতে গেলে 'ওপারে যেতে' বা 'জানে কি তারা' পঞ্চদল পর্বগুলি বাধা সৃষ্টি করে।

ঠিক একই পদ্ধতি এ-যুগের কবিরাও অনুসরণ করে চলেছেন। সুনীল লিখেছেন,—

'ছিল নিঝ্‌ঝুম' পুষ্করিনী

জলে নামলো কে ?

এলো যে আজ 'অভিমানিনী'

ওলো জোকার দে ! [সু. গ. শ্রে কবিতা, অভিমানিনী]

শক্তি লিখেছেন,–

> 'ছেড়ে দিয়েছ' বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
> দীর্ঘতম 'জীবন এবার' 'তোমার সঙ্গে' ভোগ করেছি
> এই তো রোমা'ঞ্চকর যামিনী'—সোনায় কোন 'গ্লানি লাগে না'
> খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।
>
> [সোনার মাছি খুন করেছি, নীল ভালোবাসায়]

শঙ্খ লিখেছেন,—

> 'বুকের ভিতর' 'খরদীপালি' জ্বালিয়ে বলে, তালি, তালি
> 'দুহাতে তালি', 'দুহাতে তালি', শ-হাতে তালি বাজে :
> এখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে 'তাকাতে পারি' ?
> কিংবা ওরা 'আমার মুখে' 'গমক গমক' আঁচে ?
>
> [শ. ঘো. শ্রে. ক, প্রতিশ্রুতি]

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। ছন্দ-সচেতন পাঠক মাত্রেই প্রশ্ন করবেন, চতুর্দল (ষট্‌কল)-পর্বিক দলবৃত্তে পঞ্চ মুক্তদল (পঞ্চকল)-পর্বিক কলাবৃত্তের মিশ্রণ সম্ভবপর কি ? উভয় ছন্দরীতির উচ্চারণে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে কবিরা তার সামঞ্জস্য করেছেন কিভাবে ? আবৃত্তিকালে যদি কিছুটা কৃত্রিমভাবে পঞ্চকলপর্বকে ষট্‌কল হিসেবে 'তাঁরা উচ্চারণ করে থাকেন সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, দলবৃত্তের চতুর্দল পর্বে ছয়কলার যে 'মীড়' বা সুরের দোলা সৃষ্টি করে, পঞ্চকল কলাবৃত্তের পর্বে এককলার প্রসারণে সেই দোলা অনুভব করা যায় কি ?' এখানে প্রশ্নটি রাখা গেল, ছান্দসিকদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেবার বোধহয় এখনো সময় আসেনি।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে সূত্রাকারে দেওয়া যেতে পারে।—

(১) পূর্বযুগের মতো এ-যুগেও কবিদের রচনায় ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় মেলে।

(২) বাংলা দেশের তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি শামসুর রাহমান মুখ্য তিন রীতির ছন্দেই ভালো কবিতা লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত মুক্তক রচনায় তাঁর কিছুটা বেশী আকর্ষণ লক্ষিত হয়।

(৩) কবি-ছান্দসিক শঙ্খ ঘোষ গদ্য ও পদ্যকবিতা উভয় রাজ্যেই স্বচ্ছন্দে পদ্যচারণা করেছেন। মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘপংক্তিক মুক্তক তাঁর কাহিনী-কবিতার মুখ্য বাহন। কবিতার গঠনরীতি সম্পর্কেও তিনি বেশ সচেতন।

(৪) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শব্দ-সচেতন কবি। শব্দের সংহত উচ্চারণে তাঁর দক্ষতা পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

(৫) শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংলাপী বাক্‌রীতিকে চমৎকারভাবে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। পদ্য এবং গদ্যকবিতা উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সমদক্ষ।

(৬) বাংলা দেশের অন্যতম তরুণ কবি আল মাহমুদের ছন্দ-সচেতনতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিন রীতির ছন্দেই তিনি সার্থক কবিতা লিখেছেন।

(৭) কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত জাপানী 'হাইকু' এবং ওমর আলী (বাংলাদেশ) আঞ্চলিক বাক্‌রীতিতে মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার রচনায় নূতনত্ব দেখিয়েছেন।

(৮) সাম্প্রতিক কয়েকজন মহিলা কবি ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজলক্ষ্মী দেবী, বিজয়া দাশগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন এবং কবিতা সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৯) এ-যুগের প্রবীণ ও নবীন অধিকাংশ কবিই ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনার পাশাপাশি গদ্যকবিতা রচনাতেও সমদক্ষতা দেখিয়েছেন।

(১০) এ-যুগের কাব্যে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, চতুর্দলপর্বিক কলাবৃত্তের সঙ্গে পঞ্চকল-(মুক্তপঞ্চদল)-পর্বিক কলাবৃত্তের সংমিশ্রণ। সে বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনো আসেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবর্তন ও ভাবী-সম্ভাবনা

বর্তমান অধ্যায়ে সমগ্র বাংলা কাব্যছন্দের বিবর্তন ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত নয় দশকের, অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯৭৮ এর অগ্রগতিকে একনজরে আর একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

আদি ও মধ্য যুগের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

চর্যাগীতি (আনুমানিক দশম শতক) থেকে সুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনারম্ভ-কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যছন্দের প্রাচীন (আদি ও মধ্য) যুগ ধরা যেতে পারে। এই যুগে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের ধারাপথে ধীরে ধীরে বাংলা ছন্দের নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল। সেখানে মুক্তদলের সংস্কৃতানুগ হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ শিথিল হয়ে আসছিল। বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে সংস্কৃতের গুরু উচ্চারিত মুক্তদলের লঘু এককলা উচ্চারণ আংশিকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির মৈথীলি গীত প্রভাবে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব গীতে সংগীত সুরাশ্রয়ী, লঘু-গুরু উচ্চারণ সমন্বিত কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই রীতিকেই পরিবর্তিত করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক রীতির কলাবৃত্ত প্রবর্তন করলেন। লক্ষ করবার বিষয়, বৈষ্ণব গীতে ছাড়া, প্রাচীন ও আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো কবিই কলাবৃত্তে কবিতা রচনার কথা ঠিক মত ভাবেননি। মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগ (পঞ্চদশ শতক) থেকে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়েছে। সে যুগে প্রধানত কাহিনীধর্মী কাব্যগুলিতে এই ছন্দ ব্যবহৃত হত; গীতিসুর-প্রাধান্যের পরিবর্তে এই কাব্যগুলিতে কথকতার এক বিশেষ সুরাশ্রয়ী পঠনভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে। সেই পঠনরীতির আরও পরিবর্তন ঘটেছে ঊনবিংশ শতকে; প্রথম ঈশ্বর গুপ্ত, তারপর রঙ্গলাল বাক্ধর্মী, সুরনিরপেক্ষ নতুন উচ্চারণের মিশ্রবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তন করলেন। আর তারই ফলে মধুসূদন, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ

ঊনবিংশ শতকের ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

কবিদের পক্ষে এই ছন্দে 'অমিত্রাক্ষর', এবং মুক্তক রচনা সম্ভব হল; গদ্যকবিতার মাধ্যমে কাব্যের ছন্দবন্ধন থেকে ভাবমুক্তির পরীক্ষা সফল হল। বাংলা কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগেই, মিশ্রবৃত্ত রীতিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছন্দোরীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দলবৃত্ত ছন্দ গ্রাম-বাংলার অকৃত্রিম সম্পদ। প্রাচীন ছড়া এবং লৌকিক গানের মাধ্যমে এই লঘু চতুর্দল (ষট্কল) যতিস্পন্দিত ছন্দের ধারাটি

শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিরা, কবিয়াল ও বাউল সম্প্রদায়, পল্লী গীতিকার কবিগণ গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতকে ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিরা কিছুটা লঘু মেজাজের কবিতা গানে এ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে গভীর ভাবাত্মক কবিতায় ব্যবহার করলেন ; উচ্চারণের শৈথিল্য ঘুচিয়ে তিনি এ-ছন্দকে আধুনিক শিষ্ট কবিতায় কৌলীন্য দান করলেন। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত —প্রাচীন যুগে তিন ছন্দোরীতিতেই উচ্চারণ-শৈথিল্য ছিল। এই শৈথিল্যের ফলে একই কবিতায় একাধিক ছন্দোরীতির মিশ্রণও দেখা যেত। তবে তিন ছন্দোরীতিরই পৃথক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আধুনিক-পূর্ব যুগে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগের কবিরা এই তিন ছন্দ-প্রকৃতির উচ্চারণকে আরও সুনির্দিষ্ট ও মার্জিত করে তুললেন। আঙ্কিক মাত্রার হিসাবে এই ছন্দরীতিগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্য নিরূপণ এখন ছন্দজিজ্ঞাসুর পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, আধুনিক যুগে ছন্দ-প্রকৃতিগুলির উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট হবার ফলে, তাদের উপর ভিত্তি করে আরও নতুনতর আকৃতি-প্রকৃতিগত পরীক্ষা সম্ভবপর হয়েছে।

আদি ও মধ্য যুগের সুরাশ্রয়ী পঠনভঙ্গি

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, প্রাচীন যুগের কাব্যে ছন্দ-শৈথিল্যের জন্য সে যুগের কবিদের দোষারোপ করা ঠিক হবে না। তাঁদের ছন্দের শ্রুতিবোধ অনেকাংশে সঙ্গীতের তাল-মাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। গায়কের গানে বা কথকের সুরাশ্রয়ী পঠনে কাব্যের মাত্রাশৈথিল্য ঢাকা পড়ে যেত। আবার, সুরাশ্রয়ী কাব্য আধুনিক যুগে, যখন বহুলাংশে সুর নিরপেক্ষ পাঠ্য কবিতায় রূপান্তরিত হল, তখন কবিকে ছন্দ-শৈথিল্য সম্পর্কে আরও সতর্ক হতে হল। দুই যুগের কাব্যাস্বাদনের এই রীতিগত পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে প্রাচীন যুগের কবিদের প্রতি আর অবিচারের শঙ্কা থাকে না।

ঈশ্বর গুপ্ত

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলার ব্যবহারিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল, কাব্যের ক্ষেত্রে তার প্রভাব যেমন দূরপ্রসারী তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। এই বিস্ময়কর প্রভাবের ফলেই আধুনিক বাংলা ছন্দ প্রায় নব কলেবর লাভ করেছে বলা যেতে পারে। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এই আধুনিকতার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। সঙ্গীত-সুরাশ্রয়ী প্রাচীন কাব্যধারা থেকে সুর-নিরপেক্ষ পঠনোপযোগী আবৃত্তিধর্মী আধুনিক ছন্দের রূপান্তর ছাপাখানার যুগে প্রথম তাঁর দ্বারাই ঘটেছিল।

এরপর ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান কাব্য লিখতে গিয়ে রঙ্গলাল মিশ্রবৃত্ত রীতির 'মিত্রাক্ষর' ছন্দেই যথাসম্ভব ভাবমুক্তির কথা ভেবেছিলেন। আঠারো মাত্রার (আট+দশ) মহাপয়ার সম্ভবত ভাবস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই তিনি রচনা করেছিলেন এবং একই প্রয়োজনে চৌদ্দমাত্রার পয়ারে সুনির্দিষ্ট আট-ছয় মাত্রার পদযতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। তবে লাইন ডিঙিয়ে ভাবপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ গতি সৃষ্টির কথা তাঁর মনে আসেনি। মধুসূদন এসে প্রবহমান পয়ার রচনার মাধ্যমে এক মুহূর্তে এই বাধার আবরণ ছিন্ন করলেন। শেক্স্‌পীয়র—মিলটনের নাটক-কাব্য পাঠ করে তিনি Blank-verse-এর যে শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা মিশ্রবৃত্ত পয়ারে সেই শক্তি সঞ্চারিত করার দুঃসাহসিক পরীক্ষায় তিনি সফল হলেন। সংস্কৃত ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনাকে তিনি বাংলা ভাষায় আরোপ করলেন। মধ্যযুগের কাব্যে যে ধর্মীয় রোমাণ্টিকতা এবং ভাষা-ছন্দের আত্যন্তিক কোমলতা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে সুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল মধুসূদন তারই বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে নব-ক্ল্যাসিক কাব্যের উপযোগী ভাষা-ছন্দের সন্ধান করেছিলেন। স্বল্পায়ু সাহিত্য-জীবনে সেই নব কবিভাষার কাঠামো তিনি গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে এই নব প্রবর্তিত কাব্যধারাকে, তাঁর ভাষাছন্দকে যথার্থভাবে পরবর্তী কোন কবিই অনুসরণ করতে পারেননি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ব্যর্থ অনুকারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন মাত্র।

রঙ্গলাল ও মধুসূদন

রবীন্দ্রনাথ এসে আপন রুচি ও প্রতিভা অনুসারে মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ ও নব ক্লাসিক রীতির কবিভাষাকে অনেকাংশে বদলে দিলেন। মধুসূদন-প্রবর্তিত ভাবযতি ও ছন্দযতির অতটা স্বাতন্ত্র্য তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা। তাছাড়া কবিতায় প্রান্তিক মিলের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। ফলে, মধুসূদন বাংলা কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দমিল এবং অলঙ্করণে যতটা বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে আমাদের আবার পরিচিত এবং অভ্যস্ত 'মিত্রাক্ষর' ছন্দ-প্রভাবিত ললিত কবিতার জগতে বহুলাংশে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু যেখানে ভারতচন্দ্র এসে থেমেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেখান থেকে আর সুরু করার উপায় ছিল না। মধুসূদনের ভাষাছন্দের দুর্বার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয় নি। বস্তুত, বাংলা কাব্যে ভাবের ছন্দমুক্তির যে সচেতন প্রয়াস মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষরে' সূচিত হয়েছিল মুক্তক এবং গদ্যকবিতায় তাঁরই পরবর্তী সোপান যাঁরা গড়ে তুলেছেন

রবীন্দ্রনাথ

তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে তিনি মধুসূদনের যোগ্য উত্তরসূরী। অন্যদিকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার যুগ থেকে বাংলা কাব্যে যে ললিত ছন্দমিলের অলঙ্কৃত ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল সেখানেও ইউরোপীয় নব-রোমান্টিক কাব্যাদর্শের সংযোগে যে ঐশ্বর্য উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে দেখা দিয়েছিল তারও সবাপেক্ষা সার্থক রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ। নব কলারূপের তিনি হলেন এ-যুগের সবাপেক্ষা সার্থক শিল্পী। ধ্বনি-ঐশ্বর্যে, মিলবিন্যাসে, গঠনগত রূপাদর্শে বাংলা কাব্যকে তিনি নব যৌবন-সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিয়েছেন। মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষরের যুগ্ম রশ্মি হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের যুগল অশ্বচালিত রথখানি স্বয়ং বাসুদেবের মতোই নিপুণ হাতে চালিত করেছেন। তাঁর হাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধানতম তিন ছন্দপ্রকৃতি যেমন পূর্ণতা পেয়েছে তেমনি নব নব সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সমকালীন ও পরবর্তী প্রায় সমস্ত কবিই তাঁর প্রবর্তিত বা পরিমার্জিত ছন্দরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কলাবৃত্তে মধ্যযুগীয় লঘুগুরু উচ্চারণ পরিহার করে সব মুক্তদলেই এককলা এবং রুদ্ধদলে দ্বিকলা উচ্চারণের নবরীতি তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। মিশ্রবৃত্তের মাত্রানির্দেশ এবং পর্ব-বিভাগ পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বেই, সম্ভবত ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই অনেকাংশে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন এই ছন্দেই ভাবমুক্তির পথ উন্মোচন করেছিলেন; স্তবক বিন্যাস ও মিলে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। উভয় দিকেই রবীন্দ্রনাথ যোগ্য উত্তরসূরীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। লৌকিক দলবৃত্ত যে কাব্যে স্বাভাবিক বাকভঙ্গি পরিস্ফুটনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বাহন এবং শিষ্ট কাব্যেও যে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেকথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন; সার্থক কবিতা ও গান রচনা করে তার স্বাক্ষর রাখলেন। দলবৃত্ত মুক্তক বস্তুত রবীন্দ্রনাথেরই দান। গদ্য কবিতায় এসে কবিতার ছন্দবন্ধন থেকে ভাবমুক্তির রূপটি সম্পূর্ণতা লাভ করল। বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণের 'গদ্যপদ্য' বা 'পদ্যপৌংক্তিক গদ্যে' যার সূচনা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় তার সচেতন পরিপূর্ণতা লক্ষ করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট, দীর্ঘ পদপ্রধান উচ্চারণ এনে এবং লঘু পর্বগতি বিলুপ্ত করে দলবৃত্তে স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গির সংহতি কতটা ফোটানো যেতে পারে রবীন্দ্র সমকালীন কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার পরীক্ষা করেছেন, অনেকাংশে সফলও হতে পেরেছেন। সম্ভবত ইংরেজি সংহত উচ্চারণের 'সিলেবিক' ছন্দ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলায় এই নবরীতির উদ্ভাবন করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দলবৃত্ত

ঠিক মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও একই অনভ্যস্ততার জন্য সঠিক ভাবে এই ছন্দ ব্যবহারে কোন কবিই আর অগ্রসর হননি।

বাংলা কাব্যের ছন্দ-বিবর্তনে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষিত হয়। প্রথমটি হল, কৃত্রিম ছন্দবন্ধন থেকে ভাবমুক্তির ক্রম প্রচেষ্টা। মিশ্রবৃত্ত রীতি এই বিবর্তন-ধারার মুখ্য বাহন। রঙ্গলাল পয়ার-মহাপয়ারে গতানুগতিক ছন্দযতির পরিবর্তন এনে এই ভাবমুক্তির ক্ষীণ সূচনা করলেন; মধুসূদন প্রবহমান পয়ারের মাধ্যমে তাতে নব শক্তি সঞ্চার করলেন; রাজকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র মুখ্যতঃ নাট্য সংলাপে মুক্তক প্রবর্তন করে স্বাধীন পদক্ষেপের পরবর্তী সোপান তৈরী করলেন; রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সেই সোপানকে আরও দৃঢ়তা দিলেন এবং তারই উপর ভাবমুক্তির সর্বোচ্চ কাঠামো তৈরী করে গদ্য-কবিতা রচনা করলেন। সেখানে ছন্দের স্পন্দন থাকল কিন্তু সুনিরূপিত মাত্রার হিসাব রইল না। গদ্য কবিতার সেই ধারা আজও পর্যন্ত রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের হাতে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দলবৃত্তে এই ভাবমুক্তি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুটি পৃথক পথে এনে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত লৌকিক দলবৃত্তেই যথাসম্ভব চলিত বাক্‌ভঙ্গি এনে অপেক্ষাকৃত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের মুক্তক (সমিল ও মিলহীন) রচনা করে এই ছন্দোরীতির শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য 'সিলেবিক' ছন্দের দীর্ঘযতিপ্রধান সংহত উচ্চারণ মনে রেখে, আট-দশ-ছয় দলমাত্রার পদভাগে নতুন সংশ্লিষ্ট রীতির দলবৃত্ত রচনা করে প্রমাণ করলেন, এই ছন্দই কথা বাকভঙ্গির সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানোর শক্তি রাখে। মিশ্রবৃত্ত বা দলবৃত্তের তুলনায় কলাবৃত্তে ভাবমুক্তির প্রয়াস, সম্ভবত উচ্চারণ-কৃত্রিমতার জন্যই, কিছুটা কম হয়েছে। অবশ্য সেখানেও রবীন্দ্রনাথ মুক্তক রচনার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবহমান রীতির প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছেন। প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অমিয়, বিষ্ণু, সুভাষ প্রমুখ কবিরা এই ক্ষীণধারায় কিছু শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন।

ছন্দ বিবর্তনের ত্রিধারা

(১) ভাবমুক্তি

দ্বিতীয়টি হল, সুনির্দিষ্ট পংক্তি ও স্তবক-বিন্যস্ত 'মিত্রাক্ষর' কবিতার ধারা। আদি ও মধ্য যুগে মুখ্যতঃ সমিল-পংক্তিক শ্লোক রচনা করে কবিরা এ ধারাটি রক্ষা করেছেন। তার মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীগীতে সামান্য কিছুটা স্তবক-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তখন পয়ার, ত্রিপদীই ছিল মুখ্য পংক্তিবন্ধ। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে বৈচিত্র্যময় স্তবক রচনার প্রয়াস দেখা দিল। মধুসূদন সনেট (চতুর্দশপদী

(২) মিত্রাক্ষর ধারার অলঙ্করণ

কবিতাবলী) এবং সমিল নানা রূপাদর্শের স্তবকবন্ধ (ব্রজাঙ্গনা কাব্য) রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এবং সম্ভবত জয়দেব-সহ মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ গ্রহণ করে স্তবক রচনায় ও মিলবিন্যাসে নতুন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের রোমাণ্টিক ও ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিবৃন্দ সম্ভবত কবিতার গঠনগত শিল্পকলায় তাঁকে কিছুটা প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। মধুসূদন মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ কবিতাতেই মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছাড়াও কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত,—অর্থাৎ মুখ্য তিনরীতিতেই তাঁর মণ্ডণ শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীদের মধ্যে যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন এবং বিহারীলাল চক্রবর্তী মিত্রাক্ষর কাব্যধারায় কিছুটা শক্তি যুগিয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্র-সমকালীন ও পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবিবৃন্দও এই ধারাকে ক্রমানুয়ে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন।

তৃতীয় ধারাটি অনেকাংশে কৃত্রিম। এখানে মুখ্যত সংস্কৃত এবং গৌণত অন্যান্য বহিরাগত ছন্দের উচ্চারণ-প্রকৃতি বাংলায় রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। বহিরাগত ছন্দের রূপাদর্শে বা মিল-বিন্যাসের সাহায্যে বাংলা কাব্যের গঠনগত সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণ যেখানে বাংলা কবিতার বিবর্তন ধারায় ধীরে ধীরে বর্জিত হয়েছে, সেখানে কৃত্রিম উচ্চারণে তাকে ফিরিয়ে

(৩) সংস্কৃত ও বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপান্তর প্রয়াস

আনার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। চর্যাগীতি বা বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তৎকালীন সুরাশ্রয়ী পঠনরীতিতে আংশিক লঘু-গুরু উচ্চারণ যতটা স্বাভাবিক ছিল, অষ্টাদশ শতকে এসে ভারতচন্দ্রের রচনায় তার কৃত্রিমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে, বিশেষ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, দু-একটি সংস্কৃত ছন্দোবন্ধের কৃত্রিম উচ্চারণে বাংলা রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এরপর হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ (ঠাকুর), বলদেব (পালিত), হরগোবিন্দ (লস্কর চৌধুরী), সত্যেন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, নজরুল, দিলীপকুমার, নিশিকান্ত, প্যারীমোহন (সেনগুপ্ত), বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবৃন্দ এই কৃত্রিম উচ্চারণকে বাংলায় কিভাবে কতটা স্থান দেওয়া যেতে পারে তার নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল লঘু কবিতা ও গানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে লঘু-গুরু ছন্দের উপযোগিতা স্বীকার

করেছেন। তবে এই প্রচেষ্টার ক্রমধারাটি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে রক্ষা না করলে, মুখ্য তিনছন্দ-প্রকৃতির কোনও একটিকে অবলম্বন না করলে, বহিরাগত কোন ছন্দের ব্যবহারেই কবিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। গানের ক্ষেত্রে অবশ্য সুরারোপের অবকাশ রয়েছে বলেই লঘু-গুরু উচ্চারণ কিছুটা খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বহিরাগত শব্দ-সম্পদকে যারা বাংলা কাব্য রচনায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাদের মধ্যে ব্রজবুলি গীতের কবিবৃন্দ, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ছিলেন মধ্যযুগের শিল্পী। ছড়াগান, কবিগান, এবং পল্লী-গীতিকার জ্ঞাত-অজ্ঞাত কবিবৃন্দও সম্ভবত মধ্যযুগের কালসীমার মধ্যেই ছিলেন। আধুনিক যুগে যাদের নাম বিশেষভাবে মনে পড়বে তাঁরা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত), মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, অমিয় (চক্রবর্তী), সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু, জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ কবিবৃন্দ। পল্লী অঞ্চলের লোকভাষাকে, বিভিন্ন উপভাষাকে শিষ্ট কাব্যে ছাড়পত্র দেবার প্রচেষ্টা বহু কবির রচনাতেই লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত ব্যতীত বহিরাগত ভারতীয়, ইউরোপীয়, ফারসী, চীনা-জাপানী প্রভৃতি ছন্দের বাইরের গঠনাকৃতিকে বাংলায় স্থান করে দেবার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, অমিয় (চক্রবর্তী), বিষ্ণু, বিশ্ব (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ কবিবৃন্দ। হাল আমলে সাঁওতালী, ওরাঁও, চাক্‌মা প্রভৃতি আদিবাসীদের নানা গীতিছন্দ বাংলায় আনবার সচেতন প্রয়াস কোন কোন কবি করেছেন।

যেমন ভাবের ক্ষেত্রে, তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও বাংলা কাব্যের পরিসর বিস্তৃত করবার প্রচেষ্টা এ-যুগের কবিরা নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, রবীন্দ্র যুগের তুলনায় পরবর্তী যুগের বাংলা কাব্যে ছন্দের ঐশ্বর্য-দীপ্তি অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়েছে। এই বিরাট সর্বগ্রাসী প্রতিভা অধিকাংশ কবিকেই ভাব ও ছন্দ উভয় দিক থেকেই বহুলাংশে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।—এই সম্মোহক রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই একদল তরুণ কবি সচেতন ভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কবিতার নব আঙ্গিক প্রবর্তনে তাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে গিয়ে কতকাংশে আবার সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য কাব্য-আঙ্গিকের প্রভাবে পড়ে গিয়েছিলেন। প্রথাবদ্ধ ছন্দ-কাঠামো মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়ে গদ্যের

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে ছন্দ বৈচিত্র্যের অভাব

বাক্‌ধর্মী উচ্চারণ পরিস্ফুটনের চেষ্টা, গদ্যকবিতায় পদ্যছন্দের চমক সৃষ্টির প্রয়াস, স্প্রাং রিদ্‌ম্‌-এর বিকল্প রূপে শিথিলবদ্ধ ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস, পাশ্চাত্য কবিতার গঠনভঙ্গি ও মিলবিন্যাসের অনুসৃতি,—এ সবের মধ্যে নব পথের সন্ধানস্পৃহা লক্ষ করা যায়। তবে তিন ও চারের দশকে এক শ্রেণীর কবিদের মধ্যে যে সচেতন রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, কালের ব্যবধানে সেই 'রবিছায়া'র আতঙ্ক কেটে গেছে মনে হয়। আশা করা যেতে পারে, এবারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে প্রত্যয়-বলিষ্ঠ নতুন ছন্দোরীতির প্রবর্তনায় বাংলা কাব্য-আঙ্গিকের কিছু লক্ষনীয় দিক-পরিবর্তন সূচিত হবে।

পরিশিষ্ট

ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কেবলমাত্র যে একজন বিশিষ্ট ছন্দ-সচেতন কবি ছিলেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা ছন্দচিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য ছান্দসিকের সম্মানও তাঁরই প্রাপ্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে 'বিচিত্রা ক্লাবে'র এক অধিবেশনে (১৫ ফাল্গুন, ১৩২৪, ইং. ২৭-২-১৯১৮ তারিখে) তিনি 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে একটি দীর্ঘ রচনা পাঠ করেন। ১৩২৫-বৈশাখ সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১] ঠিক প্রবন্ধাকারে নয়, অনেকটা গদ্য-পদ্য মেশানো রম্য রচনার ঢঙে এটি লিখেছিলেন। ছন্দ-সরস্বতী কিশোর কবির কাছে নাকি পাঁচবার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে, বিভিন্ন বাহনে চেপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশ 'আদ্যাশ্রী মূর্তি—মকরাঙ্গী ডিঙ্গাবাহন—গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতিতে'।—এ অংশে একেবারে চর্যাপদ থেকে সুরু করে বিহারীলাল পর্যন্ত পয়ার-ত্রিপদীর ধারাটি (মুখ্যত মিশ্ররত্ত রীতিতে রচিত) ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত-সহযোগে দেখিয়েছেন। পয়ার, ত্রিপদী –সম্পর্কে কবির ছন্দোবদ্ধ সূত্রনির্দেশ বেশ কৌতুকপ্রদ। পয়ার সম্পর্কে পয়ার বন্ধেই তিনি লিখেছেন,—

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড়॥
যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—
মারো ঝট্, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি॥
ঠাঁই বুঝে গুণ টানো, ঠাঁই বুঝে দাঁড়।
যুক্তাযুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড়॥

[ছন্দ-সরস্বতী (আনন্দধারা সং), পৃ ২]

কবি-ছান্দসিক এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় অনেক মূল্যবান তথ্য হাজির করেছেন। আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদীর যতিবিভাগ, প্রত্যেক পদে বিজোড়ে-বিজোড় জোড়ে-জোড় শব্দ-গ্রন্থন কৌশল, যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণে (রুদ্ধদলে) হসন্ত উচ্চারণের রহস্য, কোথাও দ্রুত এগিয়ে যাওয়া (গুণ টেনে), কোথাও বা ধীর ভঙ্গিতে চলা (দাঁড় টেনে),—

১। উল্লেখ করা যেতে পারে, এর তিন সপ্তাহ বাদে বিচিত্রা ক্লাবের আর একটি সাহিত্য সভায় (৬ চৈত্র, ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ছন্দ' নামে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুমিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠকালে রবীন্দ্রনাথ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধই তাঁকে ছন্দ বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি 'ছন্দের অর্থ' নামে সবুজপত্রে, চৈত্র, ১৩২৪ সংখ্যায়, প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থাৎ সরল ও মিশ্র-কলাবৃত্ত উচ্চারণ রীতির পার্থক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত,—এবং সর্বোপরি ছন্দের দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে যুক্ত-অযুক্ত দুই রকমের বর্ণসমন্বয়ের আবশ্যকতা স্বীকার,—এ-সবগুলিই বাংলা ছন্দের উচ্চারণ ও গঠন বিষয়ক গভীর উপলব্ধি-প্রসূত সুচিন্তিত মন্তব্য।

ত্রিপদী বন্ধের সংজ্ঞাও কবি ত্রিপদী ছন্দেই দিয়েছেন,—

আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়,
ছয়-ছয়-আট ত্রিপদীর।
লঘু ছন্দ এনে বসে দীর্ঘ আট-আট দশে'
রচনা করিবে তুমি ধীর॥ [ঐ, পৃ ২]

কবির কাছে ছন্দ-সরস্বতীর দ্বিতীয় আবির্ভাব 'হৃদ্যাশ্রী মূর্তি'—মঞ্জুমরাল বাহন–গঙ্গা যমুনা পদ্ধতি'তে। এ-অংশের আলোচনায় তিনি (সরল) কলাবৃত্তের উচ্চারণ-রহস্য ধরতে চেষ্টা করেছেন। এ-ছন্দের ধ্বনিগত মাত্রামাপ সঠিক উপলব্ধি করে মন্তব্য করলেন,—

'পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর, প্রকৃতপক্ষে যে একজোড়া অক্ষর, এই কথাটা স্মরণ রাখলে, এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হবে না।' [ঐ পৃ ১০]

ঐ-কার, ঔ-কারকে কবি স্বরসঙ্কর বা diphthong ধরতে বলেছেন। –অর্থাৎ কলাবৃত্তে তাকে একজোড়া স্বরবর্ণরূপে গণ্য করতে হবে।—এ ছন্দের সন্ধান তিনি প্রথম পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য গ্রন্থাবলী' থেকে। তাঁর 'অপেক্ষা' কবিতা থেকে 'ছন্দ পাটির অনুসারে' একটি পংক্তি সাজিয়ে এ-ছন্দের মাত্রাগত হিসেবটাও বুঝিয়ে দিলেন,—

'কলস ঘায়ে | উর্‌মি টুটে |
রশ্‌মি রাশি | চূর্‌ণি উঠে |
শান্‌ত বায়ু | প্রান্‌ত নীর | চুম্‌বি যায় | কভু।

ছন্দময়ী দেখে বললেন, ঠিক হয়েছে, প্রতি পংক্তি-পর্বে পাঁচ। এ আমার পাঁচকড়াই পাঁইজোড়।'

ছন্দ সরস্বতীর তৃতীয়বার আবির্ভাব হল 'চিত্রশ্রী মূর্তি—মত্তময়ূরবাহন—ঝপাঝামর পদ্ধতি'তে। এখানে কবি লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের রহস্য ধরতে চেয়েছেন। স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

'ও হল বাংলা ভাষার প্রাণপাখি। ওকে যে বশ করতে পারবে বঙ্গবাণীর স্বরূপ সে প্রত্যক্ষ করবে। বাংলা সঙ্গীতের মর্মের কথা তার কাছে রূপ ধরে ফুটে উঠবে।' [ঐ, পৃ ১৫]

আরও স্পষ্ট করে এ ছন্দের মাত্রা গণনার নির্দেশ দিলেন,—

'এ ছন্দে হসন্ত বা ভাংটা অক্ষর ছাটাই করে, খালি স্বরান্ত বা গোটা অক্ষর গুণতে হয়। শব্দের যে যে অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে দ্যাখ—বুঝতে পারবে।

আমি আবার ছন্দপাটি ধরলুম,—

তোমার্ আমার | মাঝ্ খানেতে |
একটি বহে | নদী।
দুই্ তটেরে | এক্ই গান্ সে |
শোনায়্ নিরাবাধ।।' [ঐ পৃ ১৫-১৬]

প্রথম পরীক্ষা করে কবি ছান্দসিক 'দুই তটেরে' পবে পাঁচটি স্বরান্ত বর্ণ [illegible] ছিলেন। ছন্দময়ী তাঁকে সংশোধন করে বললেন, 'দুই শব্দের ই-কার পুরো উচ্চারণ হচ্ছেনা, কাজেই ওটা হসন্তের সামিল।'—সুতরাং পর্বগুলি সবই চারের। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে পর পর প্রাচীন বহু কবির কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এ-ছন্দকে সত্যেন্দ্রনাথ 'শব্দ পাপ্‌ড়ি গোনা ছন্দ' বলেছেন।

ছন্দ-সরস্বতী চতুর্থবার আত্মপ্রকাশ করলেন 'দৃপ্তশ্রী-মূর্তি গগন গরুড় বাহন—বিমান বিহার পদ্ধতি'তে। কবি এখানে তাঁর নিজস্বধারায় সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপায়ণের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তিনি মূলত সংস্কৃত, আরবী-পারশী প্রভৃতি প্রাচীন ক্লাসিক ছন্দগুলির বাংলা রূপান্তর পদ্ধতি ধরতে চেয়েছেন। সংস্কৃত মুক্তস্বরে লঘু-গুরু উচ্চারণের তারতম্য আছে। আরবী-পারশীতেও রয়েছে। বাংলায় সন্ধিস্বর (diphthong) ছাড়া গুরু মুক্তস্বর নেই। সত্যেন্দ্রনাথ সে কারণেই সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা, মালিনী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের বা আরবী মোতাকারিব, হজজ জাতীয় ছন্দোবন্ধের বাংলা রূপান্তরে গুরুস্বরের বিকল্প হিসেবে রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন। তাতে নতুন নতুন ছন্দ-প্যাটার্ন এলেও ওই সব ক্লাসিক ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ঠিকমতো ফোটেনি। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, ইংরেজি প্রস্বর-অপ্রস্বর ধ্বনিরূপও রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসের সাহায্যে ফোটানোর প্রচেষ্টা তাঁর সর্বাংশে সফল হয়নি। এই শ্রেণীর ছন্দ-প্যাটার্নের বিন্যাসে কবি নিজে বহু পরীক্ষা করেছেন।

তাকেই এখানে দৃপ্তশ্রী-মূর্তিরূপে অভিহিত করেছেন। ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়েও এ-জাতীয় ছন্দকে কলাবৃত্তেরই রূপভেদ হিসেবে গণ্য করতে হয়।

পঞ্চম আবির্ভাবে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ-সরস্বতীকে 'মঞ্জুশ্রীগতি—বিদ্যুৎ তাঞ্জাম-বাহন—বুলবুল্ গুলজার পদ্ধতি'তে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে কবি আর বিদেশী বা সংস্কৃত ছন্দের প্রস্বর-অপস্বর বা লঘু-গুরু বিন্যাসক্রমের অনুসরণ করেননি, রুদ্ধ-মুক্ত নানা প্যাটার্ণের নিজস্ব পরীক্ষা করেছেন। কোনও শ্লোকে সবই রুদ্ধদল, কোথাও বা সবই মুক্তদল, কোথাও রুদ্ধ-মুক্ত বিন্যাসের নব উদ্ভাবিত প্যাটার্ণ; দ্বিদল ত্রিদল, চতুর্দল পর্বের নানা ভঙ্গী। এ-ধরণের ছন্দ-প্যাটার্ণ তৈরীতে সত্যেন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল বহু কবিতায় তার নিদর্শন মিলছে। এখানেও (সবল) কলাবৃত্তের বিচিত্র পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-অধ্যায়ে তিনি বাংলায় অন্তস্থ-ব এবং অন্তস্থ-য়-এর ব্যবহার সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া, ছিঃ, অঃ, বাঃ, হুঃ প্রভৃতি ধ্বনাত্মক একদল শব্দের বা বাক্য-সূচনার ধা, হা, গো জাতীয় একদল দীর্ঘ উচ্চারণযুক্ত শব্দের দ্বিকলা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যও তাঁর কানে ধরা পড়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছন্দ-সরস্বতীর প্রথম তিনবারের আবির্ভাবে (সরল) কলাবৃত্ত, মিশ্র (কলা) বৃত্ত এবং লৌকিক দলবৃত্ত—বাংলা ছন্দের এই তিন মুখ্য রীতির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ অনেকাংশে ধরতে চেষ্টা করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম আবির্ভাবে সংস্কৃত অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দের বাংলা রূপান্তর এবং কবির স্বকল্পিত রুদ্ধ-মুক্ত দলবিন্যাসের নানা প্যাটার্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ছন্দ-সরস্বতীর চতুর্থ ও পঞ্চম আবির্ভাবে প্রদর্শিত মূর্তি পূর্বোক্ত মূর্তিগুলির মধ্যেই,—বিশেষ করে হৃদ্যাশ্রী মূর্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। আলোচ্য রচনাটির অপর আকর্ষণ হল, সর্বপ্রথম এখানেই একজন ছান্দসিক বাংলা কাব্যে ছন্দ বিবর্তনের কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। চর্যাগীত থেকে সুরু করে রবীন্দ্র মধ্যপর্বের কাব্য পর্যন্ত তাঁর পদচারণা। এদিক থেকেও সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' রচনাটির পরবর্তী ছান্দসিকদের দিক্‌দর্শনী হিসাবে গণ্য হতে পারে।

নির্দেশিকা

[উদ্ধৃতি চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থ ও রচনার নাম নির্দেশ করা হয়েছে।]